MA-09-BENG-3.1

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
M. A. in Bengali

তৃতীয় ষাণ্মাসিক

প্রথম পত্র (Paper : 1)
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যতত্ত্ব

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

বিভাগ - ১ : রসবাদ

বিভাগ - ২ : ধ্বনিবাদ

বিভাগ - ৩ : অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ (মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি)

বিভাগ - ৪ : সাহিত্যের পথে (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বাস্তব, তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যতত্ত্ব)

Contributor :

Ratnadip Purkayastha (Units: 1, 2, 3, 4, 5 & 6)	Department of Bengali Digboi Mahila Mahavidyalaya
Nibedita Bhattacharjee (Units: 7, 8 & 9)	Department of Bengali R.G. Baruah College, Guwahati

Course Co-ordination :

Prof. Kandarpa Das	Director, GUIDOL
Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University

Language Editing :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati

Proof Reading :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati
Swapan Das	Department of Bengali, Pandu College

Format Editing :

Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Cover Page Design

Bhaskar Jyoti Goswami	GUIDOL

ISBN : 978-93-84018-72-6

December, 2014

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset, Mirza, Copies printed 500.

Acknowledgement

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

পত্র পরিচিত

স্নাতকোত্তর তৃতীয় ষাণ্মাসিকের প্রথম পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আমাদের আলোচ্য এই পত্রের পাঠ্যতালিকায় রয়েছে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বমূলক অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক ভাবনাসমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পথে'। আসুন, এই সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এই পত্রের অধ্যয়ন এবং পঠন-পাঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করা যাক।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র তথা ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে। মহর্ষি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে রসকেই নাট্যের পরমতত্ত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন এবং আচার্য অভিনবগুপ্তের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে রসতত্ত্ব দৃশ্যকাব্যের সীমায় আবদ্ধ না থেকে সর্ববিধ কবিকর্মের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভরতমুনি থেকে পণ্ডিত জগন্নাথ পর্যন্ত সাহিত্য-মীমাংসক সম্প্রদায় নানাভাবে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে এসেছেন। তবে আনন্দবর্ধনই প্রথম 'ধ্বনি'-কে স্বীকার করেছেন এবং তাকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলে নিদর্শন করেছেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল তিনি রসের প্রকৃত স্বরূপ অসাধারণ মনীষার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তিনি পূর্বাচার্যদের নির্দেশিত রস-বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলিকে ধ্বনিবাদের উদার পরিধির মধ্যে সমন্বিত করে তাদের যোগ্য মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তাদের মধ্যে আপাতবিরোধ দূর করে রসতত্ত্বকে একটি ব্যাপক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করলেন। আনন্দবর্ধনই যথার্থত চিরন্তন অলংকারশাস্ত্রকে সাহিত্যবিদ্যায় উন্নীত করেছেন। তাই সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি সাহিত্যতত্ত্ব অধ্যয়ন একান্তই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এর প্রতি লক্ষ রেখেই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভারতীয় রসবাদ ও ধ্বনিবাদের প্রসঙ্গ। এর মাধ্যমে আপনারা অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত হবেন; জানবেন রসবাদ, ধ্বনিবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ, অলংকারবাদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে। রসের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক কী, অলংকার কী, কাব্যে অলংকারের ভূমিকা কী, শব্দের ত্রিবিধ অর্থ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই পর্বে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শিল্পের, বিশেষত কাব্য-শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে প্রথম সচেতনভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন অ্যারিস্টটলের গুরু দার্শনিক প্লেটো। প্লেটোর অ্যাকাডেমির 'নৌস' (nous) মূর্তিমান মনীষা অ্যারিস্টটল 'Art is imitation mimesis'-শিল্পের এই প্রচলিত সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করে এর তাৎপর্য স্পষ্টকর করবার চেষ্টা করেছেন। যুক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক অ্যারিস্টটলের যুক্তিপ্রবণতা, নৈয়ায়িক ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যতত্ত্বকে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত করে তুলেছে। এর প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'Poetics'-এ। তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থখানি আমাদের বর্তমান পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠ্যতালিকাভুক্ত অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স'-এর আলোচনায় স্থান লাভ করেছে বিশেষত ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের

প্রসঙ্গদ্বয়। অবশ্যই প্রসঙ্গত ট্র্যাজেডি কী, ট্রাজেডির ষড়ঙ্গ ও তাঁর গুরুত্ব, ট্র্যাজেডির নায়কবিচার, ট্র্যাজেডির রসপরিণতি, ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের সম্পর্ক ও পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ও আমাদের এই পর্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আচার্য ভরতমুনি থেকে শুরু করে পণ্ডিত জগন্নাথে এসে শেষ হয়েছে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের যুগ। আধুনিক যুগে যে চারজন ভারতীয় মনীষী সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পর্বে তাঁর 'সাহিত্যের পথে' অবলম্বনে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটবে। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্যকে উন্মোচিত করার প্রয়াসী হয়েছেন। এই আলোচনায় তিনি প্রাচীন ও আধুনিক, ভারতীয় ও বিদেশী, সাহিত্যবস্তু ও সাহিত্যতত্ত্ব প্রভৃতি সাহিত্য-সংক্রান্ত অনেক মৌলিক কথা উত্থাপন করেছেন। যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সামগ্রিক দৃষ্টি, সর্বোপরি সৌন্দর্য রসরসিকতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর আলোচনায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণ ও রসচেতনার নিবিড় সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যসৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্য, সাহিত্যে মঙ্গলচেতনা, সাহিত্যের সত্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি মৌলিক ভাবনা-সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বক্ষ্যমাণ পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে কয়েকটি বিভাগে বিভাজিত করেছি। আসুন, আমাদের পাঠ্য-বিষয়ের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক —

বিভাগ - ১ : **রসবাদ**

বিভাগ - ২ : **ধ্বনিবাদ**

বিভাগ - ৩ : **অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ (মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি)**

বিভাগ - ৪ : **সাহিত্যের পথে (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বাস্তব, তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যতত্ত্ব)**

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো, মোট ২০ নম্বরের (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর বাড়ি থেকে তৈরি করে (Home Assignment)

পাঠাতে হবে। এছাড়া, বার্ষিক পরীক্ষায় আপনাদের ১২ নম্বরের ৫ টি প্রশ্ন (১২×৫=৬০) এবং ৫ নম্বরের ৪ টি প্রশ্নের (৫×৪=২০) উত্তর লিখতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার মূল্যমান ৮০ (৬০+২০)= ৮০ ।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই সচেতন শিক্ষার্থী এই বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে বা সরাসরি অবগত করালে আমরা কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি, আমাদের এই আয়োজন ও প্রচেষ্টা আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

বিভাগ পরিচিত

স্নাতকোত্তর তৃতীয় ষাণ্মাসিকের প্রথম পত্রে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমাদের এই পত্রের পাঠ্য তালিকায় রয়েছে — রসবাদ, ধ্বনিবাদ, অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পথে'। তবে এই পাঠ্য-উপকরণে শুধু অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের আলোচনা স্থান পেয়েছে। আসুন, এই পাঠ্য-উপকরণের বিভাগ-গত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক্। এখানে মোট নয়টি বিভাগ রয়েছে। তার প্রথম ছয়টি বিভাগে রয়েছে 'পোয়েটিকস্'-এর আলোচনা। যেমন —

বিভাগ - ১ : **অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্' : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি**

বিভাগ - ২ : **ট্র্যাজেডি : সংজ্ঞা ও ষড়ঙ্গ**

বিভাগ - ৩ : **ট্র্যাজেডির কাহিনি ও চরিত্র**

বিভাগ - ৪ : **ট্র্যাজেডির পরিণাম ও ক্যাথারসিস**

বিভাগ - ৫ : **এপিক বা মহাকাব্য**

বিভাগ - ৬ : **অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্' : বিবিধ প্রসঙ্গ**

বাকি তিনটি বিভাগে 'সাহিত্যের পথে'-এর আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন—

বিভাগ - ৭ : **সাহিত্যের পথে : নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা - ১**

বিভাগ - ৮ : **সাহিত্যের পথে : নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা - ২**

বিভাগ - ৯ : **সাহিত্যের পথে : নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা - ৩**

বিভাগ-১

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্' : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২ অ্যারিস্টটলের জীবনবৃত্ত

  ১.২.১ প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

১.৩ অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব

  ১.৩.১ পরিচয়

  ১.৩.২ বৈশিষ্ট্য

১.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রাচীন গ্রিসের গৌরব দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল সাহিত্যতত্ত্বের জগতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মানব-মনীষার তিনি এক অপরূপ বিস্ময়। দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সকল শাখাতেই তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর বিশ্বজনীন মনীষা নিয়ে সমস্ত দুরূহ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং এই সম্পর্কে নতুন আলোকপাতও করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি সেই বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করেছেন এবং তার সংজ্ঞা ও নীতি নির্ধারণের প্রয়াস করেছেন। যদিও তিনি এ সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়ন করেননি এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে কোনো চরম কথা বলেননি, তবু এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড়ো দান এই যে, তিনি আমাদের মনে ঔৎসুক্য ও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন। বস্তুত সাহিত্য জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করে তোলাই এক্ষেত্রে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড়ো অবদান।

গ্রিস দেশের বহুবিচিত্র সৃষ্টি একদিকে যেমন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সৌন্দর্যপিপাসা নিবৃত্ত করেছে, তেমনি অন্যদিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসার খোরাকও জুগিয়েছে।

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স' বা 'কাব্যতত্ত্ব'ও এমনই এক সৃষ্টি। এটি কাব্য ও শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতার সংগ্রহ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। 'পোয়েটিক্‌স'-এর অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত অধ্যাপক ইনগ্রাম বাইওয়াটারের 'The art of Poetry' এবং বুচার সাহেবের 'Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art' গ্রন্থ দুটি অন্যতম।

রচনার সমকালীন সময় থেকে অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থটি পাঠক মনে কাব্যশিল্প সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। ট্র্যাজেডিতত্ত্ব সম্পর্কে পরবর্তীকালে আরও অনেক আলোচনা করা হয়েছে, অ্যারিস্টটলের মতবাদও বিভিন্ন যুগে আলোচিত, ব্যাখ্যাত, সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে ; কিন্তু যে মূল তত্ত্বসমূহের উপর গ্রন্থটির প্রতিষ্ঠা তা কখনো উপেক্ষিত বা বর্জিত হয়নি। অ্যারিস্টটলের সুদূরপ্রসারী এক গভীরতর মতবাদের মানদণ্ডেই বর্তমানকালেও ট্র্যাজেডির মূল্য বিচার করা হয়।

প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে দীর্ঘ আট বছর দর্শনশিক্ষা এবং অধ্যয়নের ফলে অ্যারিস্টটল সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প ও দর্শন সম্পর্কে তিনি প্রায় কুড়িটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থগুলি রচনার সময়েই 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। তবে এটি যে আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা বর্তমান। এর মধ্যে আছে পরিভাষার অসংগতি, চিন্তার অসংলগ্নতা, শব্দ প্রয়োগে উদাসীনতা এবং বহুক্ষেত্রে স্মৃতি-বিভ্রমের চিহ্ন। কমেডি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বা কিছু কিছু শব্দের স্পষ্ট ব্যাখ্যাও তিনি এতে দিতে পারেননি। সম্ভবত এর বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হয়েছিল, — কখনো অনুচ্ছেদের আকারে, কখনো পরিচ্ছেদের আকারে, কখনো বা সংক্ষিপ্ত বাক্যে। অনেকের মতে অ্যারিস্টটল নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাকেন্দ্র 'লাইসিউম'-এ নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন; তাঁর 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের বিষয়ও ওইরূপ বক্তৃতার ফল অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতামালার 'নোট্‌স'। এর কোনো কোনো অংশ বিশদ, সরল, স্পষ্ট, আবার কোনো কোনো জায়গা সংক্ষিপ্ত, অতিসংক্ষিপ্ত, কখনো বা অস্পষ্ট, কখনো দুর্বোধ্য। কিন্তু তবু এই 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থে সাহিত্যতত্ত্বের যে সমস্ত সূত্রের ইঙ্গিত রয়েছে এবং যেগুলি আলোচিত হয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। পরবর্তীকালের সাহিত্যতত্ত্ব নানাভাবে এই গ্রন্থের কাছে ঋণী। অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থে উল্লিখিত সাহিত্যতত্ত্বের মূল সূত্রগুলির মধ্যে কাব্য, মহাকাব্য ও নাটকের কথা বিশেষত ট্র্যাজেডির কথাই বেশি আলোচিত হয়েছে।

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে কাব্য ও তাঁর বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন শ্রেণির তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিক আলোচনা করবেন, কিন্তু মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির আলোচনার মাধ্যমেই গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। এই নানা অসংগতিময়, খণ্ডিত এবং কিছুটা অস্পষ্ট পুস্তিকাটির মূল্য অসামান্য। সাহিত্য এবং এর তত্ত্ব সম্পর্কে তৎপূর্বে এত স্পষ্ট, এত পরিচ্ছন্ন

রীতিগত আলোচনা আর হয়নি; সাহিত্যের মূল সমস্যাগুলির এত নিরাসক্ত কিন্তু সহৃদয় আলোচনাও আর হয়নি; কাব্যের প্রধান শ্রেণিগুলির গঠনকৌশলও এর আগে কেউ বিশ্লেষণ করেননি। কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ ও তাদের আন্তরিক যোগের ব্যাপারটি অ্যারিস্টটলই সর্বপ্রথম নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন এবং কাব্য বিচারের নিজস্ব রীতি ও নিয়মের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স সংক্রান্ত আমাদের এই প্রাথমিক আলোচনাকে আমরা প্রথম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই বিভাগে আমরা অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স সম্পর্কে প্রাথমিক এবং প্রাসঙ্গিক পরিচয়টুকু গ্রহণ করবার চেষ্টা করব। এই পর্বে আমরা আমাদের আলোচনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে —

- আপনারা মহামনীষী অ্যারিস্টটলের বহুবিস্তৃত কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অ্যারিস্টটলের শিক্ষক প্লেটোর সঙ্গে তাঁর মনীষার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে অ্যারিস্টটলের বিশিষ্ট মানস-প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের প্রাসঙ্গিক পরিচিতিমূলক আলোচনার শেষে আপনারা অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

১.২ অ্যারিস্টটলের জীবনবৃত্ত

অ্যারিস্টটলের জন্ম হয়েছিল গ্রিসের ম্যাসিডন রাজ্যের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা নামক ছোটো শহরে ৩৮৪-৩৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বর্তমান স্ট্যাগিরার নাম স্টাভরো এবং থোস পর্বতের উত্তর-পশ্চিমের Chalcidice- এ এটি অবস্থিত। তাঁর পূর্বপুরুষদের বংশানুক্রমিক পেশা ছিল চিকিৎসাবিদ্যা। তাঁর পিতার নাম নিকোমেকাস। তিনি ম্যাসিডনের রাজার গৃহচিকিৎসক ছিলেন। এই সূত্রে অ্যারিস্টটল রাজার কনিষ্ঠ সন্তান ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ফিলিপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ফিলিপ তাঁর উত্তরাধিকারী আলেকজান্ডারের শিক্ষক হিসাবে অ্যারিস্টটলকে নিযুক্ত করেছিলেন। অ্যারিস্টটল ছিলেন জীববিদ্যাবিদ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞান-দর্শনের নানা শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী জীবনে বিবিধ বিষয়ক আলোচনায় তিনি জীববিদ্যাবিদের মানসিকতাকে পরিহার করতে পারেননি, আর তাই কোনো জিনিসের আকার এবং গঠন-বিশ্লেষণ এবং শ্রেণিবিভাজনের দিকে তাঁর ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ প্রবণতা ছিল।

তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়নি,তাই তাঁর কৈশোর ও

যৌবনকাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। অনেকের মতে তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের জন্য তিনি সমস্ত হারান এবং তারপর সৈন্যবিভাগে কিছুদিন কাজ করেন। সেখান থেকে জন্মস্থান স্ট্যাগিরায় ফিরে গিয়ে তিনি জীবন ধারণের তাগিদে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু এতেও তিনি শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারলেন না। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এথেন্সে গমন করেন। আবার অনেকের মতে অ্যারিস্টটলের আঠারো বা কুড়ি বছর বয়সের সময় তিনি এথেন্স গিয়ে প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আচার্য প্লেটোর এথেন্স-স্থিত অ্যাকাডেমিতে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৮-৩৪৭ পর্যন্ত অর্থাৎ প্লেটোর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করেন। প্লেটোর অ্যাকাডেমির সদস্য হিসাবে তিনি বিশ বৎসর এখানে ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা ও মানসপ্রবৃত্তি প্লেটোর শিক্ষায় গঠিত হয়। অ্যাকাডেমিতে অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, শাসনতন্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। প্লেটোর কথোপকথনের (Dialogues) আদর্শে অ্যারিস্টটল এখানে তাঁর কথোপকথন রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থটি লুপ্ত হয়েছে।

প্লেটোর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র স্পিউসিপ্পাস অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ হন। অ্যারিস্টটল এথেন্সবাসী না হওয়ার জন্য এই পদ লাভ করতে পারেননি। তিনি এখান থেকে ট্রয়ের নিকটবর্তী অ্যাসসে যান। অ্যাসসে সেখানকার শাসনকর্তা হারমিয়াস ও তাঁর বন্ধু অ্যাতারনিউস প্লেটোপন্থীদের নিয়ে একটি আলোচনাচক্র গড়ে তুলেছিলেন। হারমিয়াসের সহায়তায় অ্যারিস্টটল সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, হারমিয়াস তাঁর ছাত্রও হয়েছিলেন। হারমিয়াস অ্যারিস্টটলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজ ভগিনীর সঙ্গে (মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্রী) অ্যারিস্টটলের বিবাহ দেন। ৩৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি লেসবসে আসেন এবং দুই বৎসর জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। হার্মিউসের অনুরোধে ম্যাসিডনপতি ফিলিপ তাঁর পুত্র আলেকজান্ডারের জন্য অ্যারিস্টটলকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি ৩৪২-৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। আলেকজান্ডারের শিক্ষাভার গ্রহণ করার পর অ্যারিস্টটলের মনে প্লেটো-নির্দেশিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়।

তিন বৎসর শিক্ষালাভের পর আলেকজান্ডারের বয়স যখন ষোলো তখন তিনি ম্যাডিসনের অধিপতি হন। ৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ম্যাসিডনিয়ায় কাটানোর পর অ্যারিস্টটল এথেন্সে ফিরে আসেন এবং এখানে বারো বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময়েই তিনি নিজের শিক্ষায়তন 'লাইসিউম'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অনেকগুলি বৃত্তাকার গৃহ তৈরি হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল যাদুঘর ও গ্রন্থাগার। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা চলত। এখানে থাকার সময় অ্যারিস্টটল দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। তিনি 'লাইসিউম'-কে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। তিনি 'লাইসিউম'-এর বৃত্তাকারে গঠিত ছায়া-সুনিবিড় পথে চলতে চলতে শিক্ষাদান করতেন। তাঁর বিদ্যালয় পেরিপেটিক স্কুল নামে অভিহিত হয়। এই পর্বে তিনি 'অলংকার' (Rhetoric) ও 'পোয়েটিক্স' (৩৩০

খ্রি:পূ:) গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর এথেন্স ম্যাডিসনের কর্তৃত্ব সহ্য করতে চাইল না। যেহেতু অ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক দর্শনে একটি গ্রিক রাষ্ট্রের কল্পনা ছিল, তাই তিনি ম্যাডিসনের মধ্যেই এথেন্সের বিলুপ্তি চেয়েছিলেন। ফলে এথেন্সবাসীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। আলেকজান্ডারের গুরু অ্যারিস্টটলের মূর্তি স্থাপনও এই বিরোধে ইন্ধন জুগিয়েছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর আলেকজান্ডারের সমর্থকগণ এবং অ্যারিস্টটল-- সকলেই এথেন্সবাসীর শত্রু হয়ে উঠলেন। আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। ইর্ডারমেডন নামক প্রধান পুরোহিত অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে যুবকদের কুশিক্ষাদানের অভিযোগ উত্থাপন করেন। উপাসনা ও যাগ-যজ্ঞ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতকে কেন্দ্র করে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে অ্যারিস্টটল তাঁর মৃত শ্বশুর হারমিয়াসের প্রশংসা করে কবিতা লেখায় এথেন্সবাসী তাঁর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যের অভিযোগ এনেছিলেন। শেষপর্যন্ত অ্যারিস্টটল এথেন্স ত্যাগ করে চালকিসে চলে যান এবং সেখানেই কিছুদিন পর অসুস্থ অবস্থায় মারা যান। কেউ কেউ বলেন 'হেমলেক' বিষ পান করে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক বাষট্টি-তেষট্টি।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"আরিস্টটল যখন প্লেটোর আকাদেমিতে যোগ দিলেন তখন তাঁর বয়স ষোল। খ্রীষ্ট জন্মাবার তিনশ ছেষট্টি বছর আগে। মাসিদোনিয়ার রাজবৈদ্যের পুত্র, আদরে প্রতিপালিত, বিলাসী, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত মৃদুভাষী তরুণ; তাঁর চলনে, কথায়, পোষাকে আভিজাত্যের ছাপ। বিচিত্র দিকে তাঁর আকর্ষণ; নগর-নীতি, কাব্য, চিকিৎসা-বিদ্যা, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, গণিত, ভাষণ-কলা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা--- জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণের আকাঙ্ক্ষা। প্লেটো নাকি পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন যে তাঁর আকাদেমির দুটো ভাগ : আরিস্টটল হল আকাদেমির মস্তিষ্ক আর অন্য সব ছাত্র তার দেহ। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী প্লেটোর সঙ্গে এই প্রতিভাবান তরুণের সংযোগের জন্য পরবর্তী কালের মানুষ কৃতজ্ঞ।"

['কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল' : শিশিরকুমার দাশ]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলির রীতিগত বা পদ্ধতিগত বিশেষত্ব ও ত্রুটিসমূহ কী? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

'লাইসিউম' কী? (৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

এথেন্সবাসীর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের বিরোধের কারণ কী? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১.২.১ প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

প্লেটো দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের শিক্ষাগুরু। প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে দীর্ঘকাল অ্যারিস্টটল বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর এথেন্সের অধিবাসী না হওয়ার জন্য যদিও অ্যারিস্টটল প্লেটোর অ্যাকাডেমির প্রধান পদ লাভ করতে পারেননি, তবু তিনিই প্লেটোর শ্রেষ্ঠ শিষ্য। কিন্তু আচার্যের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের অত্যন্ত প্রখরভাবে চিন্তার বিরোধিতা ছিল, পার্থক্য ছিল অতি স্পষ্ট। গত দুই হাজার বৎসর এই দুই মনীষী পর্যায়ক্রমে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রধান কর্ণধারের ভূমিকা পালন করেছেন। প্লেটো ছিলেন কবি; তাঁর সমস্ত জীবনই কবিতায় অভিভূত। তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর সেই কবিসত্তা বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে, পাঠককে মুগ্ধ করেছে, আবার তাঁর দার্শনিক সত্তায় মিশে গেছে। কিন্তু সেই কবি প্লেটোই কাব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে কাব্য সত্য

থেকে বহুদূরে অবস্থিত, কাব্য এক ছায়ার ছায়া, কাব্য অসত্য ও অনৈতিক। তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে তাই কবির স্থান নেই।

এই মতের পশ্চাতে অনেকে একটা গৌণ কারণ আবিষ্কার করেছেন। প্লেটোর সমকালে পেলোপন্নেসিয়ার যুদ্ধে স্পার্টার দ্বারা এথেন্স নিগৃহীত হয়েছিল। স্পার্টা নাগরিকগণকে যখন সৈনিকবৃত্তিতে সুশিক্ষিত করে তুলেছিল তখন এথেন্সে চলছিল শিল্পচর্চা। এথেন্সে কোনো প্রমাণ্য ধর্মগ্রন্থ ছিল না। এথেন্সবাসীগণ কাব্য থেকেই আনন্দ ব্যতিরেকে শিক্ষালাভও করত। কবিগণই লোকশিক্ষকরূপে খ্যাত ছিলেন। প্লেটোর মূল আপত্তিও ছিল এখানেই। তাঁর মতে কাব্য দুর্নীতি প্রচার করে, দেব-দেবী সম্পর্কে অলীক কথা ব্যক্ত করে এবং আবেগপ্রাবল্য হেতু জনসাধারণের মন দুর্বল করে। বস্তুত কাব্যকে তিনি বাস্তব জীবনের মূল্যবোধের দিক থেকে বিচার করেছেন। প্লেটোর মতে মহৎ বীর ও নায়কগণের কীর্তি প্রচার করাই কাব্যের ধর্ম হওয়া উচিত। সংগীতের মূল্যও তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে জীবনের বীর্যবত্তাকে প্রকাশ করাই সংগীতের ধর্ম হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন যে সৌন্দর্য মানুষের মনকে সত্যাভিমুখী করে তোলে। তথাপি তিনি সৌন্দর্য ও সত্যকে সমার্থকরূপে বিবেচনা করেননি। প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুনাগরিক সৃষ্টি করা। এই শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর মনে কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। কাব্যপাঠ যে শিক্ষার্থীর মানসিক জীবন গঠনের একান্ত প্রতিকূল এই বিশ্বাস তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল। হোমারের প্রতি প্লেটোর অনুরাগ ছিল। হোমার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে হোমার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও প্রথম ট্র্যাজেডি লেখক। কিন্তু প্লেটো তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রে সেই কবিদের স্থান দিতে চেয়েছেন যাঁরা দেবগীতি ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রশস্তি রচনা করবেন। মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি-নাটক, গীতিকবিতা রচনাকারীদের রাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার দিলে নাগরিকগণের বুদ্ধিবৃত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে —এই ছিল প্লেটোর অভিমত।

যে সমস্ত কলাবিদ্যা চরিত্রের অনুকরণ করে ও দর্শকমনে আবেগ সৃষ্টি করে তাদের তিনি তাঁর পরিকল্পিত প্রজাতন্ত্র থেকে বহিষ্কার করেছেন। এই সমস্ত কলাবিদ্যা পরিদৃশ্যমান বস্তু বা চরিত্রকে অঙ্কিত করে, নিত্য সত্যকে নয়। প্লেটোর এই বক্তব্য সুবিদিত ও বহু প্রচলিত। কাব্য সত্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত। সত্য হল কতকগুলি ভাব বা আইডিয়া, বস্তুজগৎ হচ্ছে তার অনুকরণ বা প্রতিফলন। যেহেতু কাব্যের আদর্শ বস্তুজগৎ, অতএব কাব্য অনুকরণেরও অনুকরণ। দ্বিতীয়ত, কাব্যের আবেদন মনের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নয়; মনের দুর্বলতার কাছে, চিত্তের বিকলতার কাছে। তাই কাব্য আমাদের বুদ্ধি-যুক্তি-চিন্তাকে বিনষ্ট করে। তৃতীয়ত, বাস্তব জীবনের সঙ্গে কাব্যের তুলনায় দেখা যাবে যে কাব্যে আবেগের প্রশংসা করা হয়, বাস্তব জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রশংসনীয় নয়, অর্থাৎ কাব্য সমাজজীবনের আদর্শের বিরোধীও হতে পারে।

যদিও প্লেটোর চিন্তাকে আশ্রয় করেই অ্যারিস্টটলের কাব্যচিন্তা গড়ে উঠেছে, তবু তিনি সেই চিন্তাতেই আত্মসমর্পণ করেননি। কাব্য যে অনুকরণ এই বিষয়ে প্লেটোর

সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য নেই। কিন্তু অ্যারিস্টটলের কাছে এই প্রত্যক্ষ জগৎ মায়া নয়, সত্য। অতএব তাঁর মতে কাব্য মূল থেকে দূরবর্তী নয়। প্লেটোর মতো তিনিও এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে কাব্য আমাদের আবেগকে জাগিয়ে তোলে, চিত্তকে উদ্বেলিত এবং উত্তেজিত করে। কিন্তু তাঁর মতে কাব্যের আবেদন শুধুই মনের দুর্বলতার কাছে নয়, বরং মনের গভীর স্তরের কাছে। অ্যারিস্টটলের মতানুসারে কাব্যের সত্য বিশ্বজনীন সত্য, অর্থাৎ মানুষকে জানার ও বোঝার পক্ষে তার মূল্য অপরিসীম। এ ছাড়া তাঁর মতে কাব্য ও বাস্তব জীবনের ভালো-মন্দ বিচারের মানদণ্ড হওয়া উচিত স্বতন্ত্র।

অ্যারিস্টটল শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং বিচারের পদ্ধতির ক্ষেত্রেই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তাঁর আচার্যের বক্তব্যের ত্রুটির প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর কাব্যতত্ত্বের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে কাব্যের সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন— "নির্ভুলতার মানদণ্ড কাব্যে এবং রাজনীতিতে বা অন্যান্য শিল্পকর্মে আলাদা আলাদা।" প্লেটো মানুষের চরিত্র গঠনের মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার করেছেন এবং তিনি দেখেছেন যে, চরিত্র গঠনে সাহিত্যের প্রভাব হানিকর। অ্যারিস্টটলও মানেন যে যা সমাজের পক্ষে অশুভ সমাজে তার স্থান হওয়া উচিত নয়। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সাহিত্যের প্রভাব মূলত শুভ। সাহিত্য বস্তুসত্য-নির্ভর এবং সাহিত্য একধরনের চিত্ত-সংস্কার। আর তাই, দ্বিতীয়ত — সাহিত্যের নিজস্ব নিয়মেই তার বিচার হওয়া উচিত, অন্য কোনো আরোপিত নিয়মে নয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"অতুলনীয় মনীষার অধিকারী ছিলেন অ্যারিস্টটল। ইউরিপিডিসের পরে এত বড় 'পুঁথিশালা' আর কারো সেদিন গ্রীসে ছিল না। অ্যারিস্টটল তাঁর এই অ্যাকাডেমির ছিলেন মূর্তিমান মনীষা—প্লেটোর কথায় 'নৌস'। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক সংস্কার-বিশিষ্ট একটি পরিবারের সন্তান। তাই বিজ্ঞান-মনস্ক মন নিয়েই তিনি সব কিছু ভেবেছেন ও বলেছেন। গুরু প্লেটোর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু ভাববাদী গুরুর মতের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল না অনেক বিষয়েই। যুক্তির আলোকে সব কিছু তিনি বিচার-বিশ্লেষণ না করে ক্ষান্ত হতেন না। 'গুরু প্লেটো তাঁর নিকট প্রিয়। কিন্তু প্রিয়তর হল সত্য'— এ কথা তিনিই বলেছেন। অ্যারিস্টটলের আলোচনার পরিধি ছিল বিশাল। পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, সাহিত্যশিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়ই ছিল তাঁর অধিগত। 'লজিক' বা তর্কশাস্ত্র তো তাঁরই প্রবর্তিত শাস্ত্র। এই তর্কশাস্ত্রের জ্ঞান তাঁকে নৈয়ায়িক বুদ্ধিতে সঙ্গতি-স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে ও অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চা তাঁর মধ্যে তথ্যসংগ্রহ ও যুক্তিস্থাপনে প্রেরণা দিয়েছে।

গুরু প্লেটোর সঙ্গে মানসিক সংস্কারের দিক থেকে তাঁর পার্থক্য ছিল। আর

তা তাঁদের দুজনের শিল্প-সাহিত্য চিন্তাকে প্রভাবিত না করে পারেনি। প্লেটো মনে করেন— বিশ্বের সকল বিশেষের মূলে রয়েছে 'সামান্যের ধারণা' (Universal idea)। আর এই সামান্যের যে চরম আদর্শ তা ঈশ্বরের মনের মধ্যে আছে। কিন্তু এই সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন না অ্যারিস্টটল। প্লেটো মনে করেন বিশেষ-বর্জিত সামান্যের বাস্তবসত্তা অবশ্যই আছে। অ্যারিস্টটল মনে করেন 'সামান্য' মনেরই একটা ধারণা—প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তব নয়, কিন্তু বিশেষই হল প্রকৃতপক্ষে বাস্তব। মনুষ্যত্বের কোনো বাস্তবসত্তা নেই, কিন্তু বিশেষ মানুষের তা আছে। গুরু-শিষ্যের মত পার্থক্যের এইটিই মূল কথা।"

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

১.৩ অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব

পোয়েটিক্স কথাটির সহজ অর্থ কাব্যবিজ্ঞান বা কাব্যতত্ত্ব। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে কাব্য বা সাহিত্যের বহু মৌলিক তত্ত্ব বা বিষয় আলোচনা করেছেন। 'পোয়েটিক্স' অ্যারিস্টটলের পরিণত বয়সের রচনা, তাই এতে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় আছে। দ্বিতীয়বার এথেন্সে আসার পর তাঁর নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় 'লাইসিউম' পরিচালনার সময় সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে এটি রচিত। গিলবার্ট অবশ্য গ্রন্থ রচনার কাল হিসাবে ৩৩৪-৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে নির্দেশ করেছেন। তাঁর 'পলিটিক্স' বা 'রাষ্ট্রনীতি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ এর কিছুদিন পূর্বেই রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কাব্যবিষয়ক একটি গ্রন্থ রচিত হওয়ার ইঙ্গিতও পূর্বোক্ত গ্রন্থে রয়েছে। তাই এ থেকে অনুমিত হয় যে 'পলিটিক্স' গ্রন্থ রচনার অল্পদিনের মধ্যেই 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। 'পলিটিক্স' গ্রন্থটির সুস্পষ্ট রচনাকাল জানা যায় না, তবে এটি যে 'লাইসিউম' পরিচালনার সময় রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অ্যারিস্টটলের বেশিরভাগ গ্রন্থ তৎপূর্বেই রচিত হয়েছিল। আমরা এবার পোয়েটিক্সের প্রাথমিক পরিচয়ের সূত্রে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং গ্রন্থে ধৃত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ একে একে সন্ধান করব।

১.৩.১ পরিচয়

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটি যথেষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির। এই গ্রন্থে মোট ২৬ টি অধ্যায় আছে। এই ২৬ টি অধ্যায়ের মধ্যে কোনো অধ্যায়-ই দীর্ঘ নয়। অধ্যায় বিভাজনে পরিসরের সামঞ্জস্যও নেই। ফলে কোনো অধ্যায় তিন থেকে চার পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত, আবার কোনোটি পনেরো-ষোলো চরণেই সীমাবদ্ধ। বর্ণনীয় বিষয় অনুযায়ী

অধ্যায়গুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে সমস্ত প্রকার শিল্প-সাহিত্যের আধার সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। অ্যারিস্টটলের বিচারে এই আধার হচ্ছে অনুকরণ। অনুকরণ কী, শিল্প-সাহিত্যে এর ব্যবহার কীরকম অনুকরণের প্রকৃতি কেমন ও কত প্রকার—এই সমস্ত বিষয় পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

অনুকরণতত্ত্বের পর ট্র্যাজেডির আলোচনা শুরু হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ঊনবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত এই আলোচনা বিস্তৃত। বস্তুত ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থটির সিংহভাগ অধিকার করে রয়েছে বলে 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থটি সাধারণত ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণের জন্যই অধিক বিখ্যাত। এই গ্রন্থের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যও ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

পরের তিনটি অধ্যায় অর্থাৎ ২০, ২১ ও ২২ সংখ্যক অধ্যায়ে রয়েছে ধ্বনি, অক্ষর, শব্দ, বাক্য ও ভাষা এবং ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনা। ট্র্যাজেডির বিষয় আলোচনা কালে ভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপন অসংগত নয়। কিন্তু খুঁটিনাটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ-বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মানদণ্ডে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে মূল বিষয়ের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বমূলক এই অংশের যোগ খুব বেশি নয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ভাষাতত্ত্বমূলক আলোচনা শেষ করে পরবর্তী অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের আলোচনা শুরু করেছেন এবং ষড়বিংশ অধ্যায়ে তা সমাপ্ত হয়েছে। মধ্যবর্তী পঞ্চবিংশ অধ্যায়টি প্রত্যক্ষভাবে মহাকাব্য-প্রসঙ্গবিযুক্ত। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে কাব্যের সমালোচনা। এই পর্বে তিনি মহাকাব্য এবং মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা অসম্পূর্ণ। তবু বিষয়টি সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলেছেন এবং যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও বৈজ্ঞানিক মননের পরিচয় দিয়েছেন।

'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থে অ্যারিস্টটল কোনো একটি বিষয়ের ভালোমন্দ ইত্যাদি গুণাগুণ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ সেভাবে করেননি। এতে তাঁর বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদ্য কিছুটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের অনুসারী। বস্তুত 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সূত্র ও তত্ত্বগুলি এতই মূল্যবান ও অনড় যে শত শত বৎসর ধরে এগুলি সাহিত্য-সমালোচনার স্বতঃসিদ্ধ মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। তিনি কাব্যের প্রেরণা নয়, সৃষ্টিকর্মকেই তাঁর আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর পুস্তকের প্রারম্ভেই তিনি সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রাজ্ঞ সমালোচক শিশিরকুমার দাশ কৃত বিন্যাস অনুযায়ী আমরা অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের পরিকল্পনার একটি পরিচয় গ্রহণ করতে পারি —

১. শিল্প অনুকরণ। শিল্পের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য হয় অনুকরণের মাধ্যমে অথবা বিষয়ে অথবা পদ্ধতিতে;
২. কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ, ট্র্যাজেডি ও কমেডির সূচনা;
৩. ট্র্যাজেডি একটি ষড়ঙ্গ শিল্প : কাহিনি, চরিত্র, অভিপ্রায়, ভাষা, সংগীত ও দৃশ্য এই ছয়টি তার অঙ্গ;

৪. কাহিনির গঠন, কাহিনির ঐক্য, কাহিনির শ্রেণিবিভাজন, কাহিনির আবশ্যিক উপাদান;

৫. ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ;

৬. ট্র্যাজেডির পরিণামী আবেদন, করুণা ও ভীতির উদ্বোধন ও আবেগের পরিশোধন;

৭. চরিত্রের লক্ষ্য, চরিত্রের সার্থকতা;

৮. অভিপ্রায় কী, অভিপ্রায়ের সঙ্গে ট্র্যাজেডির সম্পর্ক;

৯. ভাষা ব্যবহার, ভাষারীতি;

১০. মহাকাব্যের প্রকৃতি ও আকৃতি, ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা ও ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব;

১১. কাব্যের নিজস্ব নিয়ম, কাব্যের সমালোচনা পদ্ধতি।

তবে মনে রাখা দরকার যে এটি কাব্যতত্ত্বের সূচিপত্র নয়, বিশেষত শেষ দুটি বক্তব্য পোয়েটিক্সের শেষভাগে নয়, এর নানা স্থানে বিকীর্ণ। অ্যারিস্টটলের মূল বক্তব্য ও আলোচনার পরিধিকে অনুধাবনের সুবিধার্থে শিশিরকুমার দাশের বিন্যাসক্রম অনুসরণে উপর্যুক্তরূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে মাত্র।

১.৩.২ বৈশিষ্ট্য

পোয়েটিক্সের আলোচনায় এবং পরিকল্পনায় অ্যারিস্টটল যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। আমাদের আলোচনার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের সাধারণ পরিচয় গ্রহণ করেছি এবং এই গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসকে চিহ্নিত করেছি। এবারে আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের আলোচনা- পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরূপণ করব।

প্রথমত, তিনি যে আলোচনা করেছেন সেখানে অনুমানের কোনো স্থান নেই। তিনি তাঁর পূর্বের এবং সমকালের প্রসিদ্ধ রচনাসমূহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেই সমস্ত রচনার পদ্ধতিকে লক্ষ করে তিনি সেগুলির নির্মাণশিল্প বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের যথাযথ শ্রেণিবিভাগ ও স্থাননির্দেশ করেছেন। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি যে কবিত্ব শক্তির অধিকারী এবং জন্ম থেকেই যে তাদের কবিতা রচনায় অধিকার— এই বিষয়ে তিনি একটি অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং একে ভিত্তি করে তিনি কাব্যের বিশ্লেষণ এবং শ্রেণিবিভাগে অগ্রসর হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে কবি কাহিনির রূপকার। অন্যান্য রূপকারগণের মতোই তিনি উপাদানগুলির সাহায্যে যথার্থ 'রূপ' (Form) দান করেন।

তাঁর মতে শিল্প একধরনের 'নির্মাণ' এবং তা শিক্ষণীয় ও শিক্ষণযোগ্য।

তৃতীয়ত, কবিদের ব্যবহৃত উপাদানসমূহ সাধারণত বিশৃঙ্খল। কবি গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সেগুলি বিন্যস্ত করেন ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। কবিকে সর্বদা চরমের পথ পরিহার করে চলতে হবে। তাই তাঁর কাহিনি খুব বড়ো বা খুব ছোটো হবে না, ভাষাও অতি উন্নত বা অতি নিম্নমানের হবে না — অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই তা হবে মাঝামাঝি ধরনের। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল মধ্যপন্থী।

চতুর্থত, অ্যারিস্টটল সর্বদা বিশেষকে অবলম্বন করে সাধারণ সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন। মানুষ যেমন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক হতে পারে, তেমনি অনুকরণপ্রিয় বলে মানুষ কবি এবং শিল্পীও হতে পারে। এই অনুকরণবৃত্তিকে অবলম্বন করেই কবির সৃষ্টি সামান্য সত্য হয়ে ওঠে — যা বিশেষ কোনো ইতিহাসের অঙ্গীভূত নয়। কবিরা যখন উপাদানকে 'রূপ' (Form) প্রদান করেন তখন তা আংশিক মৌলিক ও আংশিক সংগৃহীত রূপে ধরা দেয়। তাঁর মতে কবিদের সৃষ্টিক্রিয়া হঠাৎ জন্মলাভ করে না, — তার জন্ম ক্রমোন্নতির পথ ধরেই। তিনি মনে করতেন লেখকদের ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যই ট্র্যাজেডি ও কমেডির সৃষ্টি। গম্ভীর প্রকৃতির লেখক মহৎ ঘটনা এবং স্বজ্জনের ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করলেন। তাঁদের দেবস্তুতি ও মহাপুরুষস্তুতি থেকেই ক্রমে ক্রমে ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যের জন্ম হল। অন্যদিকে লঘু প্রকৃতির লেখক নীচ জাতীয় লোকের ক্রিয়াকর্ম অনুকরণ করলেন। অ্যারিস্টটল মনে করেন কমেডির জন্ম হয়েছে ব্যক্তিগত অভিযোগ থেকে।

পঞ্চমত, ভাববাদী প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেও অ্যারিস্টটল ক্রমে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এসে উপনীত হয়েছিলেন। বহু শাস্ত্রবিদ অ্যারিস্টটল মূলত নিজস্ব ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানী ও প্রয়োগবাদী। এই পরিচিত বস্তুজগৎই ছিল তাঁর কাছে সত্য ও বাস্তব। তাঁর মতে প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে যে কথাটি নিহিত আছে, তা শিল্প-নির্মাণ ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য। প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের ক্রমবিকাশের পথে চারটি কারণ তিনি লক্ষ করেছেন— আদি কারণ, উপাদানগত কারণ, গঠনগত কারণ ও চূড়ান্ত কারণ। যে কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ বা বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করা চলে — উপাদান এবং গঠনবিন্যাস। বিশেষ উপাদানসমূহ মিলেমিশে গঠনবিন্যাসের সূত্র অনুসারে বিশেষ আকার বা রূপ লাভ করে। এই বিশেষ রূপই বস্তুর নিজস্ব রূপ। অস্ফুট সম্ভাবনা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে যাত্রাকেই অ্যারিস্টটল শিল্পকর্মের গঠনরীতিতেও লক্ষ করেছেন। পূর্বোক্ত চারটি কারণকে অবলম্বন করে তিনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে নাট্যকারের নির্মাণশক্তিই নাটকের আদিকারণ, ভাষা, ছন্দ ও সুর এবং চরিত্র ও আখ্যানবস্তু তার উপাদানগত কারণ। নাটক যেহেতু বর্ণনাত্মক নয় কার্যাত্মক তাই নির্মাণ বা অনুকরণের রীতি তার গঠনবিন্যাসগত কারণ। এই শিল্পকর্ম বা নাটক একটি বিশেষ লক্ষ্য বা পরিণতির পথে বিকাশমান। এই লক্ষ্য এবং পরিণতিও আবার অনুকম্পা ও ভীতিভাব উদ্দীপক এবং

চিত্তশুদ্ধি বা চিদানন্দদায়ক রূপে নির্মিত। এই পরিণতিই নাটকটির চূড়ান্ত কারণ। তবে এই কথাও উল্লেখ্য যে প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়া ও শিল্পনির্মাণক্রিয়ার পার্থক্য আছে। একটি পরিণত প্রাণী অন্য একটি প্রাণী জন্ম দিতে পারে কিন্তু একটি পরিণত শিল্পকর্ম অন্য কোনো শিল্পকর্মের প্রত্যক্ষ জনক নয়। প্রাণ বা গতির উৎস প্রাকৃতিক বস্তুতে স্বতঃপ্রবাহমান, কিন্তু মনুষ্যনির্মিত বস্তুতে শিল্পীকে তা সঞ্চারিত করতে হয়।

বস্তুত এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি এক অধ্যাপকের তাঁর ছাত্রদের নিকট ভাষণের শ্রুতলিপি বিশেষ। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণও বটে। এতে অ্যারিস্টটলের কণ্ঠ সংযত, সুর অনুদাত্ত, ভাষা অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জিত ও যুক্তিভিত্তিক। তাঁর গভীর অনুভূতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের কোনো বিরোধ ছিল না। তাই এই গ্রন্থ আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করে ও অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতর করে। দীর্ঘকালের ব্যবধান সত্ত্বেও তাই এই গ্রন্থ এক অভাবিতপূর্ব সজীবতা ও জীবনীশক্তির নির্ভরে অদ্যাবধি ভাস্বর।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"পোয়েটিক্স্-এ অ্যারিস্টটল কেবল গ্রীক সাহিত্য নিয়ে বা গ্রীক সাহিত্যের নানাবিধ প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেন নি, তা করলে তাঁর এই বই গ্রীস দেশের বাইরে কেউ পড়ত না, এবং তিনিও সাহিত্য-সমালোচনার আদিপুরুষ রূপে জগদ্বিখ্যাত হতেন না। আসলে তিনি পোয়েটিক্স্ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে গ্রীক সাহিত্যের দর্পণে বিশ্বমানব-সাহিত্যের কতিপয় মৌলিক ও চিরন্তন বিষয়ের এবং প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। এবং এই আলোচনা এতই নৈর্ব্যক্তিক ও অসাধারণভাবে সাধারণ এবং সর্বজনগ্রাহ্য যে যাঁরা গ্রীক সাহিত্যের সহিত জন্মসূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা যেমন এই গ্রন্থের মধ্যে নিজেদের আত্মরূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান, তেমনি যাঁরা গ্রীক জানেন না, তাঁদের পক্ষেও অ্যারিস্টটলের এই গ্রন্থের আবেদন কোন অংশে কম নয়। এই গ্রন্থ প্রকৃতই জাতিধর্ম-গোত্রহীন, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কথা বা অনুভূতি পোয়েটিক্সে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের মহান গল্প উপন্যাস নাটকাদি যেমন, ঠিক অবিকল সেইরকম। শেক্স্পীয়রের 'কিং লীয়র' শুধু ইংরেজ পাঠকের কাছেই কেবল আদরণীয় নয়, কিংবা দস্তয়েভস্কির 'ব্রাদার্স কারামাজোভ' বা তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা' যেমন রাশিয়ার পাঠককে খুশি করে না কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' কি 'পোস্ট মাস্টার' গল্প যেমন কেবল বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করে না— বিশ্বের সমস্ত দেশের সমস্ত ভাষার পাঠক-পাঠিকা এইসব অমর নাটক ও উপন্যাসগুলিকে নিজেদের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব জ্ঞান করে, ঠিক সেইভাবে অ্যারিস্টটলের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার কাছে একেবারে নিজের নিজস্ব সম্পদ ও প্রতিকৃতি রূপে বিবেচিত হয়। এ কথা মানতেই হবে যে সাহিত্যের— এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের— মৌলিক বিষয়বোধ থেকেই আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিস্তার সম্ভব হয়েছে। অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সে

যেভাবে শিল্প ও সাহিত্যের মৌলিক বিষয়গুলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তাদের সমুচিত বিশ্লেষণের দ্বারা আসল বস্তুটির প্রকৃত চরিত্র কি ফুটিয়ে তুলেছেন — তা সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারের মধ্যে অত্যাশ্চর্য এক নৈর্ব্যক্তিকতা বা সর্বজনীনতা থাকায় তা সর্বকালের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ঠিক এইজন্যই অ্যারিস্টটল গত দু হাজার তিন শ বছর ধরে সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে পরম গুরু ও পথনির্দেশক রূপে গণ্য হয়ে আসছেন, যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় তিনি পথিকৃৎ, পথপ্রদর্শক ও প্রথম আবিষ্কর্তা রূপে বিবেচিত হয়ে আসছেন।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স—তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা' : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

কাব্য সম্পর্কে প্লেটোর অভিযোগ কী ছিল? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

প্লেটোর মতে কাব্য-শিল্পের ধর্ম কী হওয়া উচিত? (৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটলের মত অনুযায়ী ট্র্যাজেডি এবং কমেডির জন্ম কীভাবে হয়েছে? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটলের মতে নির্মাণশিল্পের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা কী? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) আচার্য প্লেটো ও শিষ্য অ্যারিস্টটলের চিন্তাগত ভিন্নতার একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রস্তুত করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের প্রাথমিক পরিচয় দিয়ে তাঁর বিষয়-বিন্যাস-পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

১.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা আমাদের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এবারে এই আলোচনার একটা সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে, মানব মনীষার পরম বিস্ময় অ্যারিস্টটলের দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, প্রকৃতিবিজ্ঞান সব শাখাতেই ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি সমস্ত বিষয়েই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করেছেন। অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটি কাব্য ও শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতার সংগ্রহ। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থটিতে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা অদ্যাবধি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। গ্রন্থটিতে অনেক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সম্ভবত এর বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হয়েছিল। মূলত এটি অ্যারিস্টটলের 'লাইসিউম'-এ প্রদত্ত বক্তৃতার শ্রুতলিপি বিশেষ। এই গ্রন্থটিতে মূলত ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনাই বেশি। তবু এই গ্রন্থ সাহিত্যতত্ত্বের মূল সূত্রের আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত।

অ্যারিস্টটলের জীবন সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা গেল যে তাঁর জীবন সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি পরস্পরবিরোধী। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩৮৫ অব্দে গ্রিসের ম্যাসিডনে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর পিতার নাম নিকোমেকাস। ৩২ বৎসর বয়সে (মতান্তরে ১৮/২০ বৎসর) তিনি এথেন্সে প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে যান এবং প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যেখানে তিনি প্লেটোর তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। প্লেটোর মৃত্যুর কিছুদিন পর তিনি অ্যাকাডেমি ত্যাগ করেন। ৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'লাইসিউম'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই পর্বেই তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এথেন্সবাসীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি এথেন্স ত্যাগ করেন। ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ৬২ - ৬৩ বৎসর।

তিনি ছিলেন প্লেটোর অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য। কিন্তু প্লেটোর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্লেটো নিজে ছিলেন কবিমানসিকতা সম্পন্ন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত আদর্শ রাজ্য থেকে তিনি কবিদের নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর মতে কাব্য আবেগ প্রাবল্য ঘটায়, দুর্নীতি প্রচার করে এবং জনসাধারণের মন দুর্বল করে। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতে কাব্য মূল থেকে দূরবর্তী নয়। কাব্যের আবেদন শুধুমাত্রই মনের দুর্বলতার কাছে নয়, মনের গভীর স্তরের কাছেও। তাঁর মতে কাব্যের সত্য বিশ্বজনীন। আমরা আমাদের আলোচনায় এই সমস্ত প্রসঙ্গই বিশ্লেষণ করেছি।

পোয়েটিক্স কথাটির অর্থ হচ্ছে কাব্যবিজ্ঞান বা কাব্যতত্ত্ব। এটি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। তাই এতে অ্যারিস্টটলের জীবনাভিজ্ঞতাও বহুদর্শিতার পরিচয় আছে। গ্রন্থটি মোট ২৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। সবগুলি অধ্যায়ের পরিসর সমান নয়। আমরা বর্ণনীয় বিষয় অনুযায়ী অধ্যায়গুলিকে কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করেছি। একাধিক অধ্যায় জুড়ে শিল্পসাহিত্যের বিশিষ্ট সূত্রসমূহের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা সেগুলিও আমাদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

আমরা আমাদের আলোচনায় 'পোয়েটিক্স'-এর পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেছি। আমরা দেখেছি যে কাব্যশিল্পের বিষয় এবং আঙ্গিকভাবনা— উভয় ক্ষেত্রেই অ্যারিস্টটলের নিজস্ব চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি শিল্প-সাহিত্যে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার যে বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন তা যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত।

১.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

অ্যাকাডেমি :

অ্যারিস্টটলের শিক্ষাগুরু ও আচার্য প্লেটো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন। এখানেই অ্যারিস্টটল প্লেটোর তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

আলেক্‌জান্ডার (৩৫৬ - ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) :

আলেক্‌জান্ডারের পিতা গ্রিস দেশের অন্তর্গত ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ, মাতা অলিম্পিয়া। তিনি অ্যারিস্টটলের নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণ করে তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পারস্য, ব্যাবিলন, মিশর ইত্যাদি অধিকার করে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপিত করেন।

স্পার্টা :

গ্রিসের প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। এই শহর খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে ১৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিশেষ উন্নত ছিল।

১.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

১.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-২

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'

ট্র্যাজেডি : সংজ্ঞা ও ষড়ঙ্গ

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

২.৩ ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গ

- ২.৩.১ কাহিনি ও চরিত্র
- ২.৩.২ রচনারীতি
  - ২.৩.২.১ ভাষা
- ২.৩.৩ ভাব বা অভিপ্রায়
- ২.৩.৪ দৃশ্যসজ্জা
- ২.৩.৫ সংগীত

২.৪ ষড়ঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব

২.৫ ট্র্যাজেডির স্বরূপ

২.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

২.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

২.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

আমরা আমাদের আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, অ্যারিস্টটল ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতার অধিকারী। তাই কোনোকিছুর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বিবর্তনবাদী মনটিকেই আবিষ্কার করা যায়। তাঁর ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আলোচনাও এর ব্যতিক্রম নয়।

ট্র্যাজেডির উদ্ভব ডিথিরাম্ব থেকে। ডায়োনিসাসের বেদীর সামনে যে সংগীত গাওয়া হত তার নাম ছিল ডিথিরাম্ব। ধীরে ধীরে এর ক্রমবিকাশ হয়েছিল। এর প্রত্যেকটি উপাদান ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছিল এবং পরপর যুক্ত হয়েছিল। ট্র্যাজেডির উপাদানগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় অভিনেতা। এরপর কোরাসের

প্রাধান্য কমে গেল এবং সংলাপই প্রধান অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত হল। এরপর সফোক্লিস অভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন, তাঁর সময়ে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল তিন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে চিত্রিত দৃশ্যকেও তিনি যুক্ত করলেন। এভাবে ক্রমে ছোটো বৃত্তের স্থানে বড়ো বৃত্ত প্রচলিত হল এবং লঘু রীতির পরিবর্তে ট্র্যাজেডি গুরুগম্ভীর রীতিকেই আশ্রয় করল।

গ্রিক ট্র্যাজেডির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা হয়েছে। ডায়োনিসাস দেবতার উপাসনাকে আশ্রয় করেই যে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রচীনকালে আদিম যে দীক্ষাবিধি ছিল তার মধ্যে ট্র্যাজেডির উৎপত্তির মূল উৎস সন্ধান করেছেন। তবু ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের বক্তব্যই সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বাধিক প্রচলিত।

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিভাগে আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ ট্র্যাজেডি। 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনা অনুসরণ করলে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক মনটিকে চিহ্নিত করা যায়। ট্র্যাজেডির আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন ডিথিরাম্ব গীতি থেকেই ক্রমশ একটির পর একটি পাত্র যুক্ত হয়ে ট্র্যাজেডি বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ বিভাগে অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বিভাগে আমাদের আলোচ্য বিষয়সমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যাতে—

- আপনারা অ্যারিস্টটল-প্রদত্ত ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা সম্পর্কে আনুপূর্বিক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- ট্র্যাজেডির উপাদান সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে আপনারা ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গকে চিহ্নিত করতে পারবেন, অনুধাবন করতে পারবেন এই ষড়ঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব।
- এই অধ্যায়ের আলোচনার শেষ পর্বে এসে আপনারা ট্র্যাজেডির স্বরূপ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

২.২ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির মূল্যবান সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। সেই সংজ্ঞাতেই তিনি ট্র্যাজেডির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যতত্ত্বের সেই একই অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির প্রধান উপাদানগুলি এবং তাদের পরিচয়ও

তিনি দিয়েছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল বলেছেন---- ''Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.'' (বুচারকৃত অনুবাদ) অর্থাৎ ট্র্যাজেডি হল গুরুগম্ভীর, সমগ্র এবং বিশেষ আয়তনের ঘটনার অনুকরণ। এর ভাষা সমস্তরকম কাব্যিক অলংকারে মণ্ডিত— এর বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ ধরনের অলংকার, অনুকরণের পদ্ধতিটি কার্যাত্মক— বর্ণনাত্মক নয়; এর উদ্দেশ্য অনুকম্পা এবং ভয়ভাব উদ্রিক্ত করা—যার ফল উক্ত আবেগগুলির মোক্ষণ।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

''অন্যান্য অনেক শিল্পকর্মের মতই ট্রাজেডির উৎপত্তি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের থেকে। আদিম জাদু থেকে শিল্পকর্মের জন্ম কাব্যসমালোচক ও নৃ-তত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদের অসীম কৌতূহলের বিষয়। প্রকৃতিকে বশীভূত, আয়ত্ত করার প্রচেষ্টায় শিল্পকর্মের সূচনা। প্রকৃতির ছন্দকে আদিম মানুষ আয়ত্ত করতে চেয়েছে নিজের কণ্ঠস্বরে, নিজের দেহভঙ্গিতে, চিত্ররচনায় এবং কবিতায়। ভয়কে জয় করার জন্যই সে ভয়াবহকে অনুকরণ করেছে, ভয়াবহকে প্রকাশ করতে চেয়েছে; প্রকৃতির রহস্যভেদ করার জন্যই জীবনের ও প্রকৃতির রহস্যগুলিকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে। আদিম জাদু থেকে শিল্প ক্রমশ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, কিন্তু তার স্বভাবের মধ্যে সেই জাদু আছে। ট্রাজেডি মানুষের দুঃখবেদনা বিপর্যয় অপচয়ের কাহিনী এবং এই শিল্পের মধ্যে আছে মানুষের জীবনের অপচয় ও বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান, মানব-প্রকৃতির এক রহস্যভেদের প্রচেষ্টা।''

['কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল' : শিশিরকুমার দাশ]

ট্র্যাজেডির এই সংজ্ঞাতে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে যা, ট্র্যাজেডিকে কমেডি থেকে পৃথক করেছে। একই সঙ্গে এতে দৃশ্যকাব্যের সাধারণ লক্ষণ এবং ট্র্যাজেডির রসবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। সংজ্ঞাটিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে—

ক) ট্র্যাজেডি শ্রব্যকাব্য নয়, দৃশ্যকাব্য। এই মানদণ্ডেই এপিক থেকে ট্র্যাজেডি পৃথক।

খ) ট্র্যাজেডিতে 'সিরিয়াস' বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়। এখানে কমেডির সঙ্গে ট্র্যাজেডির পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

গ) ট্র্যাজেডিতে 'incidents arousing pity and fear' উপস্থাপিত হয় বলে ট্র্যাজেডি ভয়ানক-মিশ্র করুণরসের নাটক।

ঘ) গীত ও ছন্দোবদ্ধ সংলাপের সাহায্যে ট্র্যাজেডিতে অনুকরণ সম্পন্ন হয়।

অর্থাৎ ট্র্যাজেডি জীবনের ভয়ানক ও করুণ ঘটনা অবলম্বনে রচিত ভয়ানক-মিশ্র করুণ রসাত্মক দৃশ্যকাব্য।

এই সংজ্ঞার কয়েকটি অংশ অ্যারিস্টটল ব্যাখ্যা করেছেন। 'অলংকারে মণ্ডিত ভাষা' বলতে ভাষার ছন্দ, সংগতি এবং সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্কের কথাই তিনি বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডির কোনো অংশ ছন্দে প্রকাশিত আবার কোনো অংশ গানের সাহায্যে প্রকাশিত। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল প্রথমত, বলেছেন ট্র্যাজেডি কী ও তা কী উপস্থাপিত করে। দ্বিতীয়ত, ট্র্যাজেডির রূপের (form) কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে তা সঞ্চারিত হয় ও সবশেষে কোন কাজকে ট্র্যাজেডি সাধন করে তা বলেছেন। অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাটিকে এভাবে সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

ক) ট্র্যাজেডি একটি গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ। তাই এটি কোনো লঘু ঘটনার অনুকরণ বা কমেডি নয়। 'action' শব্দটির মাধ্যমে তিনি সম্ভবত ট্র্যাজেডির প্লট বা ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, অবশ্য 'action' বলতে নাট্যক্রিয়াও বোঝায়। এই প্লট বা বৃত্তের চরিত্র হবে গুরুগম্ভীর যাতে দর্শকচিত্তে অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই দুটি ভাবের জাগরণের মানদণ্ডেই ঘটনার গাম্ভীর্য নির্ভরশীল। তাছাড়া নায়ক চরিত্রের খ্যাতি, সামাজিক ও বংশগত মর্যাদাও ঘটনাকে গম্ভীর করে তোলে।

খ) ট্র্যাজেডির ঘটনা হবে সম্পূর্ণ ও সমগ্র এবং তা হবে একটি নির্দিষ্ট মাপের। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির ঘটনার আদি, মধ্য, অন্ত থাকবে। ট্র্যাজেডির বৃত্তের এই তিনটি অংশ অত্যাবশ্যক। ট্র্যাজেডির যে কোনো অংশ থেকেই এর সূচনা ও সমাপ্তির প্রদর্শন করা চলবে না । তদুপরি ট্র্যাজেডির বৃত্তের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের আয়তন থাকা প্রয়োজন। এই আয়তন এভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে যাতে, নাট্য-ঘটনা সহজেই মনে রাখা যায়। এতেও সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতার সূত্র অনুযায়ী নাট্য-ঘটনা-পরম্পরা বিন্যস্ত হওয়া উচিত। ট্র্যাজেডির নায়কের দুর্দশাময় চিত্র প্রদর্শনের জন্য সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপ উপস্থাপিত হবে এবং আয়তনও তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।

গ) ট্র্যাজেডির ভাষা হবে সকল রকম কাব্যিক অলংকারে সমৃদ্ধ অর্থাৎ এতে ছন্দ ও সুরসংগতি থাকবে। এর কিছু-কিছু অংশ রচিত হবে ছন্দে এবং বাকি অংশ গীত হবে। গীত ও ছন্দোময় সংলাপের মাধ্যমে ট্র্যাজেডির অনুকরণ সম্পন্ন হয়।

ঘ) বৃত্তের ঘটনাসমূহ বিবৃত হবে না; ট্র্যাজেডির নানা চরিত্রের কার্যের মাধ্যমেই তা ব্যক্ত হবে। বিবৃতিমূলকতা এপিকের বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য কার্যাত্মক বা নাটকীয়।

ঙ) ট্র্যাজেডির দর্শনে অনুকম্পা ও ভীতিভাব জাগ্রত হবে এবং এর ফলস্বরূপ ঘটবে ক্যাথারসিস বা ভাব-মোক্ষণ। 'ক্যাথারসিস' শব্দটি তিনি ব্যাখ্যা না করলেও বলা

যায় যে ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ আত্মাভিমানকে বর্জন করে এবং অনুকম্পা এবং ভয়ভাবের মধ্য দিয়ে মানুষ তার ব্যক্তিগত সীমিত সত্তা থেকে বিশ্বজনীন সত্তায় উত্তীর্ণ হয় যেখানে এই বিশ্বজনীন রূপের মধ্য থেকে মানুষ এক বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"অ্যারিস্টটল মনে করেন ট্রাজেডির ঘটনা বা বিষয়বস্তু হবে গুরুগম্ভীর (action that is serious)। এরই অনুকরণ করবে ট্রাজেডি-লেখক। কারণ, ট্রাজেডি দর্শকদের মনে অনুকম্পা ও ভীতি ভাব জাগ্রত করবেই। আর তা করতে গেলে ঘটনাকে গুরুগম্ভীর করতেই হবে। কোন্ ঘটনা দর্শকদের নিকট ভয়ঙ্কর ও অনুকম্পা উদ্রেগকারী হবে কোন্ পরিস্থিতিতে তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। যখন দুজন পরস্পর শত্রুর মধ্যে একজন অন্যজনকে হত্যা করে, তখন সেই হত্যা ও হত্যার উদ্দেশ্য দর্শকদের গভীরভাবে আলোড়িত করে না। হত্যার জন্য একটা যন্ত্রণা-বোধ অবশ্যই হয়, কিন্তু তা গভীর নয়।

আবার পরস্পর উদাসীন ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। কিন্তু যেখানে ঘটনা ঘটে নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জনের মধ্যে সেখানেই ঘটনা প্রবলভাবে দর্শকদের আঘাত করে। অর্থাৎ যেখানে নাটকে ভাই ভাইকে হত্যা করে, পুত্র পিতাকে, মাতা পুত্রকে বধ করে বা করতে চেষ্টা করে তখনই ঘটনা ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। অবশ্য অ্যারিস্টটলের এ-বক্তব্য আদর্শ পরিস্থিতি নাটকে সৃজন ব্যাপারে। এ-ধরনের ঘটনায় মানুষের শ্রেয়োবোধ বা নীতিবোধ তীব্রভাবে আহত হয়। গভীরতম ট্রাজিকবোধ সেখানেই দেখা দেয় যখন মানুষ প্রেয়কে লাভ করতে গিয়ে প্রবৃত্তির বশে এমন কাণ্ড করে বসে যা বড়ই মর্মবিদারী ও ভয়ঙ্কর---- এবং এ কাজের দ্বারা সে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন 'শ্রেয়'কে হারিয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো মানুষ নিয়তির চক্রান্তে কিংবা বাইরের পরিবেশের শিকার হয়ে নিজ-জীবনের প্রেয় ও শ্রেয়কে হারিয়ে মহাশূন্যতার শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয়। এমন সব মানুষের কাহিনী ট্রাজেডিতে উপস্থাপিত হয় এবং এই বিষয়বস্তুই গুরুগম্ভীর ও অনুকম্পা ও ভয় দর্শকচিত্তে উদ্রেকে সব থেকে বেশী সমর্থ।

ট্রাজেডির রচয়িতারা প্রচলিত কাহিনী থেকেই বিষয় গ্রহণ করতে পারেন (যেমন গ্রীক পুরাণ বা কিংবদন্তী) কিংবা কাল্পনিক বিষয় নিয়েও অগ্রসর হতে পারেন, কিন্তু ঘটনাকে ঠিকমতো রূপ দিতেই হবে। গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল বলেছেন ট্রাজেডি-নায়কের যে ভাগ্য-পরিবর্তন নাটকে দেখানো হবে, তা কোনো ধার্মিক ব্যক্তির ঐশ্বর্যসম্ভোগ থেকে দুঃখ দুর্ভোগে পতনের দৃশ্য হবে না, কারণ এমন দৃশ্য অনুকম্পা ও ভীতি কোনোটিই জাগ্রত করবে না— এতে শুধু দর্শক আহতই হবে। আবার তা কোন মন্দ ব্যক্তির দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে ঐশ্বর্যসম্ভোগে

উত্থানের দৃশ্যও হবে না, কারণ ট্রাজেডির আত্মার পক্ষে তা হবে অত্যন্ত প্রতিকূল ব্যাপার। এতে ট্রাজিকত্বের কোন ধর্ম নেই। এতে নৈতিকবোধও জাগে না এবং অনুকম্পা ও ভীতিভাবও না। আবার অত্যন্ত শয়তান ব্যক্তিরও পতন দেখানোও ঠিক নয়। এতে নৈতিকবোধ তৃপ্ত হলেও অনুকম্পা ও ভীতি জাগবে না। তাই অ্যারিস্টটলের মতে ট্রাজেডির নায়ক অত্যন্ত ধার্মিক বা অত্যন্ত দুর্জন হবেন না। তিনি ভাল ও মন্দের মধ্যবর্তী স্থলে থাকবেন। মোট কথা অনুকম্পা ও ভীতিভাব জাগ্রত করতে গেলে ট্রাজেডির বিষয়— গুরুগম্ভীর হবেই। অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রীসে যে তিনজন বিখ্যাত ট্রাজেডি-নাট্যকার ইস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের নাটকের ওপর নির্ভর করেই ট্রাজেডির বিষয় কী হতে পারে—তা স্থির করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী কালেও দুহাজারেরও কিছু বেশী বছর নূতন ও শিল্পগুণমণ্ডিত ট্রাজেডি লেখা হয়েছে এবং এগুলিরও বৃত্ত বা বৃত্তের বিষয় গুরুগম্ভীরই হয়েছে লক্ষ করা যায়। আর এগুলির পরিণামও বিষাদান্ত।"

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

২.৩ ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গ

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তিনি সে সংজ্ঞার কয়েকটি দিক ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সঙ্গে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যগুলিও উল্লেখ করেছেন। তিনি ট্র্যাজেডির তিনটি অন্তরঙ্গ ও তিনটি বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য হল প্লট বা কাহিনি, চরিত্র, রচনাবিন্যাস বা রচনারীতি, অভিপ্রায় বা ভাবনা, দৃশ্যসজ্জা এবং সংগীত। এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যকে তিনি ট্র্যাজিক উপাদান নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি রচনায় এই ছয়টি উপাদান ব্যবহৃত হয়, এবং এই উপাদানগুলির মধ্যেই ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিহিত থাকে। এই উপাদানগুলির মধ্যে কাহিনি, চরিত্র এবং অভিপ্রায় অন্তরঙ্গ উপাদান এবং বাকি তিনটি অর্থাৎ রচনারীতি, দৃশ্যসজ্জা এবং সংগীত বহিরঙ্গ উপাদান। এগুলির মধ্যে সংগীত ও রচনারীতি হল অনুকরণের মাধ্যম; দৃশ্যসজ্জা চিহ্নিত হয়েছে পদ্ধতি বা রীতি হিসাবে আর কাহিনি, চরিত্র ও অভিপ্রায় হল অনুকরণের বিষয়।

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি একটি গুরুগম্ভীর এবং দ্বন্দ্ববিক্ষোভময় ঘটনার অনুকরণ। ঘটনা ব্যক্তি-সাপেক্ষ; ব্যক্তি অর্থাৎ এমন একজন শরীরী মানুষ যার কিছু চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে, আছে চিন্তার বৈশিষ্ট্যও। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য এই যে, মানুষের আচরণের বৈশিষ্ট্য তার চরিত্র ও মনন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং শেষপর্যন্ত ঘটনার বা আচরণের উপরই মানুষের জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। অতএব ঘটনার অনুকরণ বললে তাঁর মতে এককথায় প্রায় সবই বলা হয়। তিনি ট্র্যাজেডির যে ছয়টি উপাদান চিহ্নিত করেছেন সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক নাটকেই এই সমস্ত উপাদান থাকে এবং এদের সুষ্ঠু প্রযোজনার উপরই রচনার সাফল্য নির্ভরশীল।

শুধু তাই নয়, এদের প্রকৃতির মধ্যেই বিশেষ বিশেষ রচনার স্বাতন্ত্র্যও নিহিত থাকে। যে শিল্পী যত সুষ্ঠুভাবে এইগুলি যোজনা করতে পারেন অর্থাৎ যিনি যত পরিপাটিভাবে বৃত্ত বা কাহিনি, যত গভীর ও নির্দোষ করে চরিত্র, যত চিত্তাকর্ষকভাবে ভণিতি বা রচনারীতি যোজনা, যত সূক্ষ্মভাবে অভিপ্রায়, যত সুসমঞ্জস করে দৃশ্য এবং যত মধুর ও ভাবগর্ভ সংগীত রচনা করতে পারেন, তিনি তত বড়ো শিল্পী। অ্যারিস্টটলের মতে রচনার প্রথম এবং প্রধান কাজ বৃত্ত নির্মাণ।

এবারে আসুন উপর্যুক্ত আলোচনার মানদণ্ডে অ্যারিস্টটল কর্তৃক চিহ্নিত ট্র্যাজেডির এই ছয়টি উপাদান সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা যাক।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ডিথিরাম্ব কী? এর থেকে কীভাবে ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়েছিল? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গ বলতে কী বোঝায়? এই ছয়টি উপাদানকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গগত বিভাজনের কারণ কী? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২.৩.১ কাহিনি ও চরিত্র

ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানের মধ্যে প্লট বা বৃত্ত অ্যারিস্টটলের মতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিচারে ট্র্যাজেডি কোনো ব্যক্তির অনুকরণ নয়, কিন্তু ব্যক্তির জীবনের ঘটনা এবং তার জীবনেরই অনুকরণ অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জীবনের সুখ-দুঃখের অনুকরণ। জীবন বস্তুত নানান ঘটনারই মালা বা জীবন ঘটনাময়। জীবনের সমস্ত সুখ ও দুঃখের রূপ বা জীবনের রূপ ঘটনার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। তাই এর পরিণামকেও কোনো গুণমাত্র দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে না, বস্তুত এর পরিণাম হয় এক ধরনের কার্য বা ক্রিয়া-পদ্ধতি। চরিত্র মানুষের গুণসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু কার্যের ফলেই মানুষ সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। তাই চরিত্রের উপস্থাপনা নাটকে মুখ্য নয়, মুখ্য হয় এই ঘটনা বা কার্যের অনুকরণ বা উপস্থাপনা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— "its Fable or Plot that is the end and purpose of the tragedy; and the end is everywhere the chief thing."

প্লট বা আখ্যান সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে এটি ট্র্যাজেডির প্রাণ বা আত্মা। চরিত্রের স্থান দ্বিতীয়। নাটকীয় ঘটনাবিন্যাস অর্থে প্লটকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ নায়ক চরিত্রের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কাহিনিই বস্তুত আখ্যান। কাহিনিতে কার্য-কারণ সূত্রে ঘটনা সমাবেশ তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কাহিনি পরিচিত কোনো উৎস বা পুরাণ থেকে গৃহীত হতে পারে কিন্তু এই কাহিনিকে কার্য-কারণ সম্পর্কে বিধৃত করতে হবে। ছন্দে কাহিনি বর্ণিত হলে তা কাব্য হতে পারে, কিন্তু নাটক হয় না। নাটকের কাহিনি সুগ্রন্থিত ও সুবিন্যস্ত হওয়া উচিত। এতে থাকবে আদি-অন্ত বিশিষ্ট কার্য-কারণের ধারাবাহিকতা। নাটকে কাহিনি বর্ণিত হয় না, বিভিন্ন চরিত্র তাদের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে নাট্যকাহিনি গড়ে তোলে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে। ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত মানব-জীবন-কাহিনি ব্যক্ত করা ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। এই কাহিনির মধ্যে সুখ-দুঃখের বিচিত্র পরিণাম পরিস্ফুট হয়। নাটকের ঘটনাসমূহ নিছক বাইরের কার্যকলাপ ব্যক্ত করে না; মানসিক প্রবণতা, উদ্দেশ্য প্রভৃতিও ব্যক্ত করে।

চরিত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে চিত্রশিল্পে উজ্জ্বল রং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিলে তা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে না কিন্তু যদি শুধু সাদা ও কালো রং সুসমঞ্জস রূপে থাকে তাহলে তা আমাদের জন্য আনন্দজনক হয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, আখ্যানে দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ না থাকলে চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হতে পারে না।

প্লট বা বৃত্তের পরেই অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে চরিত্রকে চিহ্নিত করেছেন। ট্র্যাজেডির দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদান যথাক্রমে চরিত্র ও অভিপ্রায়। অভিপ্রায় মূলত চরিত্রের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। চরিত্র বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যক্তির এমন একটি ধর্ম যা তার মধ্যে বর্তমান থাকার ফলে সেই ব্যক্তিতে গুণ আরোপিত হয়। অ্যারিস্টটলের মতে চরিত্রে প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে—

(ক) চরিত্র ভালো (Good) হতে হবে।

(খ) চরিত্র হবে যথোপযুক্ত (Appropriate)।

(গ) বাস্তব (Like Real)।

(ঘ) চরিত্রটি সংগতিপূর্ণ (Consistent) হবে।

এছাড়াও ট্র্যাজেডি-নায়কের নানা বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গেও তিনি আলোচনা করেছেন।

ট্র্যাজেডি একটি ঘটনার অনুকরণ। অতএব ট্র্যাজেডিতে ঘটনার ভূমিকা মুখ্য। কিন্তু ঘটনা মানে জীবনের সঙ্গে জড়িত কোনো একটি চলমান ব্যাপার। ঘটনা বা কাহিনি যখন সচল মানবজীবনকে অবলম্বন করে কেন্দ্রীভূত হয় তখন সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমুদয় কাহিনিতে প্রাধান্য লাভ করে। এই ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমুদয়ই ট্র্যাজেডির চরিত্র হিসাবে গণ্য হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ডে বলা যায় যে, ট্র্যাজেডিতে কাহিনির পাশাপাশি চরিত্রের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ট্র্যাজেডি যেহেতু গুরুগম্ভীর বিষয়ের অনুকরণ করে অতএব ট্র্যাজেডির প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ট্র্যাজেডির চরিত্রকেও গম্ভীর প্রকৃতির হতে হবে।

ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে কাহিনি ও চরিত্রের প্রাথমিক আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করব। কাহিনি ও চরিত্র প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনা আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২.৩.২ রচনারীতি

কাহিনি এবং চরিত্রের পরেই অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে রচনারীতি বা 'Diction'-এর উল্লেখ করেছেন। শব্দের মাধ্যমে অর্থের প্রকাশকেই তিনি রীতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন গদ্য এবং পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই এর কাজ একই ধরনের। অর্থাৎ এতে শব্দগুলির মাত্রাগত বিন্যাস এমন হবে যাতে তাদের মধ্যে অর্থশক্তি ফুটে ওঠে। চরিত্রগুলির চিন্তা গদ্যে এবং পদ্যে শব্দের মাধ্যমে সেখানে প্রকাশিত হবে।

এই বিষয়ে একটি কথা উল্লেখ্য যে, রচনারীতির সঙ্গে নাটকের ভাষা বা সংলাপের প্রসঙ্গটিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাট্যপ্রবাহের ধারাকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, সংলাপের ভাষা ক্রমশ কাব্যধর্ম পরিত্যাগ করে মননধর্মী গদ্যভাষাকে আশ্রয় করেছে। সংলাপের মাধ্যমে চরিত্র পরিস্ফুট হয়। প্রাচীন যুগে নাটকের, বিশেষত ট্র্যাজেডির ভাষা ছন্দোবদ্ধ ছিল বলেই 'ডিকশন' বলতে সাধারণত ছন্দোবিন্যাসের রূপের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে নাটক প্রধানত গদ্যভাষাকে আশ্রয় করেছে। সুতরাং 'ডিকশন' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই 'expression of the meaning in words'---অর্থাৎ 'expression' অর্থেই প্রয়োগ করতে হবে।

ট্র্যাজেডি রচনার পদ্ধতি হিসাবে অ্যারিস্টটল নাটকীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

ট্র্যাজেডির রীতি বর্ণনামূলক নয়। গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় বর্ণনাভঙ্গির প্রাধান্য থাকায় ঘটনার কোনো পর্যায়ে কোনো চরম দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বা ঘাত-প্রতিঘাতময় উত্তেজনার অবকাশ থাকে না। সম্পূর্ণ বর্ণনার পর পাঠক নিজের বোধ ও বিবেচনা অনুসারে সামগ্রিক বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্থায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, কারণ নাটকে বর্ণনার কোনো স্থান নেই। নাটকের একটি স্বতন্ত্র রচনারীতি বা রচনার কাঠামো আছে, সেই অনুসারেই নাটক রচিত হওয়া উচিত।

২.৩.২.১ ভাষা

অ্যারিস্টটলের বিচারে ট্র্যাজেডির ভাষা হবে অলংকারমণ্ডিত। অলংকার বলতে এখানে শব্দ যোজনার মাধুর্য এবং চাকচিক্যকে বোঝানো হয়েছে। অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের ভাষার সঙ্গে ট্র্যাজেডির ভাষাগত মিল লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে উভয়ের ভাষারীতি গভীর, মহান ও মনোরম হওয়া উচিত। বিষয়বস্তুর বিচারে ও রচনাশৈলীর নিপুণতায় ট্র্যাজেডি এক মহান রচনা। এর রসও বিষাদময় অথচ গভীর। অতএব এর প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এর রচনার ভাষাকেও বিষয় বা রসের অনুরূপ এবং উপযোগী হতে হবে। ভাষা নানাপ্রকার অলংকারমণ্ডিত হলে তার সৌকুমার্য ও মাহাত্ম্য বর্ধিত হয়। অলংকারগুলি কী হবে সে সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, তবে অ্যারিস্টটলের মতে অলংকারসমূহ নাটকের বিভিন্ন অংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকবে। একটি বাক্যে বা একই সংলাপের মধ্যে বিভিন্ন অলংকার যোজিত হলে ভাষার সৌন্দর্যহানি হয়, ভাষা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একাধারে ভাষা অলংকারময় হবে অথচ তার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হবে না।

ট্র্যাজেডির ভাষাকে অলংকারে মণ্ডিত করার অন্য একটি বড়ো কারণ হচ্ছে প্রচলিত লৌকিক ভাষারীতি আটপৌরে, তার বাঁধুনি শিথিল, নানা রকম ব্যাকরণগত ভুলভ্রান্তিও তাতে থাকে। এই ধরনের ভাষায় ট্র্যাজেডির মতো মহৎ সাহিত্যরচনা সম্ভব নয়। কারণ ভাব যদি মহৎ হয়, তার ভাষাকেও মহৎ হতে হবে, অন্যথায় ভাব যথোপযুক্তভাবে প্রকাশিত হবে না। মহৎ বিষয়কে মহৎভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাষাকেও মহৎ হতে হবে। ট্র্যাজেডি যেহেতু মহৎ কাব্য বা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই এর ভাষা হিসাবে লৌকিক ভাষারীতি গ্রহণ করা চলে না, এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আটপৌরে নাগরিক ভাষারীতিও এক্ষেত্রে অচল। তাকে কাব্যিক বা সাহিত্যিক ভাষা হতে হবে। কাব্যিক বা সাহিত্যিক ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৌন্দর্য এবং ভাষাকে সৌন্দর্যদানের জন্য অলংকারের প্রয়োজন।

কবির বিশেষ ধর্ম হল ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ ও ব্যাপ্ত করা। মহৎ কবি ভাষাকে পরিপূর্ণতা দান করেন। ভাষার সংহতি রক্ষা ও একে বিস্তীর্ণতা দান করা

কবির প্রাথমিক কর্তব্য। অ্যারিস্টটলের মতে ভাষার উৎকর্ষ নির্ভর করে এর স্পষ্টতার ওপর। পরিচিত শব্দের প্রয়োগে অর্থের সুস্পষ্টতা ঘটে আর অপরিচিত শব্দ, রূপক ও আলংকারিক শব্দের সীমিত ব্যবহারে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি পায়। অ্যারিস্টটল রূপক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রূপক ভাষার ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনের ভাষার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারে। তিনি বলেছেন যে রূপক অর্থাৎ উপমা-চিত্রের ব্যবহার সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁর মতে এর ব্যবহার প্রতিভাজাত— শিক্ষালব্ধ নয়।

২.৩.৩ ভাব বা অভিপ্রায়

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে চরিত্র হল নৈতিক গুণরাজির প্রকাশ। সংকল্প বা অভিপ্রায় চরিত্রের কাজ করার ইচ্ছা। অভিপ্রায় এই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করে। চরিত্রের অন্য একটি দিক হল মানুষের কাজ করার শক্তি। অতএব নৈতিকগুণ, সংকল্প ও কর্মক্ষমতা— এই তিন-এর আশ্রয়ে চরিত্রের সামগ্রিক রূপ প্রকাশিত হয়। বিশেষ ঘটনার পক্ষে উপযুক্ত বিশেষ শক্তিকেই অ্যারিস্টটল সংকল্প হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন যে সংকল্প কোনো বিশেষ বিশেষ বিষয়কে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করার প্রয়াস অথবা কোনো নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা। কোনো চিরন্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বা ব্যাখ্যাকে সংকল্প রূপে আখ্যায়িত করা যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

অভিপ্রায় বা ভাবনা বা মনন প্রকৃতপক্ষে শিল্পী-সাহিত্যিকের মননশীলতা প্রসূত সমগ্র রচনার পরিণত ও পরিপূর্ণ-রূপ। শিল্প-সাহিত্য ভাষাভিত্তিক হওয়ার ফলে ভাষায় চিন্তাভাবনা, অভিপ্রায় বা মননশীলতার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। বস্তুত শিল্প-সাহিত্যে যে ভাষারীতি, গঠনশৈলী, ছন্দযোজনা ও কলাকৌশল ব্যবহৃত হয় তা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা প্রসূত, তা কখনোই স্বতঃস্ফূর্ত নয়। শিল্প-সাহিত্যের ভাষা সাধারণ কথাবার্তার ভাষার তুলনায় একটু জটিল, এর ভাববস্তুও জটিল। এই জটিল ভাববস্তুকে সূক্ষ্ম ভাষারীতির দ্বারাই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। মহান সাহিত্যের ভাবসমূহকে সাধারণ ভাষা বা প্রকাশরীতির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে গেলে সে তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবে। মহৎ কাজের অন্তরালে সর্বদা সক্রিয় থাকে মহৎ চিন্তাশক্তি। অতএব কাব্য-শিল্প-নাটকে চিন্তাশক্তি বা ভাবনাশক্তির প্রকাশ অপরিহার্য। ট্র্যাজেডির উপাদান প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল এই ভাবনাশক্তির কথা বলেছেন — বস্তুত অভিপ্রায় বা মনন ছাড়া কোনো শিল্পবস্তুর নির্মাণ অসম্ভব। ট্র্যাজেডি একটি উচ্চমানের শিল্পকর্ম, সুতরাং ট্র্যাজেডি রচনায় উচ্চমানের চিন্তাভাবনা ও মননের প্রয়োজন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"আর 'চিন্তা'-র কথা সেখানেই আসে যেখানে কোনো সিদ্ধান্তে আসার জন্যে বা কোনো সাধারণ সত্যকে উপস্থাপনার জন্যে চরিত্রগুলি যা কিছু বলে (Thought is shown in all they say when proving a particular point or it may be communicating a general truth)। ক্রম অনুসারে অ্যারিস্টটল এই চিন্তা'-কে ট্রাজেডির তৃতীয় উপাদান বলেছেন। এ হল সহজ কথায় বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভব ও সঙ্গত কোনো কিছু বলার শক্তি। চরিত্র নৈতিক উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে — ব্যক্তি কোন্ রকমের বস্তু পছন্দ করে এবং কোন্ বস্তু অপছন্দ করে চরিত্র তা দেখিয়ে দেয়। 'চিন্তা' (Thought) সম্পর্কে একটুখানি বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। মানুষের সকল রকম কাজের পিছনে দুটি কারণ থাকে — একটি হল তার নৈতিক স্বভাব (ethos) এবং অন্যটি হল ভাবাবেগ (sentiment) — যা কোনো কোনো সমালোচকের কথায় 'চিন্তা' (Thought) যাকে গ্রীক ভাষায় বলে 'diaonoia'. একথা খুবই সত্য যে ভাবাবেগ মানুষের কাজ করার মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। চরিত্র থেকে যদি চিন্তাকে আলাদা করে ভাগ করা যায়, তাহলে এই 'চিন্তা'ই তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে মানুষকে চমৎকার আশ্বস্ত করতে পারে। এই জন্যই অ্যারিস্টটল বলেছেন — যা বলা যেতে পারে কিংবা যে পরিস্থিতিতে যা বলার উপযুক্ত — তা বলার শক্তিই হল চিন্তা (Thought)। অবশ্য এই চিন্তা চরিত্রের সঙ্গেই যুক্ত।"

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

২.৩.৪ দৃশ্যসজ্জা

নাটক দৃশ্যাত্মক সাহিত্য। উপযুক্ত দৃশ্য যোজনার মাধ্যমে নাটক রচিত হয়, কারণ নাটকের ঘটনাবলি অভিনয়ের মাধ্যমেই দর্শকমনে পৌঁছায়। উপযুক্ত দৃশ্যসজ্জাহীন নাটকীয় কাহিনি অনেকাংশেই বর্ণনামূলক তত্ত্বকথা বা দার্শনিক ব্যাখ্যানে পরিণত হয়।

সাজসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জা (Spectacle) সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য এই যে এর আকর্ষণ থাকলেও কোনো শিল্পগত উৎকর্ষ নেই। কাব্যের সঙ্গেও এর যোগ নেই। দৃশ্যসজ্জা রূপকারের বিষয়, — কবির নয়। তিনি বলেছেন দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে ট্র্যাজেডির রস অর্থাৎ দর্শকমনে করুণা ও ভীতি সঞ্চারিত করা যায় না। দৃশ্যসজ্জা ভীতি সৃষ্টি করে না এবং ট্র্যাজেডির তাৎপর্যের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। ভীতি ও করুণা নাটকের ঘটনার মাধ্যমে দর্শকমনে সঞ্চারিত হবে, দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে তা করতে গেলে শিল্পের দিক ব্যাহত হবে বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

দৃশ্যসজ্জা বলতে সাধারণভাবে মঞ্চ-ব্যবস্থাপকের কলাকৌশল এবং পোষাক-

পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে দর্শকদের কাছে চরিত্রসমূহকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করাকেই বোঝায়। নাটক বস্তুত জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ, পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াকলাপের উপস্থাপনা, অতএব— 'Spectacular equipment will be a part of Tragedy' — দৃশ্যসজ্জা নাটকের অন্যতম উপাদান। দৃশ্যসজ্জার আবেগ সৃষ্টির ক্ষমতার কথা অ্যারিস্টটল স্বীকার করলেও তিনি বলেছেন যে কবিকর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক কম। দৃশ্যসজ্জা দ্বারা উদ্দীপন বিভাব সৃষ্টি অথবা পাত্র-পাত্রীর আকৃতি ও অবস্থা নির্দেশ করার ফলে এতে দৃশ্যসজ্জাকারীর কৃতিত্বই কবির কৃতিত্ব অপেক্ষা বেশি প্রকাশিত হয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"দৃশ্য-সজ্জা রস সৃষ্টির অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু অধম উপায়। শুধু দৃশ্য-সজ্জা দ্বারা যে রচনায় রস উদ্রিক্ত করা হয় সে রচনার শৈল্পিক মূল্য ও গুরুত্ব অবশ্যই কম। যে সব নাটকে 'spectacular element'-এর প্রাধান্য, তাদের নগণ্য বলে এরিস্টটল পংক্তিভুক্ত করেননি— (ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ দ্রষ্টব্য) এ ব্যাপারটি উপেক্ষণীয় নয়। এই গণ্য-না-করাই, বলা যেতে পারে বহু শতাব্দী পরে, "মেলোড্রামা" জাতি নির্ধারণের চেষ্টারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দৃশ্যাত্মক উপাদানের প্রাধান্য, গান-বাদ্যকে রস সঞ্চারের উপায় হিসাবে ব্যবহার অর্থাৎ বাহ্য উপায়ের প্রয়োগ, হেয় নাটকের লক্ষণ বলেই গণ্য হয় এবং ক্রমে এই জাতীয় দৃশ্যাত্মক-উপাদান-প্রধান, চমকপ্রদ, পরিস্থিতি-সর্বস্ব, বাহ্য উপায়-সহায় গভীর-জীবন-সমালোচনা-বিরহিত নাটককে "মেলোড্রামা" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই এই জাতিটির সম্ভাবনার আভাস দেওয়া হয়েছে।"

['এরিস্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব' : সাধনকুমার ভট্টাচার্য]

২.৩.৫ সংগীত

সংগীত নামক উপাদানটি ট্র্যাজেডির সবচেয়ে বেশি আনন্দদায়ক উপাদান। এই উপাদানটিকে অ্যারিস্টটল প্রধান 'embellishment' হিসাবে গণ্য করেছেন। গ্রিক নাটকে কোরাসের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। অর্থাৎ নাটকে সংগীতের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বস্তুত সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমেই ট্র্যাজেডির যাত্রারম্ভ। যে ছাগনৃত্য অনুষ্ঠিত হত তার উদ্দেশ্য ছিল শষ্যক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি করা যাতে দেবতা পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রাচুর্য দান করেন। এই উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হত। পরে ষষ্ঠ শতক থেকে সংলাপের জন্য এর মধ্যে চরিত্র যোগ করা হল।

গ্রিক নাটকে কোরাস সংগীত ও সংলাপের মাধ্যমে অভিনয়ের সৌকর্য বৃদ্ধি করত। প্রথম অবস্থায় নাটকে কোরাসের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কালক্রমে তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। থেসপিস থেকে ইউরিপিডিস পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সেখানে কোরাসের প্রাধান্য ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে,

সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অ্যারিস্টটল কোরাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে কোরাসকে অভিনেতারূপে গণ্য করতে হবে। কোরাস সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ঘটনায় সে অংশগ্রহণ করবে। কোরাস ঘটনাপ্রবাহের সূত্রধার। তারা বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে অতীতকে ব্যাখ্যা করে এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দান করে। কোরাসের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর মনোভাবকে প্রকাশ করেন। কোরাস সংগীত নৃত্য-নাটকে গীতিধর্মিতা সঞ্চার করে। নাটকের পরিবেশ রচনা, বৈপরীত্য প্রদর্শন, ঘটনা-প্রবাহের পারম্পর্য রক্ষা ও ব্যাখ্যা এবং মানসিক অবকাশের জন্যও কোরাসের মূল্য অপরিসীম। বস্তুত গ্রিক নাটকে কোরাসের এই অপরিহার্যতার দিকে লক্ষ রেখেই অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে সংগীতের উপযোগিতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন।

কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনার পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় সংলাপের প্রাধান্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে কোরাসের প্রাধান্য তত কমে গেছে। বস্তুত পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক সংলাপের সাহায্যে জীবনের রস-রূপ প্রকাশ করার সামর্থ্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে, বাহ্য উপকরণ এবং অলংকরণের প্রয়োজন তত কমেছে। এভাবেই ঔচিত্য-বোধের জাগরণ ও সম্প্রসারণের ফলে ট্র্যাজেডিতে সংগীতের স্থান ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়েছে। ট্র্যাজেডিতে সংগীত অপরিহার্য উপাদান না হলেও এই প্রসঙ্গে একথা অনস্বীকার্য যে অস্থানে সংগীত যোজনা ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্য নষ্ট করে, কিন্তু সুপ্রযুক্ত সংগীত যোজনার ফলে ট্র্যাজেডির গৌরবহানির কোনো আশঙ্কা নেই। সংগীত যেখানে কৃত্রিম উপায় হিসাবে প্রযুক্ত, সেখানেই তা দূষণীয়। সুপ্রযুক্ত সংগীত অন্যতম উপাদান হিসাবে অবশ্যই ট্র্যাজেডিতে স্থান লাভ করতে পারে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ট্র্যাজেডির উপাদানগুলির মধ্যে অ্যারিস্টটল কেন বৃত্ত বা প্লটকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

রচনারীতি বা 'ডিকশন' কী? এর সঙ্গে নাটকের সংলাপ বা ভাষার প্রসঙ্গটি কীভাবে জড়িত? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ট্র্যাজেডির ভাষায় অলংকার প্রয়োগের উপযোগিতা কী? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডিতে কোরাসের গুরুত্ব কতটুকু? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

২.৪ ষড়ঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব

ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যা বলেছেন তাতে দেখা যায় যে তিনি কাহিনিবৃত্ত বা প্লটকে প্রধান উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে তিনি যথাক্রমে চরিত্র এবং অভিপ্রায়কে নির্দেশ করেছেন। এই তিনটি ট্র্যাজেডির অন্তরঙ্গ উপাদান। ট্র্যাজেডির চতুর্থ উপাদান ভাষা, পঞ্চম সংগীত এবং ষষ্ঠ উপাদান দৃশ্যসজ্জা। এইগুলি ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ উপাদান হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। ঘটনাসজ্জা অথবা কাহিনিবিন্যাসকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার কারণ ট্র্যাজেডি মানুষের অনুকরণ নয় একটি ক্রিয়ার অনুকরণ। ট্র্যাজেডির লক্ষ্য ক্রিয়া। অ্যারিস্টটলের মতে ক্রিয়া বাদ দিলে ট্র্যাজেডি অসম্ভব, কিন্তু চরিত্রকে বাদ দিয়েও ট্র্যাজেডি সম্ভব হতে পারে। তাঁর মতে কাহিনির মানদণ্ডে ট্র্যাজেডির সাফল্য নির্ভরশীল। তাই কাহিনি ট্র্যাজেডিতে প্রধান। কাহিনিকে তিনি ট্র্যাজেডির আত্মা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, আর তাই কাহিনির পরে চরিত্রের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

অ্যারিস্টটলের মতে ক্রিয়াকে পরিস্ফুট করার জন্য ট্র্যাজেডি নর-নারীর চরিত্র অনুকরণ করে।

অভিপ্রায়কে তিনি গুরুত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে রেখেছেন। অভিপ্রায় হল সম্ভাব্য এবং উপযুক্ত ভাব প্রকাশের সামর্থ্য। ট্র্যাজেডির সংলাপে এর প্রকাশ। ট্র্যাজেডির চতুর্থ উপাদান হল রচনারীতি বা ভাষা। রীতি বলতে তিনি শব্দের মাধ্যমে অর্থের প্রকাশকেই বুঝিয়েছেন। উপাদান হিসাবে সংগীতকে তিনি পঞ্চম স্থানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁর মতে সংগীত ট্র্যাজেডির সবচেয়ে প্রীতিকর উপাদান। আপেক্ষিক গুরুত্বের বিচারে দৃশ্যসজ্জাকে অ্যারিস্টটল ষষ্ঠস্থানে রেখেছেন। দৃশ্যের আকর্ষণের কথা স্বীকার করেও তিনি বলেছেন অন্যান্য উপাদানের তুলনায় দৃশ্যসজ্জা সবচেয়ে কম শিল্পগুণান্বিত, কাব্যশিল্পের সঙ্গেও এর যোগ সামান্য। অভিনয় ও প্রযোজনা ব্যতিরেকেও ট্র্যাজিক অনুভূতির জাগরণ সম্ভব। তাছাড়া দৃশ্যসজ্জার প্রসঙ্গটি কবির দিক থেকে প্রযুক্ত নয়, —এটি অলংকরণকারীর।

২.৫ ট্র্যাজেডির স্বরূপ

অ্যারিস্টটলের প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তিনি ট্র্যাজেডি কাকে বলে, এর মাধ্যম ও রীতি এবং এর স্বরূপ বা ফলশ্রুতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। কাব্যের ধর্ম আনন্দ দান করা— অ্যারিস্টটল ছিলেন এই মতে বিশ্বাসী। কবির ধর্ম জীবনস্বরূপ ব্যক্ত করা। ট্র্যাজেডিতে তাই মানবজীবনের গম্ভীর পরিচয় সুন্দর রূপে ব্যক্ত হলে দর্শক-শ্রোতা আনন্দ লাভ করেন। এমনকি ঘটনাটি বেদনাদায়ক হলেও তা দর্শনে আনন্দ অনুভূত হয়। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে ঘটনা বেদনাদায়ক হলেও তার বাস্তব রূপায়ণ আমাদের আনন্দ দান করে।

মানুষের চরিত্রের নীতিবোধ ও সংকল্প ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয়। নাট্যকার এই ঘটনাকে পরিস্ফুট করেন যার মাধ্যমে জীবনের পরিচয় ও তাৎপর্য প্রকাশিত হয়। এতে দর্শকগণ আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দকে অহৈতুকী আনন্দের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। এই আনন্দের স্বরূপ কী তা মূলত বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার দাবিদার। ট্র্যাজেডির স্বরূপ বা এই আনন্দ-স্বরূপের প্রসঙ্গটি বস্তুত অ্যারিস্টটল কথিত ক্যাথারসিসতত্ত্বের সঙ্গে অন্বিত। অ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিসতত্ত্বের আলোচনা আমরা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে আনন্দস্বরূপের প্রাসঙ্গিক এবং প্রাথমিক পরিচয় দানের মাধ্যমেই আমরা আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করব।

অ্যারিস্টটল নাটক দর্শনে মানসিক বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গ (Catharsis) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চিত্তবৃত্তির সাম্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেউ নাটক দর্শন করে না। নাটক দর্শকমনে ভীতি ও করুণা সৃষ্টি করে। এদের মাধ্যমে আত্ম-অভিজ্ঞতা বিস্তৃতি লাভ করে ও দর্শক উপলব্ধিজনিত আনন্দ লাভ করেন। মানুষের মন যে পরিমাণে বিস্তীর্ণ

হয় তার আনন্দের ক্ষেত্রও ততদূর সম্প্রসারিত হয়। দুঃখের অভিজ্ঞতাও মানুষের কাম্য কারণ তার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে নিবিড়ভাবে অনুভব করে। চিত্তবৃত্তির সমতা সাধন ট্র্যাজেডির আনন্দরস উপভোগের ফল। ট্র্যাজেডিতে ঘটনাবলির মাধ্যমে দর্শকমনে যে ভীতি ও করুণা সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে বেদনা মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এই বেদনা দর্শককে আনন্দদান করে। লৌকিক বেদনার সঙ্গে ক্ষতির সম্ভাবনা জড়িত কিন্তু সাহিত্যে যে বেদনার পরিচয় পাওয়া যায় তা অলৌকিকতাহেতু আস্বাদ্য হয়ে ওঠে।

অ্যারিস্টটল পেরিপেটি ও ডিসকভারিকে আখ্যানের অংশ হিসাবে উপস্থিত করে দেখিয়েছেন যে এদের সাহায্যে নাটকের গঠনকৌশল ও মূলভাব পরিস্ফুট হয়। এদের আশ্রয়ে নাটকের নায়ক চরিত্রে বিপর্যয় পরিস্ফুট করা হয় ও সেই চরিত্রের সত্যোপলব্ধি ঘটে। তাঁর দুঃখে বেদনার্ত হয়েও আমরা আনন্দ উপভোগ করি, এই আনন্দই আমাদের মনকে সমতা ও শান্তি দান করে। নাটক দর্শনে নায়কের দুঃখের সঙ্গে দর্শকমন একাত্মতা বোধ করে। এতে মন বিশ্ববোধে পূর্ণ হয়। সহানুভূতির গুণে ব্যক্তি নিজের সংকীর্ণ পরিধি থেকে মুক্তি লাভ করে। যে ভীতির কথা অ্যারিস্টটল বলেছেন তা বস্তুত এক নৈর্ব্যক্তিক ভাব মাত্র। নায়কের জীবনের পরিণাম ও নিয়তির রূপ দর্শনের ফলে দর্শকমনে এই ভীতি সঞ্চারিত হয়। এর ফলে মন থেকে আত্মবোধ দূরীভূত হয় এবং দর্শকচিত্ত মানসিক অনুভূতি, শক্তি ও সমতা লাভ করে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

আপেক্ষিক গুরুত্বের বিচারে ট্র্যাজেডির উপাদানগুলিকে অ্যারিস্টটল কীভাবে বিন্যস্ত করেছেন? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

ট্র্যাজেডি দর্শনের ফলে উদ্ভূত ভয় ও করুণা কেন আমাদের আনন্দ দান করে? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাটি উল্লেখ করে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দেশ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

(খ) ট্র্যাজেডির উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এগুলির আপেক্ষিক গুরুত্বের বিষয়টি পরিস্ফুট করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

২.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

ট্র্যাজেডি **:** সংজ্ঞা ও ষড়ঙ্গ শীর্ষক এখানে আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবারে আসুন আমাদের সামগ্রিক আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যাক।

আলোচনার প্রথম স্তরে আমরা অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ট্র্যাজেডির বিশ্ববিশ্রুত সংজ্ঞাটির বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছি। আমরা দেখেছি যে ডিথিরাম্ব গীতি থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির উদ্ভবের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি যে ট্র্যাজেডি একটি গুরুগম্ভীর, সমগ্র ও বিশেষ আয়তনের ঘটনার অনুকরণ। এর ভাষা অলংকারমণ্ডিত, এর অনুকরণের রীতিটি কার্যাত্মক। ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য অনুকম্পা ও ভীতি উদ্রেক করা, যার ফলস্বরূপ উক্ত আবেগগুলির মোক্ষণ ঘটবে।

ট্র্যাজেডি জীবনের ভয়ানক ও করুণ ঘটনা অবলম্বনে রচিত ভয়ানক-মিশ্র করুণ রসাত্মক দৃশ্যকাব্য। সংগীত ও ছন্দের উপযোগিতা এতে রয়েছে। এর ঘটনা হবে নির্দিষ্ট মাপের; ঘটনা হবে আদি, অন্ত ও মধ্য সমন্বিত।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির ছয়টি উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। এদের তিনটি বহিরঙ্গ (রচনারীতি, দৃশ্যসজ্জা ও সংগীত) এবং তিনটি অন্তরঙ্গ (কাহিনি, চরিত্র ও অভিপ্রায়) উপাদান। তিনি ট্র্যাজেডির কাহিনিকে চরিত্রের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি কাহিনিকেন্দ্রিক, চরিত্র ছাড়াও ট্র্যাজেডি রচিত হতে পারে। ট্র্যাজেডির এই ছয়টি উপাদানের সুষ্ঠু প্রযোজনার মানদণ্ডেই রচনার সাফল্য নির্ভরশীল।

কাহিনি, আখ্যান বা প্লট সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এটি ট্র্যাজেডির আত্মা। চরিত্রকে তিনি দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন। তাঁর মতে চরিত্রের উপস্থাপনা নাটকে মুখ্য নয়, মুখ্য হল ঘটনা বা কার্যের অনুকরণ বা উপস্থাপনা। শব্দের মাধ্যমে অর্থের প্রকাশকেই তিনি রচনারীতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। গদ্য ও পদ্য উভয়ক্ষেত্রেই এর কার্য সমান। রচনারীতির সঙ্গে নাটকের সংলাপ বা ভাষার প্রসঙ্গটি জড়িত। নাটকের ভাষা তাঁর মতে অলংকারমণ্ডিত হওয়া উচিত। তিনি ট্র্যাজেডিতে মহৎ ভাবের উপযোগী মহৎ ভাষা ব্যবহারের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অভিপ্রায় বা ভাবনা বা মনন সম্পর্কে তিনি বলেছেন এটি মূলত শিল্পীর মননশীলতা প্রসূত সমগ্র রচনার পরিপূর্ণ ও পরিণত রস। ট্র্যাজেডি একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প, তাই এর রচনার ক্ষেত্রে উচ্চমানের চিন্তাভাবনা ও মনন প্রয়োজন। দৃশ্যসজ্জার আকর্ষণের দিকটি অ্যারিস্টটল স্বীকার করে নিলেও এর শিল্পগত কোনো উৎকর্ষ তিনি স্বীকার করেননি। সংগীতকে তিনি ট্র্যাজেডির সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর ও আনন্দজনক উপাদানের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে কাহিনিবৃত্ত বা প্লটকে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির প্রধান উপাদান রূপে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যথাক্রমে চরিত্র ও অভিপ্রায়। এই তিনটি ট্র্যাজেডির অন্তরঙ্গ উপাদান। ট্র্যাজেডির চতুর্থ উপাদান ভাষা, পঞ্চম সংগীত এবং ষষ্ঠ উপাদান দৃশ্যসজ্জা। এগুলি ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গগত উপাদান।

সাহিত্য-শিল্পের লক্ষ্য আনন্দদান, ট্র্যাজেডিতে পেরিপেটি ও ডিসকভারির আশ্রয়ে নায়কের চরিত্রে বিপর্যয় পরিস্ফুট করা হয় ও চরিত্রের সত্যোপলব্ধি ঘটে। চরিত্রের দুঃখে বেদনার্ত হয়েও আমরা আনন্দ উপভোগ করি, — এই আনন্দই আমাদের মনকে সমতা ও শান্তি দান করে।

২.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

ডায়োনিসাস :

গ্রিক দেবতা। ইনি যৌবন ও প্রজননের প্রতীকরূপে পূজিত।

২.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

প্রশ্নের তালিকা ষষ্ঠ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

২.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৩
অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'
ট্র্যাজেডির কাহিনি ও চরিত্র

বিষয় বিন্যাস

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ কাহিনি ও আখ্যান (Plot)

- ৩.২.১ ঘটনার ত্রিস্তর — আদি, মধ্য ও অন্ত
- ৩.২.২ ঐক্যবিন্যাস

৩.৩ কাহিনিবিন্যাস

- ৩.৩.১ বিপর্যাস ও বিপ্রতীপতা
- ৩.৩.২ উদ্‌ঘাটন
- ৩.৩.৩ দুর্ভোগ-দৃশ্য

৩.৪ ট্র্যাজেডির চরিত্র : নায়ক

- ৩.৪.১ নায়ক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ

৩.৫ প্লট ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক : প্লটের শ্রেষ্ঠত্ব

৩.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৩.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

ট্র্যাজেডির চরিত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটল মন্তব্য করেছেন যে, আখ্যানের দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ না থাকলে চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হতে পারে না। প্লট বা আখ্যানকে তিনি ট্র্যাজেডির প্রাণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। চরিত্রকে তিনি গুরুত্বের বিচারে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন। প্লটকে তিনি নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস অর্থে উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ আখ্যান হল নাটকের নায়ক চরিত্রের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কাহিনি। তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাহিনিতে কার্যকারণ সূত্রে ঘটনা সমাবেশ।

নাটকের জন্য কাহিনি সুগ্রথিত ও সুবিন্যস্ত হতে হবে। এটি হবে আদ্যন্ত কার্যকারণ-ধারাবাহিকতাসম্পন্ন। নাটকে কাহিনি-মাত্র বর্ণিত হয় না, বিভিন্ন চরিত্র পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে নাট্যকাহিনি গড়ে তোলে এবং সেই কাহিনির মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ

করে। ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত মানবজীবন-কাহিনি ব্যক্ত করাই বস্তুত ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। এই কাহিনির মধ্যে সুখ-দুঃখের বিচিত্র পরিণাম বিধৃত থাকে। এই ঘটনা শুধু বাইরের কার্যকলাপ ব্যক্ত করে না, মানসিক প্রবণতা, উদ্দেশ্য ইত্যাদিও প্রকাশ করে।

ট্র্যাজেডিতে নায়ক চরিত্র সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যে পতিত হয়। এই পতনের কাহিনি ঘটনার মাধ্যমে পরিস্ফুট করা হয়। বাহ্য ঘটনার পশ্চাতে নায়কের যে সংকল্প কার্যকরী হয়েছে, যে মনোভাব তাকে প্রেরণা দিয়েছে তাও ঘটনারই অন্তর্ভুক্ত।

কার্যের মধ্যে চরিত্রের নীতি ও মননধর্মিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যখন কোনো চরিত্র পূর্বাপর চিন্তা করে সংকল্প গ্রহণ করে তখন সেই সংকল্পের মধ্যে তার মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই মননধর্মিতা হল সংকল্প এবং একে চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করে তখন তাতে তার চরিত্র প্রকাশিত হয়। আর মননধর্মিতা হল চিন্তা এবং সংকল্প — যার অন্তরালে ব্যক্তির ও সম্মিলিত ইচ্ছার প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়। স্বভাবতই এই দুটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। মননধর্মিতা বা মানসিক চিন্তা ও কর্তব্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে এটি কোনো চিরন্তন সত্যকে পরিস্ফুট করে। অর্থাৎ চরিত্রের চিন্তার দ্বারা কোনো সর্বজনীন সত্য প্রকাশিত হয়। অতএব স্বতঃসিদ্ধভাবেই চরিত্র ঘটনার মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তাই ঘটনাকে বাদ দিলে চরিত্রের পক্ষে প্রকাশের অন্য উপায় থাকে না। এই সুবিন্যস্ত ঘটনাসমূহকেই অ্যারিস্টটল আখ্যান রূপে অভিহিত করেছেন। ঘটনা বলতে বাইরের কার্যাবলি ব্যতীত মানুষের চিন্তা ও আলোড়নকেও বোঝায়।

অ্যারিস্টটলের মতে নাটকের প্রধান ধর্ম ঘটনাবিন্যাস। চরিত্র তার নৈতিক গুণ ও চিন্তার সাহায্যে প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে অনুকূল করে তোলার প্রয়াস করে। মানুষের মনোবৃত্তি বা ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার বিরোধ ঘটে। অন্যদিকে তার অন্তর্লোকেও ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির সঙ্গে শুভবুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সংঘাতকে কেন্দ্র করে ঘটনাবর্তে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সংঘাত মাত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু যে সংঘাত একান্তভাবে মনোলোকের তা নাটকের বিষয় নয়। নাটকে বর্ণিত চরিত্রসমূহের মধ্যে এমন এক শক্তি পরিলক্ষিত হয় যা বাইরে তাদের সংকল্পসিদ্ধির মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

মানুষ কিছুসংখ্যক সহজাত বৃত্তি বা গুণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। আবার পরবর্তীকালে বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে মানুষ গুণ বা দোষ অর্জন করে। এই অর্থে কার্যই প্রধান, কারণ চরিত্র কার্যের ফল হিসাবে প্রকাশিত হয়। কার্যের মধ্যে চরিত্র নিজেকে প্রকাশ ও উপলব্ধি করে। কার্যের মাধ্যমে মানুষ সুখ বা দুঃখের পরিচয় লাভ করে। মানুষের চরিত্রের প্রবণতাসমূহ, নৈতিক আদর্শের ধারণা কার্যের মাধ্যমেই রূপলাভ করে। সুতরাং নাটকে চরিত্রের বক্তব্য ও কার্যের মধ্যে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

ঘটনা থেকে চরিত্র উদ্ভূত হয় এবং ঘটনার মধ্যে যখন চরিত্রের পরিচয় প্রকাশিত হয় তখন নাটকের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। চরিত্র যেমন ঘটনাকে প্রভাবিত করে, ঘটনাও তেমনি চরিত্রকে প্রভাবিত করে। নাটকে আকস্মিকতার কোনো স্থান নেই। এতে অভ্যন্তরীণ ঐক্যের নিয়মে ঘটনাসমূহের মধ্যে পারম্পর্য রক্ষিত হয়। ট্র্যাজেডির মধ্যে জীবনস্বরূপের পরিচয় ব্যক্ত হয়। বাস্তব জীবন অবিন্যস্ত, বিক্ষিপ্ত ও পারম্পর্য-বর্জিত। আর্ট এই অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আনয়ন করে।

অ্যারিস্টটলের মতানুসারে বলা যায় ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে আখ্যান এবং চরিত্র পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অ্যারিস্টটল যদিও কাহিনিকে চরিত্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, তবুও ঘটনা থেকে চরিত্রকে তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি হল ঘটনাবলির প্রতিফলন এবং একে প্রকাশ করার জন্য চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

আসুন, উপর্যুক্ত আলোচনার মানদণ্ডে ট্র্যাজেডিতে কাহিনি এবং চরিত্রের গুরুত্ব এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স সংক্রান্ত আলোচনার এই তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ট্র্যাজেডির কাহিনি ও চরিত্র সম্পর্কিত প্রসঙ্গসমূহ। আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, ট্র্যাজেডির যে ছয়টি উপাদানকে অ্যারিস্টটল চিহ্নিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে আখ্যান বা প্লটকে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। গুরুত্বের বিচারে আখ্যানের পরেই তিনি চরিত্রকে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে আখ্যান এবং চরিত্রের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বক্ষ্যমাণ বিভাগে আমরা এই দুটি প্রসঙ্গ-সম্পৃক্ত আলোচনাসমূহকে এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে —

- আপনারা আখ্যান বা প্লট সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারবেন, ধারণা অর্জন করতে পারবেন নাটকীয় ঐক্যবিধি এবং নাট্যদ্বন্দ্ব সম্পর্কে।
- কাহিনিবিন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে আপনারা কাহিনির ক্ষেত্রে বিপর্যাস, উদ্‌ঘাটন ইত্যাদির উপযোগিতাকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ট্র্যাজেডির চরিত্র তথা নায়ক চরিত্রের আলোচনার মাধ্যমে আপনারা ট্র্যাজেডি- নায়কের বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন। প্রসঙ্গত প্লট ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা থেকে আপনারা প্লটের শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গটি অনুধাবন করতে পারবেন।

৪.২ কাহিনি ও আখ্যান (Plot)

অ্যারিস্টটল-প্রদত্ত ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নাটকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের এক গভীর সম্পর্ক বর্তমান। ট্র্যাজেডির মধ্যে ঘটনার বিশেষ প্রাধান্য থাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ট্র্যাজেডি গড়ে ওঠে। এই ঘটনাকে অ্যারিস্টটল কাহিনি বা আখ্যান (Fable or Plot) হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সাধারণ অর্থে কাহিনি অর্থাৎ যা কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত না হয়েও আমাদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে সেই অর্থে অ্যারিস্টটল আখ্যানকে ব্যাখ্যা করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ই. এম. ফরস্টার কাহিনি ও আখ্যানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় সূত্রে মন্তব্য করেন যে কাহিনি কাল-ধারায় বর্ণিত হয় এবং আখ্যায়িকা গড়ে ওঠে কার্য-কারণ সূত্রে। কাহিনি আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে আর আখ্যান উদ্ভূত করে প্রশ্ন। আখ্যানের প্রাণ রহস্য, তাই মনন ও রসবোধের সাহায্য ব্যতিরেকে এর মর্মোপলব্ধি করা যায় না।

অ্যারিস্টটলের মতে বিন্যাস আখ্যানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিন্যাস সৃষ্টির কুশলতা প্রকাশ করে। শুধুমাত্র কাহিনি বর্ণনা নাট্যকার বা কবির ধর্ম নয়। পরিচিত কাহিনি নিয়ে নাটক রচিত হলেও নাট্যকারকে বিন্যাস বা আখ্যান নির্মাণের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। পরিচিত কাহিনির নববিন্যাসের মধ্যেই বস্তুত নাট্যকারের সৃষ্টিপ্রতিভা প্রকাশিত হয়। অ্যারিস্টটলের মতে প্রচলিত কাহিনি অনুরূপভাবে বর্ণনা করার কোনো সার্থকতা নেই। কবিকে কাহিনি এবং আখ্যান সার্থকরূপে বিন্যস্ত করতে হবে। নাট্যকার ঘটনাকে অনুকরণ করেন। এই অনুকরণের তাৎপর্য হল কার্য-কারণ সূত্রে পুনর্বিন্যাস। কিন্তু যা সুপরিচিত তার হুবহু অনুকরণকে কখনো সৃষ্টি রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অ্যারিস্টটলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ট্র্যাজেডি সুসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। এই শর্ত পূরণের জন্য এর মধ্যে থাকবে আদি, মধ্য ও অন্তের পর্যায়গত ঐক্য। আদি অর্থাৎ যা নিজেই কোনো ঘটনার সূচনা করে, — যা অন্য কোনোকিছুর পরিপূরক নয়। অন্ত অর্থে যা কোনো ঘটনার শেষাংশ ও যার পর উপসংহার হিসাবে কোনো কিছু নেই। পূর্ব এবং পর, — এই উভয় ঘটনাধারার কেন্দ্রস্থলে মধ্য অবস্থিত। অতএব আখ্যান যেমন-তেমনভাবে গঠন করা চলে না। সুগঠিত আখ্যানভাগসম্পন্ন একটি কাহিনি আকস্মিকভাবে আরম্ভও হয় না, শেষও হয় না। এর মধ্যে একটি ঐক্যরূপ থাকে, পারম্পর্যের একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধন এতে লক্ষণীয় হয়। কাহিনির মতো কল্পনার অবকাশ এখানে নেই। নাটকের পরিণতি তার সূচনার অপরিহার্য পরিণাম। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য অনুযায়ী ট্র্যাজেডির ঘটনাসমূহের মধ্যে পারম্পর্যের ধারা থাকা উচিত এবং তাতে অনাবশ্যক কোনো কিছুর স্থান নেই। নাটকের ঘটনাবলির মধ্যে একটা ক্রমপর্যায়ের পরিচয় থাকে। এই ঘটনাবলির মধ্যে আকস্মিকতা বা অসংগতির কোনো মূল্য নেই।

অ্যারিস্টটলের মতে নাটকের আখ্যান যেমন তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তার সূচনা ও পরিণতির মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি

বলেছেন ট্র্যাজেডি— 'is based on a single action, one that is a complete whole in itself'. জীবদেহ যেরূপ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়ে সুন্দররূপে গড়ে ওঠে ও এর একটি নির্দিষ্ট বিস্তার থাকে, নাটকের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুসংগতি ও বিস্তার। নাটকের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও পরিমিতি থাকা প্রয়োজন। দর্শকের গ্রহণ-শক্তির দ্বারাও নাটকের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হয়ে থাকে। সুসমঞ্জস নাট্যকাহিনি দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই।

নাটক ব্যক্তিজীবনকেন্দ্রিক। একজন ব্যক্তির জীবনে নানা ঘটনা ঘটতে পারে। সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা যায় না। ঠিক সেরূপ বহু ঘটনাপূর্ণ একজন মানুষের জীবনকে অখণ্ড রূপে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। তাই জীবনের যে কাহিনি কাব্যে বা নাটকে প্রকাশিত হবে তার মধ্যে থাকবে এক অখণ্ড ঐক্যবোধের পরিচয়। সেই কাহিনি থেকে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে সমগ্র নাটক বা শিল্পের ভাবগ্রন্থি শিথিলবদ্ধ হয়ে পড়বে। অন্যদিকে যে ঘটনা না থাকলে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না তা সমগ্রের অঙ্গীভূত নয়। তাই মূল ঘটনার সঙ্গে অসম্পৃক্ত কোনো ঘটনাকে নাট্যদেহে স্থান দেওয়া অযৌক্তিক।

আখ্যান (Plot) রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত থাকতে হবে। যা প্রাসঙ্গিক তা তিনি নির্বাচন করবেন ও অপ্রাসঙ্গিক অংশ বর্জন করবেন। তাঁর রচনাকে হতে হবে তাঁর অনুভূতি থেকে উৎসারিত, — যে অনুভূতিকে আবেগের তন্ময়তারূপে ব্যাখ্যা করা যায়। গ্রিকগণ কাব্য রচনাকে একপ্রকার উন্মত্ততা বলে মনে করতেন। অ্যারিস্টটলের মতেও 'Poetry is a thing inspired'. তাঁর মতে কাব্যরচনার জন্য কবিদের বিশেষ গুণ বা প্রতিভা অথবা ঐশ্বরিক উন্মাদনা থাকা প্রয়োজন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"আরিস্টটল কাহিনীকে সর্বজনীন রূপ দানের কথা বলিয়াছেন, এইখানে কবি ও নাট্যকারের বিশেষ দায়িত্বের প্রশ্ন আসে। চার্লস ল্যাম্ব তাঁহার 'The Sanity of True Genius' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন 'the true poet dreams being awake. He is not possessed by his subject, but has dominion over it.' গ্রীক নাট্যকারগণের মননধর্মিতার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাদের নাটকে। তাঁহাদের রচনা উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দান করে না; ইহার সহিত সর্বকালীন মানব-মনের যোগ আছে। যাহা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন তাহাই তাঁহাদের রচনার অবলম্বন ও আবেদন। নাট্যকারগণ নাটক রচনায় শুধু সঙ্গতির পরিচয় দেন নাই — জাগতিক সত্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিশ্বমনের উপযোগী করিয়া তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া অ্যারিস্টটল সর্বজনীন রূপের (universal form) কথা বলিয়াছেন। স্বভাবতঃ যাহা অপরিহার্য তাহাই নাটকে স্থান পায়, যাহা অনাবশ্যক

ও আকস্মিক তাহা বর্জিত হইয়া থাকে। কাব্য ও নাটকে বর্ণিত কাহিনীর একটি ধারাবাহিকতা থাকে। ইহা ভাবগত অর্থাৎ ঘটনাগত ঐক্যের দ্বারা বিধৃত। ইহার ফলে যাহা অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক তাহা বাদ পড়ে এবং ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে ঐক্য ও তাৎপর্য স্থাপিত হয়।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্' : ভবানীগোপাল সান্যাল]

৩.২.১ ঘটনার ত্রিস্তর — আদি, মধ্য ও অন্ত

অ্যারিস্টটল আখ্যান বা বৃত্তকে ট্র্যাজেডির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে অভিহিত করেছেন। ট্র্যাজেডির যে ছয়টি উপাদানের উল্লেখ তিনি করেছেন, তার মধ্যে বৃত্তের স্থান প্রথম। তাঁর মতে আখ্যান বা বৃত্তই হল নাটকের আত্মা (Soul of the drama)। 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে বৃত্তের গঠনের প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, বৃত্তকে সম্পূর্ণ (Complete) এবং সমগ্র (whole) হতে হবে। সম্পূর্ণ বা সমগ্র বৃত্তের তিনটি পর্ব থাকে। এই তিনটি পর্ব হল বৃত্তের আদি, মধ্য ও অন্ত। আদি পর্ব হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন সেই পর্বকে যার পূর্বে কিছু নেই, কিন্তু পরে কিছু আছে। অর্থাৎ "A beginning is that which is not necessarily after anything else, and which has naturally something else after it"(বাইওয়াটার-কৃত অনুবাদ)। আদি বলা যাবে তাকেই যা অন্য কোনো কারণের কার্যরূপ নয় কিন্তু পরবর্তী কোনো কিছুর কারণ। অন্ত হচ্ছে তাই যা কোনোকিছুর স্বাভাবিক পরিণতি কিন্তু তার পর অন্য কোনোকিছুর আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা থাকে না। মধ্যের একদিকে থাকে আদি অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার কার্য বা পরিণতি এবং অন্যদিকে অন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ঘটনার কারণ। সুগঠিত বৃত্তে এই তিনটি পর্বকে অ্যারিস্টটল চিহ্নিত করেছেন। সুগঠিত এবং সম্পূর্ণ বৃত্তকে এলোমেলোভাবে শুরু বা শেষ করা চলে না।

এই ধরনের বৃত্ত বা আখ্যান রচনার উদ্দেশ্যে নাট্য-ঘটনার বিন্যাসকেও বিকাশ-ধর্মের মহিমায় মণ্ডিত করতে হবে। বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয় অথবা 'জীববীজ' যেভাবে ক্রমবিকশিত হয়ে জীবের আকৃতি প্রাপ্ত হয়,— নানা অঙ্গের সমবায়ে এক-অঙ্গী জীব হয়ে ওঠে, অনুরূপভাবে আখ্যানের 'আদি' ঘটনাই ক্রমবিকশিত হয়ে 'মধ্য'-এর মাধ্যমে 'অন্ত'-এর পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এরূপ বৃত্তে ঘটনাসমূহের মধ্যে কার্যকারণ যোগসূত্র থাকে। বৃত্ত আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত হলে তাকে সমগ্র (whole) আখ্যায় ভূষিত করা যায়। বৃত্তের গঠন এরূপ না হলে বৃত্ত শিথিলবদ্ধ 'এপিসোডিক' হয়ে পড়ে। এমন বৃত্তে ঘটনাপারম্পর্য থাকলেও একটির সঙ্গে অপরটির অনিবার্য বা সম্ভাব্য যোগ থাকে না।

লক্ষণীয় যে অ্যারিস্টটল আদর্শ বৃত্তের পাশাপাশি নিকৃষ্ট বৃত্তের কথাও উল্লেখ করেছেন। আদর্শ রীতির বৃত্ত গঠনে যে সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা থাকে, সেগুলির মধ্যে কার্যকারণ যোগ অনিবার্য। অন্যদিকে এপিসোডিক বৃত্তে ঘটনার পর ঘটনা এমন কি অবান্তর ঘটনা যুক্ত করে এসমস্ত ঘটনার মধ্যে কোনো সম্ভাব্য এবং অনিবার্য যোগসূত্র অনুসরণ না করে একটা বিশৃঙ্খল ঐক্য গড়ে তোলা হয়। এতে গঠনের সুষমা থাকে না।

শুধু অঙ্গ-বিন্যাসের দিক থেকে আখ্যানকে সুসমঞ্জস করলেই চলবে না — তাকে একটি বিশেষ আয়তনেরও হতে হবে। বস্তুত আদর্শ বৃত্তের সৌন্দর্য তার আয়তন এবং সামঞ্জস্যের ওপর নির্ভরশীল। অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র জিনিসের সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তার আয়তন অনেকাংশেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয় উপভোগ্য জিনিস নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট হলে তার সৌন্দর্য সহজেই অনুভবগম্য হয়। অনুরূপভাবে নাটকের প্লট বা আখ্যানও নির্দিষ্ট মাপের হওয়া উচিত যাতে তা সহজেই স্মৃতিতে ধরে রাখা যায়। তদুপরি তাঁর মতে নাটকের বৃত্তের আয়তন এমন হওয়া উচিত যাতে আখ্যানের নায়ক সম্ভাব্য কিছু ঘটনায় দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্য বা সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে পারে।

৩.২.২ ঐক্যবিধি

আখ্যানের ঐক্যবিধি সম্পর্কিত আলোচনায় অ্যারিস্টটল বলেছেন যে নাটকের ঐক্য তিন রকম হতে পারে — ঘটনাগত, কালগত এবং স্থানগত। এই তিন ধরনের ঐক্যের মধ্যে তিনি ঘটনাগত ঐক্যের প্রসঙ্গেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে আখ্যানের ঐক্য অর্থে নায়কের জীবনের ঐক্যকে বোঝায় না। একটিমাত্র ব্যক্তির জীবনের ঘটনা নিশ্চয়ই বৃত্তের উপজীব্য, কিন্তু সেই ব্যক্তিটিকে কেন্দ্র করে আরো অনেক ঘটনা ও চরিত্র একত্রিত হবে। অনেক ঘটনা ও নানা চরিত্রের সন্নিবেশে অবশ্য বৃত্ত-ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবে না; আবার ওই বিশেষ ব্যক্তিটির জীবনের নানা ঘটনাও বৃত্ত-ঐক্যের পরিপন্থী হবে না। বহুবিচিত্র ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও ঘটনার ঐক্য যাতে সংরক্ষিত হয়, সব ঘটনা প্রাসঙ্গিক হয়ে যাতে সম্পূর্ণ ও সমগ্র বৃত্তটিকে রূপ দান করে তার প্রতি যত্নবান হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে একজন ব্যক্তির জীবনে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ ঘটতে পারে; এমনও হতে পারে যে একটি ঘটনার সঙ্গে অপর ঘটনার কোনো যোগাযোগই নেই, ফলে সে সব বিচ্ছিন্ন ঘটনার মিলনে কোনো ঐক্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন যেসব কবি হিরাক্লিসের জীবন নিয়ে বিভিন্ন আখ্যান রচনা করেছেন, আখ্যানের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা না থাকার জন্যই তাঁরা আখ্যানকে দৃঢ়বদ্ধ রূপ দিতে পারেননি। যেসব ঘটনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ নেই, তার মধ্যে সম্ভাব্য বা অনিবার্য সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়, — তাদের দ্বারা বৃত্ত-ঐক্য গঠন করা যায় না। অ্যারিস্টটল সাধারণভাবে একক ঘটনাকেই আদর্শ বৃত্তের পক্ষে উপযোগী বলে

মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে একক ঘটনা বলতে অ্যারিস্টটল একটি মাত্র ঘটনার কথা বলেননি, একক ঘটনা একাধিক ঘটনা নিয়েও সম্ভব — যদি সে সমস্ত ঘটনার মধ্যে সম্ভাব্য বা অনিবার্য সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য হল ভাবগত বা ঘটনাগত ঐক্য। এই ঐক্যকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করতে হলে নাটকে শুধুমাত্র প্রধান বিষয়সমূহ ব্যক্ত করতে হবে। এই ঐক্য রক্ষিত হলে আখ্যানের মধ্যে সুসমঞ্জস রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ও তার মধ্যে ব্যক্তিরূপ প্রকাশিত হয়। এতে নাটকের আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে ওঠে। অ্যারিস্টটলের নির্দেশানুযায়ী ঘটনাগত ঐক্য কাব্যিক ও নাট্যিক অনুকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"অ্যারিস্টটল আরম্ভ (beginning) ও শেষের (end) মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। এই আরম্ভ কোন এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে হইবে ও নির্দিষ্ট পরিণামে আসিয়া কাহিনী শেষ হইবে। সকল ঘটনার মধ্যে এক অনিবার্য, ক্রম পরিণামের পরিচয় থাকিবে। ইউরিপিদেস তাঁহার নাটকে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক ঘটনা, বৈপরীত্য ও কারুণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া ওঠে নাই। গ্রীক নাটকে সংহতির পরিচয় এত বেশী যে তাহা পড়িলে মনে হয় যে সম্পূর্ণ নাটকটি যেন এলিজাবেথীয় যুগে রচিত নাটকের অন্তিম পর্ব মাত্র। গ্রীক নাটক যেন চরমোৎকর্ষ হইতে শুরু হয়। যে ঐক্যের উপরে অ্যারিস্টটল গুরুত্ব দিয়াছেন তাহা নাটকে দুই ভাবে ঘটিত পারে। প্রথমত, নাটকীয় ঘটনাসমূহ কার্য-কারণ সূত্রে সুগ্রথিত হইয়া পরিণামের দিকে অগ্রসর হয় এবং দ্বিতীয়ত, একটি নৈতিক আদর্শ বা উদ্দেশ্য নাটকসমূহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতিটি নাটক আমাদের মনে গভীর ভাবগত তাৎপর্য বোধ সৃষ্টি করে। গ্রীক নাটক ব্যতীত আধুনিক কালে রচিত তত্ত্বনাটকসমূহে এই শেষোক্ত গুণটি আছে। সেখানে তত্ত্বের দিকটি সুপরিস্ফুট বলিয়া ভাবগত সংহতি নাটকে সহজে সম্পন্ন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' তত্ত্ব-নাটক না হইলেও তথায় মানবধর্ম ব্যাখ্যায় নৈতিক আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকসমূহে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকের অবতারণা বাস্তব-জিজ্ঞাসার পরিপন্থী হইলেও নৈতিক আদর্শের উদ্দেশ্যের দিকটি ইহাদের সংহতি দান করিয়া থাকে।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্' : ভবানীগোপাল সান্যাল]

এপিক ও ট্র্যাজেডির তুলনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল কালগত ঐক্যের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এপিকের কাল বা সময়সীমা স্থির বা সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু

ট্র্যাজেডির কাল বা সময়সীমা সূর্যের একবার আবর্তন-কালের মধ্যেই যতদূর সম্ভব সীমিত রাখা প্রয়োজন। অবশ্য সূর্যের একবার আবর্তন-কাল কতটুকু অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা না বারো ঘণ্টা এই বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তাছাড়া সময়সীমা বলতে নাট্য-ঘটনার না নাটকটি অভিনয়ের সময়সীমা বোঝানো হয়েছে — তাও স্পষ্ট নয়। তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে সূর্যের একবার আবর্তন-কাল হিসাবে চব্বিশ ঘণ্টা নয়, বারো ঘণ্টা সময়সীমার কথাই বলতে চেয়েছেন অ্যারিস্টটল।

স্থানগত ঐক্য রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্যসূত্রে গ্রিক নাটকে পালিত হত। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য এই যে একই সঙ্গে বহু স্থানের ঘটনা প্রদর্শন সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন— "In a play one can not represent an action with a number of parts going on simultaneously; one is limited to the part on the stage and connected with the actors" অর্থাৎ তিনি একটি সংকীর্ণ স্থানেই নাট্য-ঘটনাকে সীমিত করতে চেয়েছিলেন। তাই পরপর বিভিন্ন দৃশ্যে স্থানপরিবর্তন অনুচিত। এপিকের গঠন শিথিল হওয়ার জন্য এই স্থানপরিবর্তন এপিকের ক্ষেত্রে সম্ভব। তাছাড়া একথাও উল্লেখ্য যে, যে ঘটনা সূর্যের এক আবর্তনের মধ্যে সমাপ্ত হবে সে ঘটনা নিশ্চয়ই নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তাই ঘটনা যতদূর সম্ভব একটি স্থানে সংঘটিত হওয়া উচিত। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে গ্রিক ট্র্যাজেডিতে ঘটনাগত ঐক্য ছাড়াও কালগত ও স্থানগত ঐক্য রক্ষিত হত, — যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও রয়েছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"ঐক্য-ত্রয়ের — (ঘটনা-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং স্থান-ঐক্য) মর্যাদা বহুকাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এরিস্টটল 'ঐক্য' বলতে যা বুঝেছিলেন অনেক গ্রীক নাটকেই তা ছিল না। কাল-ঐক্য এবং স্থান-ঐক্যও যে অক্ষরে অক্ষরে সব ট্র্যাজেডিতে রক্ষিত হয়েছে সেকথা জোর করে বলা যায় না। কমেডি নাটকে তো ঐক্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা গোড়া থেকেই তেমন অনুভূত হয়নি। আজ "ঘটনা-ঐক্যের" বিশুদ্ধ রূপ খুব কমই দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই গঠন 'জৈবিক' (organic) না হয়ে এপিসোডিক হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে—ঐতিহাসিক ও চরিত-নাটকের ক্ষেত্রে ঘটনা-ঐক্য অপেক্ষা 'নায়ক-ঐক্য'-ই বেশী প্রকটিত হয়। কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তার বহুকালব্যাপী জীবনের ঘটনাকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে, এমন নাটক আজ দুর্লভ নয়। তারপর রোমান্সকাহিনীর মত বহুঘটনাময়, বহুদেশে-কালে ব্যাপ্ত কাহিনীকেও নাটকাকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ কথা সত্য "ঐক্য" নিয়ে আজ আর তেমন গোঁড়ামি কেউ করে না, কাল-ঐক্য এবং স্থান-ঐক্য তো আজ অতীত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।"

['এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব' : ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

সাধারণ কাহিনি এবং আখ্যানের মধ্যে পার্থক্য কী? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আখ্যান এবং চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কী? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আদর্শ বৃত্তের সৌন্দর্য তার আয়তনের ওপর কীভাবে নির্ভরশীল? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটল কেন আখ্যানকে আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিন পর্বে বিভক্ত করেছেন? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ভাবগত বা ঘটনাগত ঐক্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য কী? (৩০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

কাহিনি ও আখ্যানের পার্থক্য প্রদর্শন করে আখ্যানের ঐক্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৩.৩ কাহিনিবিন্যাস

বাস্তব জীবনের ঘটনা এবং নাটকীয় ঘটনা — এই দুই ধরনের ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বস্তু-জীবনের ঘটনা সরলরৈখিক ও কালানুক্রমিক অর্থাৎ ক্রমান্বয়ের সূত্র অনুসারে তা সংঘটিত হয়। নাটকের ঘটনায় এই ক্রমান্বয়ের পরিবর্তে এমন এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় যে, তার দ্বারা নাট্য-ঘটনা পাঠক-দর্শকের বোধ ও বিবেচনার পক্ষে বিশেষভাবে চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। চমক না থাকলে নাটকীয়তাও থাকে না। এই নাটকীয়তা তৈরি হয় নাট্য-কাহিনিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সংযোজনায়। দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করেই কাহিনিগত উত্থান-পতন সৃষ্টি হবে এবং তারই আলোড়নে সমস্ত বিষয়টি নাটকীয় আকৃতি লাভ করে পাঠক-দর্শকের চিত্তে ভাবের আলোড়ন উপস্থিত করবে — তাতেই নাটকের চরিতার্থতা। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা ইংরেজি কনফ্লিক্ট নামক বিষয়টির সঠিক কোনো পরিভাষা ব্যবহার না করলেও তিনি বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বন্দ্ব-সংঘাত কাহিনির মধ্যেই অবস্থান করে, চারিত্রিক আত্মদ্বন্দ্ব ও কাহিনির অন্যান্য জটিলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। ট্র্যাজিক কাহিনি কীভাবে বিন্যস্ত হবে, তাতে কী কী বিষয়ের বর্ণনা থাকবে ইত্যাদি সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বহু খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর এই পর্যালোচনার মধ্যেই

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বাহ্যিক প্রকার সহ অনেক মৌলিক ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছে। এসমস্ত বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি কিছু মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করেছেন।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির কাহিনিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন — সরল (simple) এবং জটিল (complex)। ঘটনা যখন ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে এবং তার মধ্য দিয়ে বৃত্ত এগিয়ে চলে তখন সেই বৃত্তকে সরল বৃত্ত বলা যায়। এতে ঘটনার কার্যকারণের সংযোগ থাকে না। এই সরল শিথিলবদ্ধ বৃত্তে নায়কের জীবনে পরিবর্তন ঘটে পরিস্থিতি বিপর্যয়, বিপর্যাস বা বিপ্রতীপতা (peripety) এবং আবিষ্ক্রিয়া বা উদ্‌ঘাটন (Discovery) ছাড়াই। যখন ঘটনাধারা চলতে চলতে বিপরীতমুখী হয় — মন্দ থেকে ভালো বা ভালো থেকে মন্দের দিকে অগ্রসর হয় তখনই ঘটে পরিস্থিতি বিপর্যয়। আর আবিষ্ক্রিয়া বা উদ্‌ঘাটনের অর্থ হল অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে উত্তরণ। ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আবিষ্ক্রিয়া ঘটতে পারে।

জটিল বৃত্তে নাট্য-ঘটনা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয় এবং তাতে পরিস্থিতি বিপর্যয় ও উদ্‌ঘাটন দুটির একটি বা দুটিই থাকে। সরলরেখায় এই ধরনের বৃত্ত অগ্রসর হয় না — কখনো তা বিপরীতমুখী হয় — যার ফল সুখ অথবা দুঃখ। এই বৃত্ত অজ্ঞাত কোনো কিছুর উদ্‌ঘাটন করে। ট্র্যাজেডির অনুকম্পা ও ভয়ভাব এই জটিল বৃত্তকে আশ্রয় করেই দর্শকচিত্তে অনুভূত হয়। বস্তুত জটিল বৃত্তই আদর্শ বৃত্ত। বিপর্যাস ও উদ্‌ঘাটন বৃত্তের এই দুই অংশ আকস্মিকতা এবং কৌতূহলে পরিপূর্ণ। বৃত্তের অন্য আর একটি অংশ আছে, তা হল দুর্ভোগ-চিত্র বা যন্ত্রণাময় দৃশ্য (catastrophe)।

৩.৩.১ বিপর্যাস বা বিপ্রতীপতা

'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে বিপ্রতীপতা বা পেরিপেটি প্রসঙ্গে বলেছেন— "A peripety is the change of the kind describe from one state of things to the opposite, and that too in the way we are saying, in the probable or necessary sequence of events" (বাইওয়াটারকৃত অনুবাদ)। অর্থাৎ পরিস্থিতি বিপর্যয় হল এক ধরনের পরিবর্তন — যেখানে ঘটনা এক অবস্থা থেকে সম্ভাব্য ও আবশ্যকের নিয়মাধীন হয়েও তার বিপরীত কোটিতে গিয়ে উপনীত হয়। পেরিপেটিতে ঈপ্সিত পরিণতির স্থানে অন্য এক অবস্থার উদ্ভব হয় ও তা নাটকীয় ঘটনাবলির অপরিহার্য নিয়মে ঘটে। এতে কতকগুলি ঘটনার সমাবেশে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ঈপ্সিত মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপ্রতীপতা নায়ক চরিত্রকে প্রধানত দুর্ভাগ্যের মধ্যে আকর্ষণ করে। দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিপর্যাস বা বিপ্রতীপতা হল অবস্থার পরিবর্তন (Reversal of fortune), কিন্তু নায়কের দিক থেকে তা অবশ্যই অনভিপ্রেত। নায়কের আকাঙ্ক্ষিত পরিণামের পরিবর্তে নায়কের মনোভাব ও কার্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পেরিপেটিতে সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইডিপাস সত্য অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক, কিন্তু যা তিনি লাভ করলেন তা তাঁর ও রানি

জোকাস্টার পক্ষে শোকাবহ রূপ পরিগ্রহ করল। ট্র্যাজেডিতে এই পেরিপেটি বা বিপ্রতীপতা থাকার জন্যই দর্শক মনে ভীতি ও করুণা সৃষ্টি হয়। তবে যেখানে দৈবের নিগ্রহে অবস্থার বা সৌভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে সেখানে পেরিপেটি উদ্ভূত হয় না।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"অবস্থা পরিবর্তন যদি অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হয় তাহলে তা নাটকের সংঘাতময়তাকে বাড়িয়ে তোলে, পরিবর্তন মাত্রই নাটকীয়, অবস্থা পরিবর্তনের মধ্যেই নাটকীয় উপাদান আছে। ট্র্যাজেডিতে ভাল থেকে মন্দে, সুখ থেকে দুঃখে, আনন্দ থেকে বেদনায়, জীবন থেকে মৃত্যুতে এই পরিবর্তন সাধিত হয় বলে ট্র্যাজেডির মধ্যে আতংক ও ভয় দানা বেঁধে থাকে। আবার এই পরিবর্তন যদি সম্পূর্ণ অতর্কিত ও আকস্মিক পরিবেশের মধ্যে রূপ পায় তাহলে ভয় ও আতংকের পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে যায়, পরিণামে তা প্রভূত আনন্দ রসে উত্তীর্ণ হয়। পরিবর্তন যদি প্রত্যাশিত পথ অনুসরণ করে ধীরেসুস্থে সংঘটিত হয় তাহলে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয় না এবং তা পরিণামে প্রভূত আনন্দও সঞ্চার করে না।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা' : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ]

৩.৩.২ উদ্‌ঘাটন

ডিসকভারি বা উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, এটি হল গ্রন্থিমোচনের ফলে পরিপূর্ণ বা প্রকৃত জ্ঞানলাভ। পেরিপেটির সঙ্গে ডিসকভারি সংযুক্ত থাকে। সাধারণত নায়কের জীবনের বিপর্যয়ের পরে তাঁর অজ্ঞতার অবসান ঘটে। এতে পূর্ণ বৃত্ত রচিত হয়। এই ঘটনাকে বোঝাবার জন্য অ্যারিস্টটল 'অ্যানাগনরিসিস' — এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি অনুবাদে এটি 'রেকগনিশন'। কিন্তু 'রেকগনিশন' মানে স্বীকৃতি নয়, ডিসকভারি বা পরিচিতি। এই পরিচিতি অ্যারিস্টটলের মতে এক ধরনের পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন হল অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে পরিবর্তন। সহজ কথায় একে আবিষ্কারও বলা যায়। অ্যারিস্টটলের বিচারে অজানা ও গুপ্ত তথ্যকে সর্বসমক্ষে নিয়ে আসার নামই উদ্‌ঘাটন বা পরিচিতি বা আবিষ্কার।

উদ্‌ঘাটনের ফলে যেসমস্ত ব্যক্তির সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনুরাগ বা ঘৃণার সৃষ্টি হয়। সেই উদ্‌ঘাটন বা প্রত্যভিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যেখানে পরিস্থিতি বিপর্যয়ের সঙ্গেই তা উদ্ভূত হয়। উদ্‌ঘাটনের আরো বহুবিধ রূপ আছে। অতিশয় তুচ্ছ অচেতন পদার্থও প্রত্যভিজ্ঞানের কারণ হতে পারে। আবার কোনো ব্যক্তি সত্যই কোনো কাজ করেছে কি না তাও উদ্‌ঘাটনের কারণ হতে পারে। বৃত্ত বা ঘটনার সঙ্গে যে উদ্‌ঘাটন গভীরভাবে যুক্ত, তা ব্যক্তির উদ্‌ঘাটন। এরূপ উদ্‌ঘাটনের

সঙ্গে যদি পরিস্থিতি বিপর্যয় বা বিপ্রতীপতা যুক্ত হয় তাহলে তা অবশ্যম্ভাবী রূপে অনুকম্পা ও ভীতিভাব জাগ্রত করে। এরূপ পরিস্থিতির উপরই ভালো কিংবা মন্দভাগ্য নির্ভরশীল।

৩.৩.৩ দুর্ভোগ-দৃশ্য

ট্র্যাজিক নাট্য-কাহিনির বিন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে অ্যারিস্টটল বেদনাদায়ক দৃশ্য বা দুর্ভোগ-দৃশ্যের (Catastrophe) উল্লেখ করেছেন। বৃত্তের অন্য দুটি অংশ বিপ্রতীপতা এবং উদ্‌ঘাটন আকস্মিকতা ও কৌতূহলে পূর্ণ, আর এই তৃতীয় অংশে পরিবেশিত হয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা যেমন মঞ্চের ওপরেই মৃত্যু, দৈহিক যন্ত্রণা, আঘাত ইত্যাদির প্রদর্শন।

ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যেহেতু দুঃখ ও বেদনাপূর্ণ ঘটনাবলি, তাই এর মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্যাবলি বা দুর্ভোগচিত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়। ট্র্যাজেডি মূলত দুঃখ ও বেদনার অভিজ্ঞান, তাই ট্র্যাজেডিতে যন্ত্রণাদায়ক ও আতঙ্কময় দৃশ্যসমূহ সংযোজিত হতে পারে অবশ্যই। বস্তুত অবস্থা পরিবর্তন বা বৈপরীত্য ও উদ্‌ঘাটনের মতো দুর্ভোগ দৃশ্যও ট্র্যাজেডির কাহিনি বা কথাবস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এদের কোনোটিকে বাদ দিয়েই উপযুক্ত ট্র্যাজিক কাহিনিবিন্যাস সম্ভব নয়।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

অ্যারিস্টটল কাহিনিবৃত্ত সম্পর্কে সরল এবং জটিল এই দুই অভিধা কেন প্রয়োগ করেছেন? তিনি জটিল বৃত্তকে আদর্শ বৃত্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন কেন? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পেরিপেটি কী? আখ্যানে এটি কী পরিবর্তন সূচিত করে? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আখ্যানে উদ্‌ঘাটনের গুরুত্ব কতটুকু? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৩.৪ ট্র্যাজেডির চরিত্র : নায়ক

ট্র্যাজেডির নায়ক-বিষয়ক আলোচনার সূচনায় অ্যারিস্টটল প্রথমেই বলেছেন যে ট্র্যাজেডি— "Imitations which excite pity and fear, this being the distinctive mark of tragic imitation" — অর্থাৎ ট্র্যাজেডির বৃত্ত, নাটকের ভাগ্যবিপর্যয় ইত্যাদি এমন ধরনের হওয়া উচিত যাতে করুণা ও ভয় জাগ্রত হয়। বস্তুত ট্র্যাজেডি-নায়কের জীবনের ঘটনাই এই দুই ভাব জাগ্রত করে ক্যাথারসিস সম্পন্ন করে। অতএব ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রকে এমন হতে হবে যাতে এই উভয় ভাব দর্শকচিত্তে জাগে। এইসূত্রেই তিনি বলেছেন —

(ক) কোনো ধার্মিক, সজ্জন ব্যক্তির ঐশ্বর্য-সম্ভোগ থেকে দুঃখ-দুর্ভোগে পতনের চিত্র ট্র্যাজেডিতে প্রদর্শন করা উচিত নয়। কারণ এই পতনের দৃশ্য আমাদের মধ্যে অনুকম্পা ও ভয় কোনো ভাবই জাগ্রত করে না, বরং তা মনে আঘাত দেয়।

(খ) কোনো মন্দ ব্যক্তির দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে ঐশ্বর্য-সম্ভোগে উত্থানের চিত্রও প্রদর্শন করা অনুচিত; কারণ ট্র্যাজেডির আত্মার পক্ষে তা অত্যন্ত প্রতিকূল। এমন চিত্র আমাদের নৈতিক বোধ এবং অনুকম্পা বা ভয় কোনো কিছুকেই জাগ্রত করে না।

(গ) অতি দুর্বৃত্তের পতনের দৃশ্যও ট্র্যাজেডির পরিপন্থী। এতে আমাদের নৈতিক বোধ তৃপ্ত হলেও অনুকম্পা বা ভয় কোনোটিই উদ্রিক্ত হয় না। অনুকম্পা বা করুণা জাগে অনুচিত দুর্ভোগ প্রদর্শনে এবং ভয় জাগে আমাদের মতো মানুষের বিপর্যয় দেখে। সুতরাং অতি ধার্মিক এবং অতি দুর্বৃত্ত চরিত্র বাদ গেলে বাকি থাকে সেই চরিত্র যা এই দুই অতি-মাত্রার মধ্যবর্তী চরিত্র অর্থাৎ যে অতি ভালো বা অতি

দুর্বৃত্ত নয়, আর যার পতন ঘটে কোনো নীচতা বা পাপের ফলে নয়, — ঘটে ভ্রান্তি বা দুর্বলতার ফলে।

ট্র্যাজেডি-নায়ক সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের আরো কিছু বক্তব্য আছে। যেমন—

১) কমেডির সঙ্গে তুলনায় তিনি বলেছেন কমেডি 'Lower type'-এর মানুষের অনুকরণ করে। কিন্তু ট্র্যাজেডি অনুকরণ করে 'Higher type'-এর নায়কের।

২) ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্র হবেন অতিশয় বিখ্যাত (Highly renowned) এবং সমৃদ্ধিশালী (Prosperous)।

৩) ট্র্যাজেডি সেইসমস্ত মানুষের অনুকরণ করে যাঁরা 'are above the common level'—অর্থাৎ অসাধারণ।

৪) ট্র্যাজেডির নায়ক দৈহিক দিক থেকে সক্রিয় না হলেও মানসিক বা আত্মিক দিক থেকে সক্রিয় কিনা তা বিবেচ্য।

ট্র্যাজেডি মানবজীবনের গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ করে, অতএব তার নায়ককেও তদুপযোগী মহিমান্বিত হতে হবে অর্থাৎ তাঁর নায়কোচিত গৌরব থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অ্যারিস্টটল নায়ককে যে ঐশ্বর্যশালী ও বিখ্যাত ব্যক্তি হতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন পরবর্তীকালে তা উপেক্ষিত হয়েছে। আধুনিক কালের ট্র্যাজেডির নায়ক সাধারণ মানুষ। এমনকি নায়ককে অধুনা সর্বজন-পরিচিত ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিও হতে হয় না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় অ্যারিস্টটল উচ্চস্তরের মানুষ বলতে মূলত সেই মানুষের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, যাঁর নৈতিক উদ্দেশ্য সাধু। তাই এই বিচারে বলা যায় অতি বিখ্যাত বা সমৃদ্ধিশালী না হয়েও মানুষ 'Higher type'-এর হতে পারে। এই কথা 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল স্বীকার করেছেন। তবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি না হলেও ট্র্যাজেডি-নায়কের চরিত্রমাহাত্ম্য অবশ্যই থাকা চাই।

অ্যারিস্টটল যে মাঝামাঝি শ্রেণির মানুষদেরই ট্র্যাজেডি-নায়কের মর্যাদা দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর এ সিদ্ধান্তও সমালোচিত হয়েছে। ষোড়শ শতকের ইতালীয় সমালোচক কস্টেলভেট্রো বলেছিলেন যে নির্দোষ ব্যক্তি এমনকি সাধু-সন্ত শ্রেণির মানুষেরও ট্র্যাজেডি-নায়ক হতে বাধা নেই। পরবর্তীকালে তাঁর এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন। অতি ভালো বা অতি মন্দ চরিত্র যদি অনুকম্পা জাগাতে সমর্থ হয় তবে তা নায়ক চরিত্রের উপযুক্ত।

নায়কের বিচার-ভ্রান্তির জন্য বা দুর্বলতার জন্য তাঁর জীবনে যে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে বলে অ্যারিস্টটল মত প্রকাশ করেছেন তাও পরবর্তীকালের সমস্ত ট্র্যাজেডি-নায়কের ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি। আধুনিককালের অনেক সামাজিক নাটকে নায়কের পতনের জন্য অর্থনৈতিক কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'পোয়েটিকস্'-এর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল জানিয়েছেন যে উৎকৃষ্ট কয়েকটি পরিবারের কাহিনি নিয়ে গ্রিক ট্র্যাজেডিসমূহ রচিত হয়েছে। এগুলির নায়কগণের

মধ্যে অনেকেই ভয়ঙ্কর কিছু করেছেন অথবা ভয়ানক দুর্ভোগ তাদের হয়েছে। এই নায়কদের মধ্যে অনেকেই সক্রিয় বা কর্মতৎপর, আবার অনেকেই সক্রিয় না হয়েও চূড়ান্ত দুর্দশায় পতিত হয়ে যন্ত্রণাভোগ করেছেন। কিন্তু তাঁরা মানসিক বা আত্মিক দিক থেকে যথেষ্ট সক্রিয়। আর এই মানদণ্ডেই অ্যারিস্টটল সক্রিয়তাকে ট্র্যাজেডি-নায়কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে অভিহিত করেছেন।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি-নায়কের চারটি বিশেষ লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন. আমরা এবার সেগুলো আলোচনা করব।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"চরিত্র মানে যাকে বা যে ব্যক্তিকে কিংবা যাদের কেন্দ্র করে গল্প উপন্যাস নাটক প্রভৃতির ঘটনাধারা আবর্তিত হয়। তার মানে চরিত্র এক হতে পারে, একাধিকও হতে পারে। যদি একাধিক হয় ত সব কটি চরিত্রের গুরুত্ব সমান হয় না, হতে পারে না; কারো গুরুত্ব কিছু বেশি, কারো বা কিছু কম হয়। যার গুরুত্ব সর্বাধিক ও মূলত যার ক্রিয়াকর্ম ঘটনাধারার মধ্যে বিশেষ ভাবে বিবৃত, তাকে আমরা আধুনিক পরিভাষায় নায়ক বলি। অ্যারিস্টটল পোয়েটিক্সের কোথাও নায়কের উল্লেখ করেন নি, এমনকি প্রিন্সিপ্যাল ক্যারেকটার বা প্রধান চরিত্রের কথাও নয়। তিনি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শুধু চরিত্রের কথাই বলেছেন। তবে তাঁর বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা যা বোঝা যায় তার সহিত আমাদের নায়ক চরিত্রের হুবহু মিল আছে। অ্যারিস্টটল লিখেছেন ট্র্যাজিক ঘটনা একটি বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হবে। এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে প্রধান চরিত্র বা নায়ক।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা' : সুধাংশু শেখর তুঙ্গ]

৩.৪.১ নায়ক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছেন। প্রথমত, ট্র্যাজেডি-নায়কের চরিত্র ভালো (good) হওয়া উচিত। ভালো অর্থাৎ নীতিগত দিক থেকে ভালো। মানুষের কথা ও কাজের দ্বারা তার চরিত্র বিচার্য। যে চরিত্র কথায় ও কাজে নীতি এবং সংগতি বজায় রাখে তাকে ভালো বলে অভিহিত করা যায়। ট্র্যাজেডির চরিত্রকে মানুষ হিসাবে এই গুণসম্পন্ন হতে হবে। দ্বিতীয়ত, চরিত্রে ঔচিত্যবোধ বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ চরিত্রটি হবে স্বাভাবিক (Appropriate) বা বিষয়ের অনুরূপ। পুরুষের পক্ষে পৌরুষত্বব্যঞ্জক চরিত্রই স্বাভাবিক, কিন্তু নারীর গুণ পেলবতা, নারীর পক্ষে পৌরুষত্ব বেমানান। স্ত্রীলোকদের শৌর্যবীর্য বা চাতুর্য প্রদর্শিত হলে তা ঔচিত্যধর্ম লঙ্ঘন করবে। অর্থাৎ ট্র্যাজেডিতে যে চরিত্র যেভাবে মানাবে, তাকে সেভাবেই উপস্থাপিত করতে হবে। তৃতীয়ত, চরিত্রটি বাস্তবানুগ (real) হবে বা

সংগত হবে। সংগত অর্থাৎ বিশ্বজগতে যে ব্যক্তির যেমন স্বাভাবিক ধর্ম বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, ট্র্যাজেডিতে তাকে সেভাবেই অঙ্কন করতে হবে। চোরের চরিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে যদি সাধুর চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়, অথবা সাধুর স্থানে চোর, তাহলে তা জাগতিক নিয়মের পরিপন্থী হবে। চতুর্থত, চরিত্রটি হবে সংগতিসম্পন্ন (consistent) অর্থাৎ চরিত্রে একপ্রকার চরিত্রগত সমন্বয় বা সংগতি থাকবে। এটি চরিত্রের একান্তই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার — ভালো অথবা মন্দ যাই হোক না কেন নাট্যকার আদ্যন্ত চরিত্রটির গুণ, ধর্ম ও সত্তার কোনোরূপ অপলাপ করবেন না, করলে চরিত্রটি তার সমন্বয়গত বিশেষত্ব থেকে চ্যুত হবে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"নাটকের চরিত্রকে ভালো, ঔচিত্যযুক্ত, বাস্তবিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে — এই চারটি লক্ষণের কথা বলে তিনি জানিয়েছেন যে নাটকে বৃত্তের গঠনে যেমন, তেমনি চরিত্রাঙ্কনে অনিবার্যতার (Necessity) ও সম্ভাব্যতার (Probability) সূত্র নাট্যকারকে মেনে চলতে হবে। কোনো বিশেষ চরিত্রের ব্যক্তি অনিবার্য বা সম্ভাব্যের নিয়ম-অনুসারে একটি বিশেষ ধরনের কথা বলবে বা কাজ করবে। যেমন বৃত্তে এক ঘটনার পরে অন্য ঘটনা ঘটবে অবশ্যম্ভাবিতা বা সম্ভাব্যতার ক্রম রক্ষা করে। আর ট্রাজেডি যেহেতু সাধারণ স্তরের মানুষের চেয়ে অধিকতর ভালো চরিত্রের অনুকরণ, তাই ভালো চিত্রকরের আদর্শই নাট্যকারদের অনুসরণ করা উচিত।"

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপর্যুক্ত চারটি লক্ষণ-সূত্র অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁর এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণ নায়ক-চরিত্রের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য। তদুপরি অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজিক ঘটনা একটি বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হওয়া উচিত। আর এই উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সেই বিশেষ চরিত্রের মানদণ্ডেই নির্ণীত হয়েছে। সুতরাং ট্র্যাজেডির নায়ক নিঃসন্দেহে এই বৈশিষ্ট্যসমূহের দাবিদার হিসাবে গণ্য হতে পারেন।

৩.৫ প্লট ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক : প্লটের শ্রেষ্ঠত্ব

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে ছয়টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি যথাক্রমে আখ্যান, চরিত্র, ভাষা, অভিপ্রায়, দৃশ্যসজ্জা ও সংগীত। এগুলির মধ্যে আখ্যানকে তিনি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে নাটকে আখ্যান (Plot) গড়ে ওঠে। ট্র্যাজেডি তাই মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। ট্র্যাজেডির ধর্ম জীবনস্বরূপের পরিচয় দান। ট্র্যাজেডি এই অর্থে কোনো ব্যক্তির জীবনকে পরিস্ফুট করে না, মানবজীবনের রূপ অঙ্কন করে।

অ্যারিস্টটলের মতে চরিত্রের অর্থ নৈতিক গুণাবলি। মানুষের সুখ-দুঃখ তার কার্যের দ্বারা নিরূপিত হয়। তাঁর মতে মঞ্চে অভিনেতাগণ চরিত্র পরিস্ফুট করার জন্য অভিনয় করেন না। তবে ঘটনাবলিকে রূপ দানের জন্য চরিত্রের সহযোগিতা আবশ্যক। সুতরাং ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আখ্যানকেন্দ্রিক। তাঁর মতে চরিত্রকে বর্জন করেও ট্র্যাজেডি রূপলাভ করতে পারে; কিন্তু ঘটনা বা আখ্যান ব্যতীত ট্র্যাজেডি রচনা অসম্ভব। কোনো ব্যক্তি যদি দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রে কিছু বক্তব্য গ্রথিত করেন, এবং যদি সেই বক্তব্যের মাধ্যমে চরিত্রের অভিপ্রায় দ্যোতিত হয়ে ওঠে তবু তা সার্থক নাটক হবে না। ঘটনার কার্যকারণ ধারার সমবায় ব্যতীত আখ্যান গড়ে ওঠে না। সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতে আখ্যান হল ট্র্যাজেডির প্রাণ, চরিত্রের স্থান এর পরে।

অ্যারিস্টটল চরিত্রের তিনটি অংশ চিহ্নিত করেছেন। এগুলির মধ্যে একটি চরিত্রের নৈতিক গুণাবলি, অপরটি তার কার্যসম্পাদনের শক্তি এবং সর্বশেষ হল সেই কার্যের জন্য সংকল্প বা অভিপ্রায় গ্রহণ। প্রথমাবস্থায় অ্যারিস্টটল চরিত্রকে নৈতিক গুণের সমাবেশ রূপে ব্যাখ্যা করলেও পরে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে চরিত্র শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। চরিত্রের ক্রমবিকাশ নাটকে পরিলক্ষিত না হলে তা ট্র্যাজেডির পক্ষে অনাবশ্যক ভারস্বরূপ। এ থেকে বোঝা যায় তিনি ট্র্যাজেডিকে ক্রমোদভিন্ন জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুতরাং চরিত্র বলতে অ্যারিস্টটল তার নৈতিকগুণ, অভিপ্রায় এবং কাজ করার ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

অ্যারিস্টটলের বক্তব্য হল ট্র্যাজেডি ঘটনাবলির প্রতিফলন এবং একে পরিস্ফুট করার জন্য চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অভিপ্রায় বা সংকল্প এর পরবর্তী উপাদান হিসাবে যোজিত হয়। চরিত্রের বক্তব্য হবে ঘটনা অনুযায়ী। নির্বস্তুক বিষয়-নির্ভর বক্তব্যের কোনো অবকাশ নেই। অর্থাৎ নাট্য-ক্রিয়ার কথা বলতে গেলে কতকগুলি চরিত্রের উপস্থিতি অনিবার্য। আর এসমস্ত চরিত্রের কিছু বিশেষত্ব জ্ঞাপক ধর্মও রয়েছে। চরিত্র এবং চিন্তা এই উভয় কারণ থেকে নাট্য-ক্রিয়া উদ্ভূত হয়। নাট্য-ক্রিয়ার ওপরই নাটকের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে ট্র্যাজেডিকে ক্রিয়ার অনুকরণ বলতে অ্যারিস্টটল বিবেকবান মানুষের ক্রিয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এই মানুষের রয়েছে চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি। অ্যারিস্টটল কথিত action তাই চরিত্র ও চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত। এই action এগুলির দ্বারাই স্থিরীকৃত বা নির্ণীত হয়। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চরিত্রকে বাদ দিয়ে তিনি বৃত্তের কথা বলেননি। বস্তুত উপযুক্ত বৃত্ত গঠিত হলে তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত চরিত্রসমূহও সার্থক হয়ে ওঠে। অ্যারিস্টটলের মতে বৃত্ত মানবজীবনের ঘটনা ও তার ক্রিয়া। শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সমস্তরকম ক্রিয়াই ঘটনাসম্ভূত এবং সে ঘটনা জীবনাশ্রয়ী। কোনো নাটকের সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত আমরা মানবজীবনেরই কোনো ঘটনার প্রবাহ ও তার শেষ পরিণতি লক্ষ করি। নাটকের বৃত্ত বলতে বাইরের ও ভেতরের ক্রিয়াকেই বোঝায়। তাছাড়া বৃত্তই ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরে তার রূপ প্রদর্শন করে। তাই অ্যারিস্টটলের মতে বৃত্তের স্থান প্রথম। তদুপরি ঘটনা-বিপর্যয় প্রভৃতি উপাদান যা ট্র্যাজেডিকে সার্থক করে তাও বৃত্তেরই অংশ।

আখ্যান ও চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র হলেও তাদের মধ্যে এক গভীর ঐক্য বর্তমান। আখ্যান যদি সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ না হয় তবে চরিত্রসৃষ্টিও সার্থক হতে পারে না। অ্যারিস্টটলের মতে শিথিল ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে রচনার শিল্পসাফল্য সম্ভব নয়। অর্থাৎ আখ্যানের সাফল্যের অন্তরালের সামঞ্জস্যবোধের প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এই সামঞ্জস্যবোধই নাটককে বিশিষ্ট রূপমূর্তি দান করে। সুতরাং চরিত্র অর্থে যদি এর সমগ্র তাৎপর্য গ্রহণ করা যায় তবে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়। তাঁর মতে ঘটনা-প্রবাহ প্রদর্শন ও পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্য চরিত্রসমূহকে গ্রহণ করতে হবে। চরিত্রের নৈতিক গুণ, অভিপ্রায় ও কর্মক্ষমতা, — এই তিনটি ধারা মিলিত হয়েই চরিত্রের সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করে। তাই আখ্যান ও চরিত্র পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ্য যে ট্র্যাজেডি চরিত্র অর্থাৎ কিছু গুণ বা ধর্মের অনুকরণ করে না। কিন্তু সেই চরিত্রের কোনো কাজ বা ঘটনা এবং জীবনের অনুকরণ করে। অতএব বলা যেতে পারে চরিত্রের যে অংশ কর্মময়, যে অংশ ক্রিয়াশীল তাকে অ্যারিস্টটল বৃত্তের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছেন। চরিত্র ক্রিয়াশীল হলেই তাঁর মতে তা বৃত্তের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ট্র্যাজেডি-চরিত্র হিসাবে অ্যারিস্টটল যে চারটি বিশেষ গুণাবলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি কী? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ট্র্যাজেডি-চরিত্রের ক্ষেত্রে নৈতিক গুণ, অভিপ্রায় এবং কর্মক্ষমতা, — এই তিনের পারস্পরিক সংযোগ কতটুকু? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) অ্যারিস্টটল কথিত আখ্যান-বিন্যাস সূত্রসমূহ কী কী? এইগুলি আখ্যানকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

(খ) প্লট ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনায় অ্যারিস্টটল কেন চরিত্রের তুলনায় প্লটের অধিক গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছেন?

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

৩.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এবারে আমাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ট্র্যাজেডির কাহিনি ও আখ্যান সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ট্র্যাজেডি গড়ে ওঠে। এই ঘটনাকে আখ্যান বা কাহিনি বলা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ কাহিনি মানেই আখ্যান নয়। কারণ কাহিনি কাল-ধারায় বর্ণিত হয় এবং আখ্যায়িকা কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত হয়। পরিচিত কাহিনি নিয়ে নাটক রচিত হলেও নাট্যকারের আখ্যান নির্মাণের দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। অ্যারিস্টটলের মতে বিন্যাস আখ্যানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার যে অনুকরণ করেন তার তাৎপর্য হল কার্য-কারণ সূত্রে পুনর্বিন্যাস।

অ্যারিস্টটলের মতে সুসম্পূর্ণ ট্র্যাজেডিতে থাকবে আদি, মধ্য ও অন্তের পর্যায়গত ঐক্য। সুগঠিত আখ্যানভাগসম্পন্ন কাহিনি আকস্মিকভাবে শুরু বা শেষ হতে পারে না। এর মধ্যে পারম্পর্য এবং ঐক্যের বন্ধন থাকে। নাটকের পরিণতি তার সূচনার অপরিহার্য পরিণাম, তাই এর ঘটনাসমূহের মধ্যে একটা ক্রমপর্যায়ের পরিচয় থাকে। জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেন্দ্রিক সামগ্রিক সুষমার অনুরূপ ট্র্যাজেডিতেও প্রয়োজন সুসংগতি ও বিস্তার। নাটকের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও পরিমিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। দর্শকের গ্রহণশক্তির মানদণ্ডেও নাটকের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হয়।

ঘটনার ত্রিস্তর সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে আখ্যানের 'আদি' ঘটনাই ক্রমবিকশিত হয়ে 'মধ্য'-এর মাধ্যমে 'অন্ত'-এর পরিণাম প্রাপ্ত হয়। বৃত্ত আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত হলে তাকে সমগ্র (whole) আখ্যায় ভূষিত করা যায়। বৃত্তের গঠন সামগ্রিক না হলে বৃত্ত এপিসোডিক হয়ে পড়ে, এইরূপ বৃত্ত অ্যারিস্টটলের মতে নিকৃষ্ট। ঐক্যবিধি সম্পর্কিত আলোচনায় অ্যারিস্টটল নাটকের তিন রকমের ঐক্যকে চিহ্নিত করেছেন — ঘটনাগত, কালগত এবং স্থানগত। তাঁর মতে ট্র্যাজেডির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভাবগত বা ঘটনাগত ঐক্য।

এই ঐক্যকে পরিস্ফুট করতে হলে নাটকে শুধুমাত্র প্রধান বিষয়সমূহ ব্যক্ত করতে হবে।

কাহিনিবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির কাহিনিকে সরল এবং জটিল দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। সরল বৃত্তে ঘটনার কার্য-কারণের সংযোগ থাকে না। তিনি জটিল বৃত্তকে আদর্শ বৃত্ত বলেছেন। এতে বিপ্রতীপতা এবং উদ্‌ঘাটনের দ্বারা অবস্থান্তর সূচিত হয় এবং দর্শকমনে করুণা ও ভীতি জাগ্রত হয়। বিপ্রতীপতা হল অবস্থার পরিবর্তন, অন্যদিকে উদ্‌ঘাটন হচ্ছে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে পরিবর্তন।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডির নায়ক হবেন মধ্যবর্তী শ্রেণির মানুষ অর্থাৎ অতি ভালোও নয় অতি মন্দও নয়। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি Higher type -এর নায়কের অনুকরণ করে। তিনি বলেছেন ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের হওয়া উচিত বিখ্যাত এবং সম্পদশালী, এবং তিনি হবেন সক্রিয়। তদুপরি তিনি বলেছেন নাটকের চরিত্র হবে ভালো, যথাযথ, বাস্তব এবং সুসংগত।

প্লট ও চরিত্রের মধ্যে অ্যারিস্টটল প্লটকে প্রধান বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে চরিত্র ছাড়াও ট্র্যাজেডি সম্ভব, কিন্তু আখ্যান ব্যতীত ট্র্যাজেডি রচনা অসম্ভব। আখ্যানকে তিনি ট্র্যাজেডির প্রাণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু চরিত্রকে বাদ দিয়ে তিনি বৃত্তের কথা বলেননি। উপযুক্ত বৃত্ত রচিত হলে তার সঙ্গে যুক্ত চরিত্রসমূহও সার্থক হয়ে ওঠে। বৃত্ত ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশন করে, তাই অ্যারিস্টটলের মতে বৃত্তের স্থান প্রথম।

৩.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

৩.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৪

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'

ট্র্যাজেডির পরিমাণ ও ক্যাথারসিস

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ ট্র্যাজেডির ভাব

৪.৩ ট্র্যাজেডির পরিণাম

৪.৪ ট্র্যাজেডির ফল : ক্যাথারসিস

৪.৪.১ ভারতীয় রসবাদ ও ক্যাথারসিস

৪.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৪.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

অ্যারিস্টটল 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ক্যাথারসিস শব্দটি দুইবার মাত্র প্রয়োগ করেছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন— "... through pity and fear affecting proper purgation or Katharsis of these emotions". অর্থাৎ ট্র্যাজেডি ঘটনার দ্বারা অনুকম্পা ও ভীতির জাগরণ ঘটায় এবং ফলে এই দুই ভাবের ক্যাথারসিস ঘটে। যেহেতু অ্যারিস্টটল এ সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেননি তাই পরবর্তীকালে শব্দটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণভাবে ক্যাথারসিস শব্দটির গ্রিক ভাষায় তিনটি অর্থ আছে। কিন্তু অ্যারিস্টটল কোন অর্থে এর প্রয়োগ করেছিলেন তা 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে স্পষ্ট নয়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল বিশুদ্ধিকরণ বা ভাব-বিমোক্ষণ। সাহিত্যকে যাঁরা সমাজকল্যাণের সঙ্গে অন্বিত করতে চান, তাঁরা শব্দটির গুরুত্বের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ক্যাথারসিস শব্দটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে এর দুটি প্রধান অর্থকে অবলম্বন করে রূপলাভ করেছে। শব্দটির একটি অর্থ চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত --- দেহের পরিশোধন। অন্য অর্থটি নৈতিক বা ধর্মীয় --- পবিত্রীকরণ, পরিমার্জনা,শুদ্ধি।

অ্যারিস্টটল ছিলেন চিকিৎসকের পুত্র, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট, তিনি জীবনতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, এমনকি 'পোয়েটিক্স'-এও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জীবনতত্ত্ব-নির্ভর উপমা ও রূপক ব্যবহার করেছেন। সুতরাং অনেকের মতে অ্যারিস্টটল এই শব্দটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা হিসাবেই ব্যবহার করেছেন।

ক্যাথারসিস প্রসঙ্গটি অ্যারিস্টটলের 'নগরনীতি'/'রাজনীতি' গ্রন্থেও স্থানলাভ করেছে। সংগীত প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে অনেক ব্যক্তি ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্যে দিনযাপন করেন, এই উন্মাদনাকে জোর করে রুদ্ধ করলে রুদ্ধ আবেগ অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অতএব এই উন্মাদনার বহির্গমন প্রয়োজন, তার ফলে আবেগ পরিমিত হতে পারে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মসংগীত মনের এই সমস্ত আবেগের নিষ্ক্রমণে সাহায্য করে। প্রবল উন্মাদনার নিবৃত্তি ঘটে প্রচণ্ড সংগীতে। স্কাইনো ইতালীয় ভাষায় অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্যের একটি টীকা প্রস্তুত করেছিলেন। তা থেকে জানা যায় আবেগ দেহের মূল উপাদানগুলি বা 'হিউমার'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; সংগীত দেহের বিশেষ বিশেষ 'হিউমার'-এর ওপর ক্রিয়াশীল, সংগীত দেহের অবাঞ্ছনীয় উপাদানকে বহিষ্কার করে; অর্থাৎ সংগীত সেই অর্থে এক ধরনের ঔষধ এবং সেই ঔষধের প্রয়োগের ফলে আবেগের ভাব কমে মনে শান্তি ও পরিতৃপ্তি জাগে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে ক্যাথারসিস সম্বন্ধে যে শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে সেদিকে লক্ষ রেখে বুচার বলেছেন ক্যাথারসিস সর্বক্ষেত্রে এক ধরনের নয়, অর্থাৎ ক্যাথারসিস ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে। 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে প্রযুক্ত ক্যাথারসিস শব্দটি প্রসঙ্গে বুচারের বক্তব্য এই যে, এখানে অ্যারিস্টটল একটি বিশেষ ধরনের ক্যাথারসিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তা নিছক চিকিৎসাশাস্ত্রের 'পরিশোধন' নয়। তাঁর মতে অ্যারিস্টটল ধর্মীয় উন্মাদনার ক্ষেত্রে এক ধরনের এবং কাব্য উপভোগের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের ক্যাথারসিসের কথা বলেছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে শুধু আবেগের নির্গমন নয়, আবেগের পরিমার্জনার প্রসঙ্গটিও অন্বিত। বাইওয়াটারের মতে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য এই যে, মানুষের প্রকৃতিতে করুণা ও ভীতির আবেগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বস্তিকরভাবেই বর্তমান। তাই ট্র্যাজেডির উত্তেজনা একটি প্রয়োজনবিশেষ এবং এটি এক অর্থে কল্যাণকর। এর কার্য ঔষধের মতো। পুঞ্জীভূত আবেগের মোক্ষণ হলে চিত্ত লঘু হয়, স্বস্তিলাভ করে। এই স্বস্তি অতিপ্রার্থিত, তাই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে এক হিতকারী আনন্দ বর্তমান। লুকাসের মতে ক্যাথারসিসের একটিই অর্থ, সেটি চিকিৎসাশাস্ত্রের এবং তাই অ্যারিস্টটলের তত্ত্বকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছেন যে নাট্যশালা হাসপাতাল নয়। আর অন্যদিকে এর নৈতিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে ব্যঙ্গ করে বাইওয়াটারও বলেছেন যে নাট্যশালা বিদ্যালয় নয়।

শিল্পের লক্ষ্য আনন্দ দান। সেই আনন্দ এক বিশেষ ধরনের, স্বতন্ত্র আনন্দ। ট্র্যাজেডি ভীতি এবং করুণা এই দুটি প্রধান আবেগকে উদ্রিক্ত করে এবং সেই জাগরণে মনে আনন্দের সঞ্চার ঘটে। বস্তুত অ্যারিস্টটল একটি রূপকের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আবেগের জাগরণ ট্র্যাজেডির এক অন্যতম কার্য।

জীবনে যা আমাদের বিচলিত করে উত্তেজিত করে, ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে তা উদ্বুদ্ধ হলে মনে প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতার সঞ্চার ঘটে। সাহিত্যের আনন্দ এই আবেগের জাগরণ ও আবেগের প্রশান্তি থেকে জাত হয়। অর্থাৎ কাব্যের আবেগময়তা অ্যারিস্টটলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যে আবেগের উজ্জীবনের জন্য প্লেটো কাব্য বিরোধী, সেই একই কারণে অ্যারিস্টটল কাব্যকে অভিনন্দিত করেছেন।

আসুন উপর্যুক্ত বক্তব্যের মানদণ্ডে ট্র্যাজেডির পরিণাম ও ক্যাথারসিসতত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

ট্র্যাজেডির কাহিনি ও চরিত্রসংক্রান্ত আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবারে আসুন চতুর্থ বিভাগে আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় ট্র্যাজেডির পরিণাম ও অ্যারিস্টটল কথিত ক্যাথারসিসতত্ত্ব।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাতে ক্যাথারসিস শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি ক্যাথারসিস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ট্র্যাজেডি ঘটনার দ্বারা দর্শকচিত্তে Pity ও Fear জাগ্রত করে এবং ফলস্বরূপ অনুকম্পা ও ভয়ভাবের ক্যাথারসিস সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ভাব-বিমোক্ষণ হয়। কীভাবে এই বিমোক্ষণ হয় এবং তার ফল কী তিনি এ প্রসঙ্গে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। পরবর্তীকালে তাই শব্দটির তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে নানা আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ বিভাগে আমরা অ্যারিস্টটলের এই ক্যাথারসিসতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে—

- আপনারা ট্র্যাজেডির মূলভাব ও এর পরিণাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- ক্যাথারসিসতত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে আপনারা ট্র্যাজেডি দর্শনের ফলে দর্শকচিত্ত কীভাবে ভয় ও করুণা থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের জগতে গিয়ে পৌঁছায়, তার স্তরসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন এবং কীভাবে ক্যাথারসিস সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- ভারতীয় রসবাদ ও ক্যাথারসিসতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আপনারা ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র কথিত রসনিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে ক্যাথারসিসের সাযুজ্য ও পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

৪.২ ট্র্যাজেডির ভাব

মানবজীবনে দেখা যায় এক নিদারুণ অক্ষমতা, এক অসহায়তা। এই জীবনে প্রোথিত আছে এক অনিবার্য ভ্রান্তিপ্রবণতার বীজ। যখন কোনো বাইরের শক্তির প্রভাবে, নিজের কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অথবা পরিপার্শ্বের প্রতিকূলতার ফলে জীবনে এক মর্মবিদারী দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং যখন মানুষ শত সংগ্রাম করেও সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে না, তখনই ট্র্যাজেডি রূপায়িত হয়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সকল মানুষের মধ্যেই আছে। তাই অপরের দুঃখ-বেদনার প্রতি আমাদের এমন নিবিড় সহানুভূতি।

মানবজীবনের এই যে অপরিহার্য ট্র্যাজেডি এর প্রকৃত স্বরূপ কী এবং কী এর মূলভাব এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে দেখা যায় 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির মূলভাবের প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কখনো pity and fear, আবার কখনো আলাদাভাবে 'fear' বা 'pity' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই অনুকম্পা ও ভীতি এই দুই ভাবকে ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বিচারে এই দুটিই ট্র্যাজেডির মূলভাব।

ট্র্যাজেডি দর্শনের ফলে দর্শকচিত্তে অনুকম্পা ও ভীতি কেন জাগ্রত হয় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেছেন— "Pity is occasioned by undeserved misfortune, and fear by that of one like ourselves." অর্থাৎ ট্র্যাজেডি-নায়কের জীবনের বিপর্যয় বা শোচনীয় পরিণামকে যখন অনুচিত বলে মনে হয় তখনই মনে অনুকম্পা সৃষ্টি হয়। এবং যখন সেই শোচনীয় পরিণামগ্রস্ত নায়ককে আমাদের মতোই একজন মানুষ মনে করা হয়, তখনই দর্শকচিত্তে জাগ্রত হয় ভয়। বস্তুত নায়কের বিপত্তি-পরিণামে দর্শকের বিচারশীল মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেই বিপর্যয়কে বিচারশীল মন কখনোই ন্যায্য বলে মনে করতে পারে না। নায়কের অনুচিত পরিণাম দর্শনে এক অদৃশ্য রহস্যময় অশুভ শক্তির ওপর দর্শকচিত্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নায়কের জন্য দর্শকের সমস্ত চিত্ত বিচলিত হয়ে ওঠে, --- নায়কের অবস্থা বিপর্যয়ের সঙ্গে দর্শকচিত্ত একাত্মতা অর্জন করে। ফলে জাগরণ ঘটে অনুকম্পার। এই অনুকম্পা সহানুভূতিরই নামান্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অ্যারিস্টটল কথিত 'pity' শব্দটিকে অনেক সমালোচক 'করুণা' — এই বাংলা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন, আবার অনেকে এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'অনুকম্পা' শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। আমরা আমাদের এই বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে 'করুণা' এবং 'অনুকম্পা' উভয়কেই 'pity' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছি। বাংলা শব্দ হিসাবে 'করুণা' ও 'অনুকম্পা' দুটি আলাদা ভাবকে উপস্থিত করে যদিও, আমাদের এই আলোচনার ক্ষেত্রে উভয় শব্দই 'pity' শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রযুক্ত হয়েছে এবং ফলত সমার্থকরূপেই গৃহীত হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ক্যাথারসিস বলতে সাধারণভাবে কী বোঝায়? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ক্যাথারসিসের সঙ্গে আবেগের নির্গমন ও পরিমার্জনার প্রসঙ্গটি কীভাবে জড়িত? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

ট্র্যাজেডি দর্শনে কেন করুণা ও ভয় জাগ্রত হয়? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"ট্র্যাজেডির রস সম্বন্ধে এরিস্টটলের যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা' এই যে, ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য "fear and pity"—র উদ্রেক করা; (fear and pity, this being the distinctive

mark of tragic imitation)। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে ট্র্যাজেডি কি তবে একাধারে ভয়ানক এবং করুণ দুই রসের নাটক? অথবা ট্র্যাজেডি ভয়ানক রসের অথবা করুণ রসের নাটক? অন্যভাবে বললে, ট্র্যাজেডি কি ভয় এবং শোচনা দুটি ভাবকেই সমান মাত্রায় উদ্রেক করবে, অথবা কোনটিতে ভয়কে এবং কোনটি শোচনাকে মুখ্যভাবে উদ্দীপ্ত করবে? এরিস্টটল বহুস্থলে "fear or pity" ব্যবহার করায় এ কথা যেমন মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে ভয়ানক অথবা করুণ এই দুই রসের কোন এক রসের নাটক, তেমনি pity and fear ব্যবহার করায় এ কথাও মনে আসতে পারে যে ট্র্যাজেডি একাধারে ভয়ানক ও করুণরসাত্মক নাটক অর্থাৎ ভয়ানকমিশ্র করুণ কিংবা করুণমিশ্র ভয়ানক রসের নাটক। এও এক সমস্যা এবং সম্যার সমাধান করতে হলে এরিস্টটল 'fear' এবং 'pity' শব্দ দুটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা অবশ্যই জানতে এবং বুঝতে হবে। শব্দ দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, -- "Pity is aroused by the unmerited misfortune and fear by the misfortune of a man like ourselves" অর্থাৎ শোচনা জাগে তখনই যখন কোন ব্যক্তির দুঃখদুর্ভোগ দেখে এই কথা মনে হয় যে ঐ দুঃখদুর্ভোগ ঠিক তার প্রাপ্য নয় এবং ভয় জাগে এই মনে করেই যে আমাদেরই মতো একজন মানুষ এত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছে। বলা বাহুল্য, ভয় এবং শোচনা উভয়ই জাগে "misfortune" দেখে— উভয় ভাবই ভাগ্যবিপর্যজনিত প্রতিক্রিয়া বিশেষ। আত্মসম্পর্কে চিন্তা থেকে ভয়, ব্যক্তিসম্পর্কে চিন্তা থেকে শোচনা। এরিস্টটল যে ভাষ্য করেছেন তা' গ্রহণ করলে এ কথা মানতেই হবে যে ভয় এবং শোচনা নামতঃ যত পৃথকই হোক আসলে তত পৃথক নয়। ভয় ও শোচনা পরস্পরসম্পৃক্ত— ভয় শোচনারই অন্যতম নিমিত্তকারণ। কারণ প্রত্যেক শোচনার মূলে এই ভয় ভাবটি সক্রিয় থাকে -- এই ভয় অনুকম্পার সহজ ভিত্তি।"

[এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব : ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য]

ভীতি জাগরণের সপক্ষে অ্যারিস্টটল যে কারণকে চিহ্নিত করেছেন তাও ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। তাঁর মতে ট্র্যাজেডির নায়ক আমাদেরই অনুরূপ একজন মানুষ -- এই বোধ থেকে ভীতির জাগরণ ঘটে। নায়ক যেহেতু আমাদেরই অনুরূপ মানুষ তাই তাঁর দুর্গতিতে ভীতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সহানুভূতিও উদ্রিক্ত হয়। ভীতির প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল সম্ভবত বলতে চেয়েছেন যে আত্মস্বার্থের কথা ভেবেই ভীতি জাগ্রত হয়। অর্থাৎ যে বিপর্যয় নায়কের জীবনে ঘটেছে, তিনি আমাদেরই মতো মানুষ, তাই এই বিপর্যয় আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। নিজের কথা ভেবেই দর্শক তখন ভয় পায়। দর্শকের বিচারশীল মন আর তখন ক্রিয়াশীল থাকে না। লক্ষণীয় যে, একই নায়কের জীবনের শোচনীয় পরিণাম দুটি আলাদা ভাবের উদ্বোধনের কারণ। নায়কের শোচনীয় পরিণামের মানদণ্ডে করুণা বা অনুকম্পার জাগরণ, আর নিজের এরূপ পরিণামের আশঙ্কায় ভীতির জাগরণ। নাটকের অন্তিমে নায়কের পরিণাম-দৃশ্য দর্শনে দর্শকচিত্তে ভয় ও করুণা উপস্থিত হলেও ভয়ের সঙ্গে আত্মচিন্তাও জড়িত -- আত্মচিন্তাই ভয়ের জনক। দেখা যাচ্ছে নায়কের জীবনের

বিরুদ্ধ এক মহা অশুভ শক্তি ও তার ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ রেখেই অ্যারিস্টটলের এই দুই ভাব পরিকল্পনা। যে শক্তির অসংগত প্রকাশ নায়কের জন্য করুণা বা অনুকম্পা জাগায়, তাই নিজের জন্য জাগায় ভীতি। একই নায়কের উপর অশুভ শক্তির ক্রিয়ায় একই নায়ক আলম্বন বিভাব রূপে কাজ করায় শেষ পর্যন্ত করুণা ও ভয় জাগ্রত হয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"ভীতি ও সহানুভূতি ছাড়াও ট্র্যাজেডি আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও ভীতিমিশ্রিত বিহ্বলতা সৃষ্টি করে। ট্রাজেডির নায়কের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটে ও তাহার প্রতিরোধের জন্য যে সংগ্রাম তিনি করেন তাহাতে তাঁহার আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। ইহা শেকস্‌পীয়রের নাটকে দেখা যায়। গ্রীক নাটকে যে অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূল শক্তি তাঁহাকে অভিভূত করে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বিহ্বল হইয়া পড়ি। যাহাই হউক, এই উভয় শক্তি আধ্যাত্মিক ও জড় শক্তির মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি করে তাহাতে ট্র্যাজেডির সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। গ্রীক নাটকে নায়ক প্রতিকূল ভাগ্যের নিকটে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু শেকস্‌পীরিয় নাটকে যে দুর্জয় ও দীপ্যমান আত্মিক শক্তির পরিচয় নায়ক-চরিত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। জড় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির সংঘাত ও ইহার মহিমা প্রতিষ্ঠা আমাদের মনে গভীর আনন্দ দান করে। স্বভাবতঃ মানবাত্মার মহিমা-দর্শনে আমাদের জীবনও সমুন্নত হয়।

বাস্তব জীবনে ব্যক্তি-বিশেষের দুর্ভাগ্য আমাদের মনে সহানুভূতি ও ভীতি সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্য-দর্শনে আমরা আনন্দ লাভ করি না। কিন্তু ট্র্যাজেডির চরিত্রের সহিত আমাদের মানবিক সম্পর্কের সাদৃশ্য থাকিলেও তিনি আমাদের জীবন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তাঁহার দুর্ভাগ্যের সকল কারণ আমাদের নিকট সুবিদিত। তাঁহার দুর্ভাগ্য অ্যারিস্টটলের মতে চরিত্রের ত্রুটি হইতে উদ্ভূত হয়। তথাপি তাঁহার অপরিমেয় দুর্ভাগ্যের তুলনায় কৃতকর্মের ত্রুটির সঙ্গতি নাই। অনেকক্ষেত্রে বিনা কারণেও দুর্ভাগ্য দেখা দিতে পারে। তাঁহার দুর্ভাগ্য আমাদের চেতনাকে এমনভাবে আলোড়িত করে যে, আমরা আমাদের সত্তাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি।"

[অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স : ভবানীগোপাল সান্যাল]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ভীতির জাগরণের সঙ্গে আত্মচিন্তার প্রসঙ্গটি কীভাবে অন্বিত? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

৪.৩ ট্র্যাজেডির পরিণাম

ট্র্যাজেডি নায়কের জীবনের দুঃখ-দুর্গতি ও শোচনীয় পরিণামকে চিহ্নিত করে। অ্যারিস্টটল বলেছেন— "... it is acted not narrated, and by axciting pity and fear it gives a healthy relief to such emotions." অর্থাৎ ট্র্যাজেডি বিবৃত হয় না, এটি ক্রিয়াত্মক; ট্র্যাজেডি অনুকম্পা ও ভয়ভাব দর্শকচিত্তে জাগ্রত করে এবং ওই দুই ভাবের স্বাস্থ্যসম্মত মোক্ষণ ঘটে। নায়কের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র এতে পরিবেশিত হয় বলে এর পরিণাম বেদনাদায়ক। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জানিয়েছেন যে 'Unhappy ending'-ই ট্র্যাজেডিতে থাকা সমীচীন। তিনি সেই সকল ট্র্যাজেডিকেই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যেখানে নায়ক ভয়ানক কোনো কিছু করেছেন বা ভয়ঙ্কর দুর্ভোগে পতিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন শিল্পসূত্রের নিয়মানুসারেই ট্র্যাজেডি গঠন করতে হবে। ইউরিপিডিস তাঁর বহু নাটকে নায়কের দুঃখজনক মৃত্যু-পরিণাম প্রদর্শন করেছেন। নায়কের জীবনের শোচনীয় পরিণাম দেখাতে গেলে মৃত্যুকে বাদ দেওয়া যায় না বলেই তিনি মনে করেছিলেন। ইউরিপিডিসের নায়কদের মৃত্যু-পরিণামকে সমর্থন করে অ্যারিস্টটল বলেছেন— "it is as we have said is the right ending" তিনি আরও বলেছেন— "The critics therefore are wrong who blame Euripides for taking this line in his tragedies, and giving many of them an unhappy ending" যে নাটকের উপসংহারে এই "Unhappy ending" পরিলক্ষিত হয় না তাকে তিনি খাঁটি ট্র্যাজেডি বলতে চাননি। যে নাটকের শেষে কেউ কাউকে বধ করে না, পরম শত্রুরাও বন্ধুবৎ আচরণ করে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় এমন ট্র্যাজেডিকে অ্যারিস্টটল অভিনন্দিত করেননি। এর যে শৈল্পিক আনন্দ, তা খাঁটি ট্র্যাজেডি দর্শনের আনন্দ নয়। তা কমেডিরই উপযুক্ত। সুতরাং বিয়োগান্ত বা মৃত্যুদৃশ্যই ট্র্যাজেডির সার্থক পরিণাম।

অ্যারিস্টটল সুখহীন পরিণামের প্রতি পক্ষপাত ব্যক্ত করলেও সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, সেইরকম উপসংহারই তাঁর ঈপ্সিত যেখানে অপূরণীয় ক্ষতিকর কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সত্য প্রকাশিত হয়।

মধ্যযুগে ট্র্যাজেডির এই দুঃখজনক পরিণামই পরিলক্ষিত হয়েছে। রেনেসাঁসের যুগেও এই 'Unhappy ending'-ই ছিল ট্র্যাজেডির যথার্থ পরিণাম।

কিন্তু পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির উপসংহার বিষয়ক এই বক্তব্য সমালোচিত হয়েছে। আধুনিক কালে মৃত্যু কখনো ট্র্যাজেডির শেষ পরিণাম নয়। জীবিত অবস্থায়ও মানুষ জীবনে দুঃসহ দুঃখভোগ করতে পারে। সারাজীবনব্যাপী এই যন্ত্রণার জ্বালা জীবিত অবস্থায় ভোগ করলে তা মৃত্যু-যন্ত্রণার অনুরূপ অনুভূতিই জীবনে উপস্থিত করতে পারে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"বিশ্বসাহিত্যের সর্বত্র দুঃখের চিত্র আছে, এবং যেখানে এই দুঃখ যত বেশি জীবন্ত ও পরিপূর্ণ করে বর্ণিত হয়েছে সেখানেই এর তত বেশি সার্থকতা। প্রাচীন জ্ঞানী পুরুষদের মত কাস্তেলভেত্রো এই মর্মে বলেছেন, "ইট ইজ বেটার টু গো টু দি হাউস অফ মোরনিং দ্যান টু গো টু দি হাউস অফ দি ফিস্টিং"। সাহিত্য যেখানে হাস্য-পরিহাস ও আনন্দ-উল্লাসের বর্ণনা দেয়, সেখানে তা মানবচিত্তে কোন স্থায়ী দাগ কাটতে সক্ষম হয় না, কিন্তু দুঃখ বেদনার বর্ণনা কেউ ভুলতে পারে না। এর একমাত্র কারণ দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা পাঠ করে মানুষ আনন্দ পায়, তার চিত্ত শুদ্ধ হয়।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা' : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ]

কিন্তু ট্র্যাজেডি-নায়কের শোচনীয় পরিণাম শুধুমাত্র নায়কের মৃত্যুতেই সূচিত হয় না। জীবিত অবস্থায় তাঁর দুঃখভোগই বরং অধিক তাৎপর্য বহন করে। তাই কমেডির সুখ-পরিণাম এবং ট্র্যাজেডির সুখকর পরিণাম এক নয়। ট্র্যাজেডির সুখজনক পরিণাম বাহ্যত সুখকর বলে মনে হলেও মূলত তা বেদনাহীন নয়। নায়কের জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি, মহাশূন্যতা উপসংহারের আপাত মিলনে লুপ্ত হয় না। ট্র্যাজি-কমেডিতে নায়কের জীবনের ক্ষয়ক্ষতির স্তর থেকে তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু মিলনান্ত ট্র্যাজেডিতে (Happy ending) তা হয় না। 'Happy ending' হিসাবে ট্র্যাজেডিতে যা থাকে তা সাময়িক সুখকর মাত্র, সমগ্র নাটকের ফলশ্রুতি সাধারণত বেদনাদায়কই (Unhappy) হয়। প্রসঙ্গত উদাহরণস্বরূপ আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' এবং 'নূরজাহান' নাটক দুটির কথা উল্লেখ করতে পারি। দুটি নাটকেই মৃত্যুর ঘটনা আছে, কিন্তু পরিণামে নায়ক-নায়িকার মৃত্যু হয়নি। তবু দুঃখভোগের মানদণ্ডে এই নাটক দুটি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং নায়কের শোচনীয় পরিণামের মাধ্যমে ট্র্যাজেডির উপসংহার রূপায়িত হয়, — এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবার অন্যদিকে ট্র্যাজেডি কখনো আপাতদৃষ্টিতে 'happy ending'-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হলেও তার তাৎপর্য সন্দেহাতীতভাবে বেদনাদায়ক। অনুরূপভাবে 'Unhappy ending' নায়ক-নায়িকার বিয়োগ বা মৃত্যুতে নাও হতে পারে, কিন্তু তবু তার পরিণাম অবশ্যই দুঃখকর।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"ট্র্যাজেডির সর্বময়তা, অর্থাৎ , আরম্ভ ও বিবর্তনের সমগুরুত্ব স্বীকার ক'রেও তার শেষ পরিণতি নিয়ে একটু বিশেষ আলোচনা করা দরকার। সাধারণত মৃত্যুতে ট্র্যাজেডির অনিবার্য পরিণাম মনে করা হয়। মৃত্যুতে একটা শান্তি ও সান্ত্বনা আছে। ট্র্যাজেডির গঠনের সবচেয়ে সন্তোষজনক পরিণতি এই মৃত্যুতে। মৃত্যুতে সব দ্বন্দ্বসংঘাতের সমাপ্তি, মৃত্যুতে নবজীবনের সম্ভাবনা এবং জীবনমৃত্যুর নিত্যকালীন চলমানতা সম্পর্কেই আমরা সচেতন হই। ইডিপাস, রাজা লীয়র, ওথেলোর মৃত্যুতে

এই শান্তিময় পরিণাম দেখি। কিন্তু আন্তিগোনে, প্রোমিথিউস, জারেক্সেস, অ্যাগামেমনন এবং ইডিপাস নামাঙ্কিত নাটকে এবং ইউরিপিডিসের প্রায় সব নাটকের পরিণামই অশান্তি, বিলাপ ও আর্তনাদে; শেকস্‌পিরীয় নাটকের পরিণাম নায়কের অনিবার্য মৃত্যুতে। এই মৃত্যু সর্বাপেক্ষা ট্র্যাজিক ঘটনা নয়, কিন্তু মৃত্যু ট্র্যাজেডির অপরিহার্য অঙ্গ। ব্র্যাডলির কথায়-- 'No play at the end of which the hero remains alive is, in the full Shakespearean sense, a tragedy'। আধুনিক ট্র্যাজেডিতে মৃত্যু নেই বললেই হয়। বাংলা নাটকেও ভীমসিংহ, সাজাহান, নূরজাহান, বিক্রমদেব, যোগেশ-- কারো পরিণাম মৃত্যুময় নয়।"

['নাটকের কথা' : ড. অজিতকুমার ঘোষ]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ট্র্যাজেডির পরিণাম সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য কী? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪.৪ ট্র্যাজেডির ফল : ক্যাথারসিস

ট্র্যাজেডির যাঁরা ধারক বা কর্মী অ্যারিস্টটল তাঁদের এজেন্টস হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এঁরা সদগুণাবলির দিক থেকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উর্ধ্বস্তরের বা নিম্নস্তরের অথবা সমস্তরের ব্যক্তি হতে পারেন। তবে ট্র্যাজেডির চরিত্রসমূহ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা সাধারণত উচ্চস্তরের এবং কমেডির চরিত্রসমূহ নিম্নস্তরের হয়ে থাকে। বর্তমানযুগে সাধারণ ও পরিচিত চরিত্রসমূহকে অবলম্বন করে নাটক ও উপন্যাস রচিত হয়ে থাকে। ট্র্যাজেডির চরিত্রসমূহ যে সর্বদা উচ্চস্তরের হবে তার কোনো সংগত কারণ নেই। চরিত্র বস্তুত ঘটনাবলির মানদণ্ডে বিচার্য। অ্যারিস্টটলও ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় বলেছেন যে ঘটনাই ট্র্যাজেডির প্রাণ ও আত্মা। চরিত্রের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে। ঘটনা পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যেই চরিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। চরিত্রের নৈতিক গুণাবলি, অভিপ্রায় এবং কর্মক্ষমতাকে অবলম্বন করেই চরিত্রের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হয়। ট্র্যাজেডির ঘটনাবলির ভাবগত গাম্ভীর্য ও পরিমিত দৈর্ঘ্যের প্রসঙ্গটিও অ্যারিস্টটল নাট্যবৃত্তের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ট্র্যাজেডির সমাপ্তি দুঃখকর। গভীর কারুণ্য এর সমাপ্তিকে ব্যাপ্তি দান করে। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, এখানে বর্ণিত ঘটনাবলি থেকে দর্শকমনে করুণা ও ভীতির জাগরণ ঘটবে এবং তা ক্যাথারসিস বা ভাবমোক্ষণে সমাপ্তি লাভ করবে। ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। বস্তুত সাহিত্যের ধর্ম হল পাঠকমনে বিশুদ্ধ আনন্দের সঞ্চার করা। এই আনন্দের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, এটি প্রয়োজনাতীত ও অলৌকিক। কিন্তু যে ঘটনাসমূহের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই তা আমাদের মনে করুণার ভাব জাগ্রত করতে পারে না। যেমন এক শত্রু অন্য শত্রুর ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করলে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগে না। বিবাদমান ব্যক্তিগণ আমাদের অপরিচিত হলেও আমাদের মন আলোড়িত হয় না। কিন্তু পরিবারের মধ্যে অনুষ্ঠিত শোকান্তকর কাহিনির বর্ণনা দর্শকগণের মনকে অভিভূত করে।

যখন দেখা যায় যে আমাদের মতো সাধারণ অথচ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কোনো পাপ ব্যতিরেকে চরিত্রের অজ্ঞানতাজনিত ত্রুটি হেতু বা বিচারবুদ্ধির ভ্রান্তির জন্য সৌভাগ্য থেকে চরম দুর্ভাগ্যে পতিত হন এবং তাঁর দুর্ভাগ্যের সন্তাপ ও আত্যন্তিকতা ত্রুটির পরিমাণকে ছাপিয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ তাঁর দুঃখকে ন্যায়-ধর্মের পরিপন্থী হিসাবে মনে হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগে। সহানুভূতির সঙ্গে যে ভীতিবোধের জাগরণ ঘটে তা এইজন্য যে, হয়তো সেই দুর্ভাগ্য আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। তবে এই ভীতি নৈর্ব্যক্তিক। মানবজীবনের দুর্ভাগ্য স্মরণে এই ভীতি মনে জন্ম লাভ করে।

বাস্তবজীবনে আমরা দুঃখ, ভয়, বিপদকে সচেতনভাবে পরিহার করে চলি কিন্তু ট্র্যাজেডি দর্শন বা পাঠে আমরা যে দুঃখ উপলব্ধি করি তা আমাদের আনন্দ দান করে। দুঃখে আমরা নিজেদের নতুনভাবে উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ।' ট্র্যাজেডি দর্শনে, অপরের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্যের পরিচয় অন্তরে গ্রহণের ফলে যে আনন্দ সৃষ্টি হয় তা বস্তুত শিল্পের আনন্দ। এখানে দর্শক বা পাঠক তাঁর অনুভূতি, আবেগ ও মনকে নাটকে বর্ণিত চরিত্রসমূহের সত্তার সঙ্গে একীভূত করেন। দর্শক নাটকের চরিত্রসমূহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান অথচ তাঁর অহংবোধ অর্থাৎ দুঃখ বা আনন্দ উপলব্ধি বা ভোগ করার মনও জাগ্রত থাকে। বাস্তব জীবনে দুঃখ অপ্রিয় কিন্তু সাহিত্যে দুঃখ উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রবলভাবে জানতে পারি। এই জানাতেই আনন্দ। বাস্তব জীবনে দুঃখের সম্ভাবনার সঙ্গে ক্ষতি ও আঘাতের সম্ভাবনা জড়িত, কিন্তু সাহিত্যে সেই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বলে এখানে আমাদের অনুভূতি ও আবেগ আনন্দের আস্বাদনযোগ্য হয়ে ওঠে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"সাহিত্য রচনায় দুইটি বিষয় লক্ষ করা যায়। বাস্তবজীবনে অনেক ঘটনা, চরিত্র বা অভিজ্ঞতা আছে যাহা অকিঞ্চিৎকর। তাহারা হয়তো আমাদের মনে বিরূপতা সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি তাহারা আমাদের চেতনাকে অধিকার করে তাহা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। ইয়াগো অথবা মুরারি শীল তাহাদের সত্যতা লইয়া সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

যেহেতু তাহারা রূপবিশিষ্ট সেইহেতু তাহারা আমাদের আনন্দদান করে। দ্বিতীয়ত, বাস্তবজগত অসম্পূর্ণ। সেখানে মানুষের ইচ্ছা ও আদর্শ অচরিতার্থ। কিন্তু সাহিত্যে সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়। সাহিত্য-জগতে সুখ, দুঃখ, বেদনা ও ব্যর্থতা আছে। কিন্তু যেহেতু এই জগৎ আমাদের ইচ্ছার জগৎ সেইজন্য আমরা এখানে আনন্দ পাইয়া থাকি।

আরিস্টটল ভীতি ও সহানুভূতি হইতে সৃষ্ট ট্রাজেডির আনন্দের কথা বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত ভীতি ও সহানুভূতি 'অনুকরণ' (imitation) হইতে উদ্ভূত হয়। এই অনুকরণ হইল 'of action and life, of happiness and misery'। তবে দেখা যাইতেছে যে, নাট্যকার যেখানে জীবনের সুখ-দুঃখ বর্ণনা করেন সেখানে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহের কার্যাবলী ও ফলাফলের সহিত আমাদের হৃদয়ের আত্মিক সংযোগ হেতু আমাদের মধ্যে ভীতি ও করুণার ফলরূপে আমরা আনন্দ পাইয়া থাকি। নাট্যকার তাঁহার বর্ণনার গুণে আমাদের মনের চিত্তবৃত্তিসমূহ এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন যে আমরা নাটকে বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রসমূহের সহিত একাত্ম হইয়া পড়ি।

আরিস্টটল বলিয়াছেন :

'Pity is occasioned by undeserved misfortune, and fear by that of one like ourselves'.

যখন দুর্ভাগ্য মানুষকে গ্রাস করিতে চলে তখন তাহার জন্য আমরা সহানুভূতিতে পূর্ণ হই। অপরের প্রতি আমাদের সহানুভূতি মনে ভীতির ভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং বলা যায় যে, আমাদের ভীতি ও সহানুভূতি, এই উভয়বিধ মানসিক অনুভূতি আমাদের আত্মসচেতনতা ও মঙ্গলবোধ হইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন কোন সৎ ব্যক্তি উন্নতি বা সৌভাগ্য লাভ করেন আমরা আনন্দিত হই কিন্তু দুর্ভাগ্যে পতিত হইলে স্বভাবতঃ আমাদের মনে ভীতি ও সহানুভূতি জাগিয়া ওঠে। ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের সহিত আমরা যতখানি নৈকট্য অনুভব করি সেই পরিমাণে আমাদের মনে ভীতি জাগে। আবার সহানুভূতি বোধের জন্য কিছু পরিমাণে দূরত্বেরও প্রয়োজন। নৈকট্য ও দূরত্ব উভয়ই প্রয়োজন।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্' : ভবানীগোপাল সান্যাল]

প্লেটোর অভিযোগ ছিল যে, গভীর দুঃখে নিমজ্জিত হলেও মানুষ শোক ও এর প্রকাশকে সংযত রাখতে প্রয়াস করে। কিন্তু কবিগণ তাঁদের কাব্যে এই শোক জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে মানুষের বিচারবুদ্ধি দুর্বল হয়। কিন্তু অ্যারিস্টটলের বক্তব্য অন্যরকম। তিনি বলেছেন যে আবেগের সংযত প্রকাশ মানুষের জীবনে সাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। ট্র্যাজেডি দর্শনে মনের আবেগ জেগে উঠলেও পরিণামে সকল আকস্মিকতা দূরীভূত হয়ে মন প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়।

অ্যারিস্টটল এই প্রশান্তি ও আনন্দ অর্থেই ক্যাথারসিস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ট্র্যাজেডি দর্শনে মনের চিত্তবৃত্তি আলোড়িত হয় কিন্তু পরিণামে এগুলো বিশুদ্ধি লাভ করে। সুতরাং ট্র্যাজেডি শুধুমাত্র ভীতি ও করুণা প্রকাশেই সহায়তা করে না, মনের প্রশান্তি ও আনন্দ অর্থাৎ চিত্তের প্রসারতা সম্পন্ন করে। লৌকিক জীবনে ভীতির সঙ্গে বেদনা ও আশঙ্কা মিশ্রিত থাকে, করুণার মধ্যেও ভীতির ভাব বর্তমান। কোনো প্রিয়জনের দুঃখ-বিপদের আশঙ্কায় আমাদের মনে করুণা সৃষ্টি হয়। সুতরাং করুণা ও ভীতির মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

দুঃখবোধের মানদণ্ডে বাস্তব জীবন ও ট্র্যাজেডির মধ্যে পার্থক্য কী? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

করুণা ও ভীতির মধ্যে সম্পর্ক কী? (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুচারও বলেছেন যে করুণার সঙ্গে ট্র্যাজেডির যে ভীতির সম্পর্ক তা নৈর্ব্যক্তিক আবেগ। বিশেষ কোনো ঘটনার সঙ্গে সংযোগহীনভাবেই মানবজীবনের ভাগ্যরূপে তা দর্শকমনে উপলব্ধ হয়। নাটকে নায়কের পরিণাম দর্শনে আমরা সহানুভূতি অনুভব করি। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো চিন্তা বা ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। নায়ক চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা লাভ সূত্রেই আমাদের সহানুভূতিও বিস্তৃত হয়।

ট্র্যাজেডির নায়কের মধ্যে সাধারণ মানুষ-সুলভ ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকলেও জীবনের প্রকাশ তাঁর মধ্যে সমধিক। তাঁর চরিত্রের গুণসমূহ যেন চমৎকাররূপে সামঞ্জস্য লাভ করে। তাঁর চরিত্রের পরিণাম আমাদের তাই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং আমরাও তাঁর জীবনের অংশীদারে পরিণত হই। আবার নাটক দর্শনকালেও আমাদের মধ্যে একটা সচেতনতা থাকে এবং নায়ক ও আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান রচিত হয় যার ফলে তাঁর দুর্ভাগ্য আমাদের মনকে ব্যক্তিগত আশঙ্কায় পীড়িত করে না। আমরা তখন ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন করি। সহানুভূতির ফলে তা সম্ভব হয়। নাট্যকারের বর্ণনার গুণে নায়ক চরিত্রের দুর্ভাগ্য যেমন আমাদের বলে অনুভূত হয় আবার তাঁর পরিণামকে আমরা আত্ম-বিশ্লিষ্ট হয়ে দেখার সুযোগ পাই। ট্র্যাজেডির ভীতি দর্শকচিত্তকে সংকুচিত করে না; বরং এই ভীতি করুণাকে উদ্বুদ্ধ করে মনকে বিশ্বজীবনের ক্ষেত্রে মুক্তি দান করে। নাটকীয় ঘটনাবলি কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হলে দর্শকগণ চরিত্রের পরিণাম ও নিয়তির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে এবং নাটকের অপরিহার্য পরিণতি সূচিত হয়। এই অপরিহার্য পরিণতিই দর্শকমনে ভীতি ও কারুণ্য সঞ্চার করে। অনুভূতির এই স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ, প্রকাশ ও বিশ্বমানবমনের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের ফলেই মনে অনির্বচনীয় আনন্দ ও শান্তি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ দেখা গেল অ্যারিস্টটল বর্ণিত ক্যাথারসিস আনন্দ দান করে এবং চিত্তবৃত্তিসমূহ পরিশুদ্ধ করে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এর সঙ্গে নীতিশিক্ষার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই, ট্র্যাজেডির ক্যাথারসিস বস্তুত চিত্তবৃত্তিসমূহকে পরিশুদ্ধ করে মানসিক বিকাশের পথ বাধামুক্ত করে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে দুঃখতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। যেখানে আত্মোপলব্ধি নাই, সেখানে চৈতন্যের অস্পষ্টতা বড় দুঃখকর। তিনি বলিয়াছেন, "দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড়, অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলেও দুঃখকে বলতুম সুন্দর।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, "গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে; — সেই 'ভূমৈব সুখং'। বাস্তব জগতে মানুষ দুঃখ বিপদকে বর্জনীয় বলিয়া জানে; কিন্তু আত্ম অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করিবার নিমিত্ত ইহাদের না পাইলে আমাদের স্বভাব বঞ্চিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ট্রাজেডির মধ্যে থাকে এক উদাত্ত সুর এবং তা আমাদের মনকে বিস্ময় রসে পূর্ণ করে। এই বক্তব্য অধ্যাপক নিকলের মুখেও আমরা শুনিতে পাই--

"There is always something stern and majestic about the highest tragic art."

'গভীর দুঃখ ভূমা এবং ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে।' -- এই ভূমাই দর্শকগণের মনকে বিশ্বলোকে ব্যাপ্তি দান করে। মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আরিস্টটল ইহাকে ক্যাথারসিস্ বলিতে চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন, যে দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়, তখন চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা নামিয়া আসিলেও তাহা পরম উপাদেয় বলিয়া উপলব্ধি করা যায়। 'দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে।'

কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু এর মধ্যে ভাল কিছুই নাই, অথচ পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহ নিয়ে কত গান, কত নাটক, কত ছবি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, মানুষ আনন্দলাভ করিয়াছে। এখানে আছে, 'বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি-পুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি।' বদ্ধজল যেমন বোবা, গুমোট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিতে মানুষের সত্তাবোধ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করিতে চায়। এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঝুলন কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই আত্মোপলব্ধিকে ক্যাথারসিস্ রূপে ব্যাখ্যা করা যায়।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্' : ভবানীগোপাল সান্যাল]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ট্র্যাজেডি-নায়কের দুঃখ-দর্শনে আমরা আনন্দিত হই কেন? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪.৪.১ ভারতীয় রসবাদ ও ক্যাথারসিস

আমরা আমাদের আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ট্র্যাজেডির ঘটনা দর্শকচিত্তকে ঊর্ধ্বলোকে স্থাপিত করে, যেখানে নির্বিশেষে দুঃখ-যন্ত্রণার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধ হয়—— যেখানে দুঃখও আর দুঃখ থাকে না, দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের মর্মান্তিক ঘটনাও আনন্দ-মধুর হয়ে ওঠে।

ক্যাথারসিসের এই ব্যাখ্যায় বস্তু বা ঘটনার নির্বিশেষ দিকটিকে তুলে ধরা হয় এবং বিশ্ববিধানের উদারনীতি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি। অ্যারিস্টটলের মাইমেসিস তত্ত্বের সূত্রে এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ব্যাখ্যা শৈল্পিক আনন্দবাদের আলোকে উদ্ভাসিত। এদিক থেকে ক্যাথারসিসের সঙ্গে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের রসবাদের একটি সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। অলংকারশাস্ত্রোক্ত রসবাদে বিভাব ও অনুভাব বা তারই অনুষঙ্গী প্রতিক্রিয়া কাব্যের জগৎ থেকে এসে দর্শকচিত্তে আসন লাভ করে। আর দর্শকচিত্তে অন্তর্নিহিত স্থায়ীভাব এবং কিছু কিছু সঞ্চারীভাবের সংযোগে যে পদ্ধতিতে রসনিষ্পত্তি ঘটে তাতে দর্শকচিত্ত আত্মচৈতন্য বা আত্মোপলব্ধির আনন্দ লাভ করে। রসনিষ্পত্তিপন্থার প্রত্যেকটি স্তরপরম্পরা এই ক্যাথারসিস ব্যাখ্যায় না থাকলেও উভয় রীতির শেষ ফলশ্রুতির সর্বাংশে সাযুজ্য বর্তমান।

ট্র্যাজেডি যদি সার্থক রূপ লাভ করে, তা যদি বস্তুনিষ্ঠ হয় তবে পাঠক বা দর্শকমনে ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ট্র্যাজেডিতে এই উদ্দীপনা ভীতি ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে মানসিক সাম্য আনয়ন করে। এই ভাবই পাঠকমনে রস-পরিণতি লাভ করে।

ট্র্যাজেডি-নায়কের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তাঁর প্রতি অনুকম্পা বা করুণা ও ভীতি দ্বারা গ্রস্ত হয়েও দর্শক-চিত্তের ঊর্ধ্বায়ন ঘটে। ক্যাথারসিসের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে ভারতীয় আলংকারিক অভিনবগুপ্তের রস-ব্যাখ্যার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় রসবাদীগণ বলেন ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের ভয়, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি মূলভাবসমূহ কাব্যে বিন্যস্ত হলে তা অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়। আবার সহৃদয় পাঠক-দর্শকের দ্বারা সেই কাব্য পাঠ বা শ্রবণে কাব্য বা নাটকের সঙ্গে তন্ময়ীভবনের ফলে উক্ত পাঠক বা দর্শক তাঁদের নিজ-চিত্তে কাব্যের অলৌকিক বিভাবকে প্রাপ্ত হন। পরে তা তাঁর চিত্তের স্থায়ীভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অনুরূপ সঞ্চারীভাবকে আকর্ষণ করে। এই সমস্তকিছুর সংযোগে চিত্তের আনন্দাংশের আবরণ ছিন্ন হলে সহৃদয় নিজ আনন্দময় সম্বিৎকে (বা চেতনাকে) আস্বাদন করে আনন্দযুক্ত হন। অভিনবগুপ্তের এই ব্যাখ্যা অ্যারিস্টটলে অনুপস্থিত, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাব যে কাব্যে অলৌকিক বিভাবে পরিণত হয়ে শেষপর্যন্ত আনন্দের সৃষ্টি করে — এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে উভয়ের সাযুজ্য রয়েছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"লৌকিক জগতে রতি প্রভৃতি ভাবের যাহা আশ্রয় বা উদ্দীপক তাহার নাম বিভাব। বিভাব আবার আলম্বন ও উদ্দীপনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। নায়ক-নায়িকা পরস্পরের অবলম্বন আর যে অবস্থা বা বস্তু রসকে উদ্দীপিত করে তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব। বিভাবের যাহা কার্য বা প্রকাশ তাহার নাম অনুভাব। কবিগণ বস্তু-জগতের উপকরণ লইয়া এক অলৌকিক মায়ার জগৎ রচনা করেন বলিয়া বিভাবাদি পাঠকমনে রসাবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকে। শোক, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি লৌকিক ভাব। কিন্তু তাহারা বিভাবাদির সাহায্যে অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলের সুখের কারণ হয়। বাস্তব-জগতে যে শোক দুঃখের কারণ তাহাই যখন কাব্যে বর্ণিত হয় তখন তাহা কারুণ্যের সৃষ্টি

করিলেও মনে আনন্দের সঞ্চার করে। আবার নাটক দর্শনকালে দর্শক-মন আত্ম-বোধ ভুলিয়া অভিনেতাগণের সহিত একাত্মতা স্থাপন করে, কিন্তু তাহাদের সচেতনতাও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। যাহাই হউক, ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহা রসরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই আরিস্টটলের ব্যাখ্যায় 'emotional delight a pure and elevated pleasure' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্' : ভবানীগোপাল সান্যাল]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রোক্ত রসনিষ্পত্তিতত্ত্বের সঙ্গে ক্যাথারসিসের সম্পর্ক কী? (২০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ক্যাথারসিসতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) ট্র্যাজেডিতে বর্ণিত দুঃখ-দুর্দশা দর্শন বা শ্রবণে আমরা আনন্দিত হই কেন বুঝিয়ে লিখুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(গ) ভারতীয় রসবাদ ও ক্যাথারসিসের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে একটি আলোচনা প্রস্তুত করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৪.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবারে আমাদের এই আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে ক্যাথারসিস শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে ট্র্যাজেডি ঘটনার দ্বারা দর্শকচিত্তে করুণা ও ভয়ের জাগরণ ঘটায় এবং ফলস্বরূপ উক্ত ভাবদ্বয়ের ক্যাথারসিস বা বিমোক্ষণ সম্পন্ন হয়। অ্যারিস্টটল ক্যাথারসিসের কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেননি, তাই এই তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে অ্যারিস্টটল শব্দটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে সংগীতের ক্যাথারসিস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সেদিকে লক্ষ রেখে বুচার বলেছেন কাব্যের ক্ষেত্রে ক্যাথারসিস এ থেকে আলাদা। কাব্যের ক্ষেত্রে আবেগের নির্গমনের সঙ্গে পরিমার্জনার প্রসঙ্গটিও অন্বিত। আবেগের মোক্ষণ হলে চিত্ত স্বস্তি লাভ করে, তাই ক্যাথারসিসের মধ্যে এক হিতকারী আনন্দ বর্তমান।

ট্র্যাজেডির ভাব সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে ট্র্যাজেডির মূল ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থের বিভিন্নত্র Pity ও fear এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই করুণা ও ভীতি এই দুই ভাবকে ট্র্যাজেডির স্থায়ী ভাব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ট্র্যাজেডি দর্শনের ফলে এই করুণা ও ভয়ের জাগরণের রহস্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটল জানিয়েছেন যে, ট্র্যাজেডি-নায়কের জীবনের শোচনীয় পরিণামকে অনুচিত বলে মনে হলে করুণা বা অনুকম্পা সৃষ্টি হয় এবং নিজের এইরূপ পরিণামের আশঙ্কায় ভীতির জাগরণ ঘটে। অর্থাৎ আত্মচিন্তাই ভয়ের জনক।

ট্র্যাজেডির পরিণামশীর্ষক আলোচনায় দেখা গেল অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির পরিণাম হবে দুঃখজনক। তিনি সাধারণভাবে ট্র্যাজেডির পরিণতির ক্ষেত্রে 'Unhappy ending'-কেই স্বাগত জানিয়েছেন।

ক্যাথারসিস সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে বাস্তবজীবনে আমরা দুঃখ-বিপদকে পরিহার করি, কিন্তু ট্র্যাজেডির দুঃখ আমাদের আনন্দ দান করে। বস্তুত ট্র্যাজেডির আনন্দ শিল্পের আনন্দ। বাস্তবের দুঃখবোধের সঙ্গে ক্ষতির সম্ভাবনা জড়িত। কিন্তু সাহিত্যে সেই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বলেই আমাদের আবেগসমূহ আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। নাটকে নায়কের পরিণাম দর্শনে আমরা সহানুভূতি অনুভব করি, আমরা তার সঙ্গে একাত্ম হই। কিন্তু এর মধ্যেও একটা সচেতন ব্যবধান থাকে। ফলে আমরা নায়কের দুর্ভাগ্য দর্শনে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব-মানবমনের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন করি এবং এই ঊর্ধ্বায়নের ফলে মন আনন্দে স্নাত হয়। এদিক থেকে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের রসনিষ্পত্তি ব্যাখ্যার সঙ্গে ক্যাথারসিসের মিল আছে। ভারতীয়

অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী কাব্যে বর্ণিত ভাবের সঙ্গে পাঠক-দর্শকের অন্তরস্থিত স্থায়ীভাবের জাগরণের মাধ্যমে সঞ্চারীভাবের সংযোগে চিত্তের আনন্দাংশের আবরণ ছিন্ন হলে সহৃদয় নিজের চেতনাকে আস্বাদন করে আনন্দ অনুভব করেন।

৪.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

অভিনবগুপ্ত :

ইনি সম্ভবত খ্রিষ্টীয় দশম শতকে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত যেসব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে অলংকারশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র এবং আগমশাস্ত্রই প্রধান। নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'অভিনবভারতী' এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। রসতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর মতবাদ ' অভিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত।

৪.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

৪.৮ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৫
অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'
এপিক বা মহাকাব্য

বিষয় বিন্যাস

৫.০ ভূমিকা (Introduction)
৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৫.২ মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণসমূহ
৫.২.১ মহাকাব্য : ছন্দ ও কথাবস্তু
৫.৩ মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি : তুলনামূলক আলোচনা
৫.৩.১ মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি : ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব
৫.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৫.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৫.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৫.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

ইংরেজি 'Epic' শব্দটি গ্রিক 'Epos' শব্দ থেকে জাত। এর মূল অর্থ ছিল 'শব্দ'। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অর্থের সৃষ্টি হয় যেমন— কাহিনি, গান, বীরত্বপূর্ণ কাব্য ইত্যাদি। সবশেষে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় কাহিনিধর্মী বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সংস্কৃত বা বাংলা 'মহাকাব্য' শব্দটির মধ্যে এক মহান ভাব বা মহনীয়তার ব্যঞ্জনা আছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে বর্বরযুগ, বীরযুগ এবং সভ্যযুগ-- এই তিনভাগে ভাগ করলে দেখা যাবে যে বীরযুগেই মহাকাব্যের প্রকৃত সৃষ্টি। বীরযুগের বৈশিষ্ট্য অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা এবং গোষ্ঠীবোধ। এই যুগে বীরত্ব শুধুমাত্র দৈহিক শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বীরত্ব তখন ছিল নৈতিক শক্তি অর্থাৎ ত্যাগ এবং পরার্থসাধনের মধ্যে প্রসারিত। ব্যক্তির তুলনায় গোষ্ঠীমুখ্য সমাজের কথাই তখন বড়ো। তাই একটি জাতির সমাজমানসের ত্যাগ ও নিবৃত্তিসাধনের ইতিবৃত্ত দৈহিক বীরত্বের সঙ্গে এই যুগের মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সমস্ত মহাকাব্যের নানান উপাদান নানা উপাখ্যান বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকগাথার আকারে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। পরবর্তীকালে হোমার বা বাল্মীকি, ব্যাসের মতো প্রতিভাবান মহাকবিগণ সেইসমস্ত বিষয়কে একটি মূল কাহিনি ও একটি মূল চরিত্রের আশ্রয়ে একটি মৌল আদর্শের সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে গ্রথিত করেছেন। জাত

মহাকাব্যে নায়ক তাই মহান, বীর এবং নৈতিক শক্তিতে অতুলনীয়। প্রতিনায়ক পশুশক্তিতে অসংযতরূপে বলীয়ান কিন্তু নৈতিক শক্তিতে দুর্বল। মহাকবির সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-সূত্রে আগত পুরাণকথাও এর বিষয়বস্তুতে যুক্ত হল। তাই অনিবার্যভাবেই এতে অলৌকিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটল। তবে সমাজধর্ম, মানবধর্মের প্রভাব এতে ক্ষুণ্ণ হল না। এই ধরনের মহাকাব্যের রচনারীতির প্রত্যক্ষতা এবং সরলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর স্টাইল জনপ্রিয় ব্যালাডের স্টাইলের সঙ্গে তুলনীয়।

Epic of Art বা লিটারারি এপিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য অন্য জাতের। পাণ্ডিত্যের যুগে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবময় যুগে ব্যক্তি-প্রতিভার সৃষ্টি এইসমস্ত মহাকাব্য। ভার্জিলের 'ইনিড', মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট', টাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' ইত্যাদি এবং আমাদের দেশের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্গত। অর্থাৎ 'ইলিয়াড', 'অডিসি', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ইত্যাদির সঙ্গে 'ইনিড', 'প্যারাডাইস লস্ট', 'ডিভাইন কমেডি', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' ইত্যাদির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মহাকাব্যের দুটি প্রধান শ্রেণি— 'অথেন্টিক এপিক' বা 'এপিক অব গ্রোথ্' এবং 'লিটারারি এপিক'। 'ইলিয়াড অডিসি' প্রথম শ্রেণিভুক্ত এবং অন্যগুলো দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে প্রথমোক্ত মহাকাব্যেরই লক্ষণসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের বিস্তারিত ইতিহাস ব্যাখ্যা করেননি। তবু মহাকাব্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট মূল্যবান, কারণ তিনিই প্রথম মহাকাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কাব্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি মহাকাব্যের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে সূত্রনির্দেশ করেছেন। কাব্যের উৎপত্তির মূলে দুটি কারণ বর্তমান এবং এই কারণ দুটি আমাদের স্বভাবের গভীরেই নিহিত। এর মধ্যে প্রথম কারণটি হল মানুষের অনুকরণপ্রবণতা-- বাল্যকাল থেকেই মনুষ্যস্বভাবে তা ধরা পড়ে। মানুষই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি অনুকরণশীল এবং অনুকরণের মাধ্যমেই তার বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে অনুকৃত বিষয় দর্শনে আমরা আনন্দ লাভ করি এবং সে আনন্দ সর্বজনীন। অনুকৃত বস্তু উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে মানুষ একদিকে শিক্ষালাভ করে এবং অনেক কিছু অনুমান করারও সুযোগ পায়। দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে এটি আমাদের সংগতিবোধ (Sense of harmony) এবং ছন্দের প্রতি আকর্ষণ থেকে জাত। মানুষের এই অনুকরণ এবং সংগতিবোধ ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি। ক্রমানুশীলনের মধ্য দিয়ে এ দুটি বিশেষ শক্তিতে পরিণত হয় এবং অনেক স্থূল প্রয়াসের শেষে সে কাব্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। মহাকাব্যের উৎপত্তির মূলেও এই দুটি কারণই সক্রিয় ছিল।

অ্যারিস্টটল বলেছেন কবিদের ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যই কাব্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। গুরুগম্ভীর স্বভাবের মানুষেরা মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা এবং মহাপুরুষদের ক্রিয়াকলাপ অনুকরণ করেন। এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই গুরুগম্ভীর স্বভাবের কবিগণ 'দেবস্তুতি' (Hymns) এবং 'মহাপুরুষস্তুতি' (Panegyries) রচনা করলেন। আর লঘু প্রকৃতির কবিগণ রচনা করলেন ব্যঙ্গরচনা। হোমারের পূর্বে ব্যঙ্গরচয়িতা ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে হোমারের

পরবর্তীকালে এঁদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। এই ব্যঙ্গরচনার উপযুক্ত ছন্দও ছিল, যার নাম আয়াম্বিক মাত্রার বা ব্যঙ্গোক্তি মাত্রার ছন্দ। প্রাচীন কবিদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল-- যান্মাত্রিক (হিরোয়িক) ছন্দের কবি এবং ব্যঙ্গ ছন্দের কবি। অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী গম্ভীর রীতির রচনায় কবিদের মধ্যে হোমার সর্বপ্রথম এবং এখানেই তিনি কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে নাটকীয় রীতিকে একীভূত করেছেন।

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আমাদের বর্তমান বিভাগের আলোচ্য বিষয় মহাকাব্য বা এপিকের প্রসঙ্গসমূহ। আসুন এই বিভাগের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় এবং ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ ও ষড়বিংশ অধ্যায়ে মহাকাব্যের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। অবশ্য পঞ্চবিংশ অধ্যায়েও কাব্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে মহাকাব্যের প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও এই গ্রন্থের নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে মহাকাব্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা স্থানলাভ করেছে। অ্যারিস্টটল কমেডি ও ট্র্যাজেডির তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে মহাকাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য ও পার্থক্য এবং এর রসাবেদন সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করেছেন। অ্যারিস্টটল শুধু ট্র্যাজেডি-কমেডির-ই প্রথম সূত্রকার নন, মহাকাব্যের স্বরূপও তিনি-ই প্রথম বিচার করেছেন।

আমরা এই অধ্যায়ে অ্যারিস্টটলের মহাকাব্য সম্বন্ধে বক্তব্যের মানদণ্ডে আমাদের আলোচনাসমূহ এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে--

- আপনারা অ্যারিস্টটল প্রদত্ত মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও এর লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ আলোচনার মাধ্যমে আপনারা মহাকাব্যের তুলনায় ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত অ্যারিস্টটলের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করতে পারবেন।

৫.২ মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণসমূহ

পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্রের আদিপুরুষ আচার্য অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের বিভিন্নত্র মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থে তিনি যদিও মূলত ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তবু মহাকাব্য সম্পর্কে তাঁর আলোচনাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ট্র্যাজেডির আলোচনা প্রসঙ্গেই বস্তুত মহাকাব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। তিনি মহাকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"As to the poetic imitation which is narrative in form and employs a single metre, the plot manifestly aught, as in a tragedy to be constructed on dramatic principles. It

should have for its subject a single action whole and complete, with a beginning a middle and an end. . . . All other poets take a single hero, a single period or an action single indeed, but with a multiplicity of parts. ”

অর্থাৎ মহাকাব্যও অনুকরণ এবং এটি বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে একটিমাত্র ছন্দে বিবৃত হয়। ট্র্যাজেডির মতো এর কাহিনিও নাট্যলক্ষণযুক্ত হওয়া উচিত। এর আখ্যানটি রচিত হবে আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত একটি সম্পূর্ণ কাহিনির দ্বারা। একটিমাত্র ঘটনা ও একজনমাত্র নায়কই মহাকাব্যের উপযুক্ত অবলম্বন, কিন্তু অনেক কবি আরো অনেক উপকাহিনিকে মূল কাহিনির অংশস্বরূপ ব্যবহার করেন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

“অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যেমন একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, মহাকাব্যের কিন্তু সেরকম সংজ্ঞা দেননি। তবে তিনি মনে করেন একটি নির্দিষ্ট পদ্যবন্ধে রচিত বর্ণনাত্মক কাব্যকে মহাকাব্য বলা হয়, ট্র্যাজেডির কাহিনীর মত একটি সম্পূর্ণ ঘটনার কথা এতে বলা হবে এবং সেই ঘটনাটিও ট্র্যাজেডির ঘটনার মত আদি, মধ্য ও অন্ত সম্পন্ন একটি পরিপূর্ণ ঘটনা হবে। এবং ঘটনাটি চলমান প্রাণীদেহের মত সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব বিশিষ্ট একটি পরিপূর্ণ অবয়বধারী ঘটনা হবে ও তার দ্বারা এতে উপযুক্ত আনন্দ সঞ্চারের সর্ববিধ উপায় থাকবে। যদিও এই বর্ণনা বেশ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তবু যথার্থ বিচার অনুসারে এতে মহাকাব্যের পরিচয় সবিশেষ ফুটে উঠেছে। এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে মহাকাব্যের বিস্তৃত সংজ্ঞারূপে নিরূপণ করাই সমীচীন হবে। ইতিহাস প্রাচীন ঘটনা বর্ণনা করে, মহাকাব্যও প্রাচীন ঘটনা বর্ণনা করে। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে মহাকাব্যের একটি জায়গায় মস্ত পার্থক্য দেখা যায়। ইতিহাস আসলে সময়ের বা যুগের বিবরণ দেয়, ঘটনা বর্ণনা বা কাহিনী রচনা ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মহাকাব্যের আসল কাজ ঘটনা বর্ণনা ও ঐ ঘটনার সহিত জড়িত মানুষের পরিচয় দান করা— সময় বা কালের গুরুত্ব সেখানে বিশেষ নেই ।”

[‘অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা’ : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

মহাকাব্যের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে ? (১২৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

মহাকাব্যের শ্রেণি কয়টি ও কী কী? কীসের ভিত্তিতে এই বিভাজন করা হয়েছে ? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

মহাকাব্যের উৎপত্তির কারণ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য কী? (৭০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

মহাকাব্যের রূপরীতি বিষয়ে অ্যারিস্টটল কী বলেছেন? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটল প্রদত্ত তথ্যসূত্র অনুযায়ী আমরা মহাকাব্যের লক্ষণসমূহকে এভাবে সূত্রাকারে বিন্যস্ত করতে পারি —

(ক) ট্র্যাজেডি যেমন Serious বা গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ-মহাকাব্যও তাই। মহাকাব্য ' imitation in verse of characters of a higher type.' অর্থাৎ মহাকাব্য উন্নত শ্রেণির চরিত্রের ছন্দোবদ্ধ গুরুগম্ভীর অনুকরণ।

(খ) মহাকাব্য শ্রব্যকাব্য এবং বর্ণনামূলক কাব্য (Narrative in form)। ট্র্যাজেডির মতো দৃশ্যকাব্য নয়। বর্ণনাত্মক হলেও মহাকাব্যের প্লটকে অনেকখানি নাট্যরীতিতেও (Dramatic) গঠন করতে হয়।

(গ) মহাকাব্যে একটি বিষয়ই উপস্থাপিত হবে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম যে রয়েছে তাও অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এর বিষয়বস্তু হবে এমন ঘটনা যা একক, অখণ্ড ও সম্পূর্ণ। এতে থাকবে ট্র্যাজেডির মতোই আদি, মধ্য ও অন্ত। এর কাহিনি একটি ঘটনার উপরই নির্ভরশীল থাকবে এবং এর আদি, মধ্য, অন্ত বিশিষ্ট ঘটনাটি এমনভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে যাতে এটি জীবদেহের ঐক্যের মতো নিজস্ব আনন্দ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। অ্যারিস্টটল বলেছেন— "The construction of its stories should clearly be like that in a drama; they should be based on a single action, one that is complete, whole in itself, with a beginning, middle and end, so as to enable the work to produce its own proper pleasure with all the organic unity of a living creature."

(ঘ) ঐতিহাসিক রচনার গঠনের তুলনায় মহাকাব্যের গঠন পৃথক। ঐতিহাসিক রচনায় একক (single) কোনো ঘটনার পরিবর্তে একটি যুগকে তুলে ধরা হয় এবং সেই যুগের এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলিকে পরিবেশন করা হয়। এই ঘটনাগুলির মধ্যে অখণ্ড ঐক্যবোধ অনুপস্থিত থাকে। মহাকাব্যে তুলে ধরা হয় একটি একক ঘটনা-— "They treat of one man, or one period; or else of an action which, although one, has a multiplicity of parts in it." 'সাইপ্রিয়া' এবং 'লিটল ইলিয়াড'-এর লেখক অনুরূপ কাজই করেছেন। এপিক-রচয়িতা হোমার ট্রয়যুদ্ধের সমগ্র বিষয়কে গ্রহণ করেননি। তাঁর গৃহীত বিষয়বস্তুতে সেই যুদ্ধের আদি, মধ্য, অন্ত রক্ষিত হয়েছে। সমগ্র ঐতিহাসিক ঘটনার একটি অংশকে আলাদা করে নিয়ে তাতে যুদ্ধের নানা কাহিনি-

উপকাহিনি সংযোজিত করেছেন তিনি।

(ঙ) ট্র্যাজেডির মতো মহাকাব্যও সরল, জটিল, নীতিমূলক (ethical) ও করুণরসাত্মক (Pathetic) হতে পারে। 'ইলিয়াড' গঠনের দিক থেকে সরল হলেও রসের দিক থেকে করুণ। 'অডিসি' গঠনের দিক থেকে জটিল হলেও ভাবের দিক থেকে তা নীতিমূলক (ethical)।

(চ) মহাকাব্যে সাধারণত চারটি উপাদান থাকে — বৃত্ত, চরিত্র, রচনারীতি (diction) এবং অভিপ্রায় (thought) । সংগীত ও দৃশ্য এই দুটি উপাদান মহাকাব্যে অনুপস্থিত।

(ছ) ট্র্যাজেডির অনুরূপ মহাকাব্যেও ঘটনার বিপ্রতীপতা (Peripety) এবং উদ্‌ঘাটন (Discovery) থাকে এবং দুঃখ-দুর্গতির প্রসঙ্গ থাকে।

(জ) মহাকাব্যে একটিমাত্র ছন্দ Dactylic hexametre -ই ব্যবহৃত হবে। যাঁরা মহাকাব্যে একাধিক ছন্দ ব্যবহার করেন, তাঁদের প্রতি অ্যারিস্টটল প্রসন্ন হতে পারেননি।

(ঝ) ট্র্যাজেডিতে অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখমাত্র থাকলেও মহাকাব্যেই এগুলি বিশেষভাবে স্থান লাভ করার যোগ্য। অসম্ভব ও অদ্ভুত ব্যাপার বা ঘটনা মহাকাব্যে মানানসইভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে আচার্য দণ্ডী ও বিশ্বনাথ মহাকাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দণ্ডী বলেছেন মহাকাব্য হবে সর্গবন্ধ। সর্গের সূচনায় আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ থাকবে। ইতিহাস বা অন্য কোনো মহৎ কাহিনী হবে এর উপজীব্য। উদাত্ত, চতুর ও বীর নায়কমুখ্য এই কাব্যে নানা বিষয়ে পূর্ণ থাকবে। নগর-পর্বত, চন্দ্র-সূর্যের উদয়, ছয় ঋতু, মহাসাগরের বর্ণনা, উদ্যান-সলিল-ক্রীড়া, মধুপান, সুরত-উৎসব, দূতযাত্রা, কূটনীতি, মন্ত্রণা, ভীষণ সংগ্রাম, পুত্র জন্মোৎসব — প্রভৃতি নানা ঘটনা এতে স্থান পাবে। কিন্তু অনতিবিস্তৃত একটি সর্গ শেষ হয়ে আসবে এমনভাবে যাতে পরবর্তী সর্গের কাহিনীর ইঙ্গিত থাকবে। লোকরঞ্জক এই কাব্য হবে 'কল্পান্তজীবী' ও নাটকীয় গুণ-মণ্ডিত।

বিশ্বনাথ মহাকাব্যের লক্ষণ-পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে — সর্গ দ্বারা রচিত পদ্যময় কাব্যবিশেষের নাম মহাকাব্য। এর নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বীর বা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কিংবা একই বংশে জাত, কুলীন বহু রাজাও এর নায়ক হতে পারেন। এর অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত রসের মধ্যে যে-কোনো একটি ও বাকী সমস্ত রস হবে এর অঙ্গরস। এতে সমস্ত নাট্যসন্ধি থাকবে। এর বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বা কোনো সজ্জন ব্যক্তি। চার বর্গের কথাই এতে থাকবে তবে একটি বর্গই মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে। এতে প্রথমে আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ থাকবে,

কখনো বা দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বা গুণকীর্তন থাকবে। প্রত্যেকটি সর্গ একই প্রকার ছন্দে পদ্যে লেখা হবে; কেবল সর্গের শেষে অন্য ছন্দের পদ্য থাকবে। খুব ছোটও নয় এবং খুব বড়ও নয় — এমন আটের বেশী সর্গ থাকবে এতে। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকবে। সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, মৃগয়া, পর্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্রণা, পুত্রজন্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ যথাসম্ভব সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে বর্ণনা করতে হবে। কাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে বা নায়কের বা অন্য কারো নামে এর নামকরণ হবে। সর্গে যে-কথার উপস্থাপন হবে — সেই অনুসারে সর্গের নাম হবে। দণ্ডীর চেয়ে বিশ্বনাথের মহাকাব্য-লক্ষণ অধিকতর পূর্ণাঙ্গ এবং তাঁর দেওয়া লক্ষণের মধ্যে মহাকাব্যের বহিরঙ্গ লক্ষণই শুধু নির্দেশিত হয় নি, তার অন্তরঙ্গ-লক্ষণটিও বলবার চেষ্টা করা হয়েছে।"

['কাব্যতত্ত্ব-বিচার' : ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

৬.২.১ মহাকাব্য : ছন্দ ও কথাবস্তু

মহাকাব্য রচনায় ছন্দের গুরুত্ব অসীম। মহাকাব্য তাই একটি ছন্দের আধারে রচিত হয়। মহাকাব্য প্রসঙ্গে ছন্দোময় ভাষা বা পদ্যছন্দের ওপর অ্যারিস্টটলের গুরুত্ব আরোপের প্রসঙ্গটি প্রণিধানযোগ্য। অ্যারিস্টটলের প্রত্যক্ষীকৃত গ্রিক-সাহিত্যের নিদর্শনসমূহ অধিকাংশই ছিল ছোটো ছোটো পদ ও এগুলি ছন্দিত ভাষায় রচিত। গ্রিক ট্র্যাজেডিসমূহ গদ্য এবং পদ্য উভয় রীতির মিশ্রণে রচিত হত। কিন্তু গ্রিক মহাকাব্যসমূহের রচনারীতিতে একপ্রকারের ছন্দ ও ভাষারীতির প্রচলন দেখা যায়। ছোটো ছোটো পদমূলক ডিথিরাম্ব, নোম কবিতা, স্তোত্রগীতি ইত্যাদিতে ছন্দের বৈচিত্র্য ছিল, মিষ্টতাও ছিল, ছিল যথেষ্ট নমনীয়তা বা চারুত্ব। মহাকাব্য পদ্যবন্ধে রচিত হলেও ছন্দের মানদণ্ডে ক্ষুদ্র পদসমূহের অনুরূপ ছিল না। মহাকাব্যের ছন্দ ছিল যথেষ্ট দৃঢ় ভাবগম্ভীর অথবা ধ্বনিগম্ভীর। এই ছন্দকে অ্যারিস্টটল উদাত্ত ছন্দ বা 'Heroic Meter' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ডিথিরাম্ব প্রভৃতি গীতিকবিতাধর্মী পদসমূহের মধ্যে যে ছন্দরীতি ব্যবহৃত হত তা উদাত্ত প্রকৃতির ছিল না।

মহাকাব্য ছন্দোময় পদ্যবন্ধে রচিত হলেও ছন্দের বৈচিত্র্য সেখানে নেই। কারণ মহাকাব্য রচিত হয় একটিমাত্র ছন্দে। মহাকাব্য রচনার ছন্দ অতিশয় গুরুগম্ভীর, অভিজাত, ধ্বনিময় ও উদাত্ত প্রকৃতির হওয়া উচিত। মহাকাব্যের ছন্দ হিসাবে অ্যারিস্টটল 'হেক্সামিটার' বা 'ষট্পদী' ছন্দের কথা বলেছেন। এই ছন্দ গুরুগম্ভীর। মহাকাব্যের ভাববস্তু বা ঘটনা পুঞ্জ ভাবগম্ভীর, উদাত্ত ও মহান। এই 'হেক্সামিটার' বা 'ষট্পদী' ছন্দও গম্ভীর ও ধ্বনিময় বলে মহাকাব্যের ভাবের সঙ্গে তার যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও একাত্মতা বর্তমান।

এলিজিক বা আয়াম্বিক রীতির ছন্দে এই বলিষ্ঠতা এবং ধ্বনিময়তা অনুপস্থিত,

লিরিক বা ডিথিরাম্ব কবিতার ছন্দরীতি পেলব ও নমনীয়। সেখানে গীতিকাব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোরম ভাবসমূহ প্রকাশিত হয় বলে তাকে ভাবের উপযোগী নমনীয়তা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু এরূপ নমনীয় কোমল ছন্দ কখনোই মহাকাব্যের উপযোগী নয়। হোমারের ভাষা ও ছন্দ অতিশয় গম্ভীর, তাতে প্রচুর অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এই সমস্ত অপ্রচলিত শব্দ, ভাষা এবং ছন্দকে এক ক্লাসিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এইজন্য অ্যারিস্টটল এই ধরনের শব্দাবলিকে মহাকাব্যের চরিত্র ও ভাবের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত বলে মনে করেন। বহুল প্রচলিত, অতিমাত্রায় লৌকিক এবং আটপৌরে ব্যবহারে ক্লিষ্ট বা দলিত শব্দ স্বভাবতই ব্যঞ্জনাহীন। এরূপ শব্দ মহাকাব্যের ভাষায় কম ব্যবহৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মহাকাব্যের ঘটনাবলি গুরুগম্ভীর প্রকৃতির হওয়ার জন্য এরূপ শব্দ সেখানে অনেকাংশেই বেমানান, তদুপরি এই ধরনের শব্দের ধ্বনিময়তা ও ব্যঞ্জনাশক্তি ক্ষীণ হওয়ার জন্য মহাকাব্যের গম্ভীর ও উদাত্ত ছন্দকে এরূপ শব্দ অনেকাংশে লঘু ও নমনীয় করে তুলতে পারে।

আত্ম-সমীক্ষামুলক প্রশ্ন

ঐতিহাসিক রচনার গঠনের তুলনায় মহাকাব্যের গঠন কীভাবে পৃথক ? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটলের মতে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের ভূমিকা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অপ্রচলিত শব্দ এবং ভাষা মহাকাব্যের ছন্দের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটলের বিচারে মহাকাব্যের কোনো ছন্দবৈচিত্র্য থাকবে না, তা একটিমাত্র ছন্দে পূর্বাপর রচিত হবে। মহাকাব্যের রচনারীতি প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টটল হোমারের কাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' আগাগোড়া একই 'হেক্সামিটার' ছন্দে রচিত। উভয়ই কাব্য ও রচনা হিসাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত। অ্যারিস্টটল হোমারের পূর্বে রচিত কয়েকটি মহাকাব্যের নামোল্লেখ করেছেন, তাদের বিষয়বস্তু ও আকৃতির পার্থক্যও নিরূপণ করেছেন। ভিন্ন ছন্দের কথাও অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেছেন কিন্তু ভিন্ন ছন্দে লেখা মহাকাব্য হিরোয়িক ভার্স-এ লেখা মহাকাব্যের মতো সফল হয়নি। হিরোয়িক ভার্স ছাড়া অন্য ছন্দে লেখা মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত তিনি উদ্ধার করেননি।

অ্যারিস্টটলের বিচারে হোমার সর্ববিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি। হোমারের কাহিনি-নির্মাণ, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষাভঙ্গি, অলংকরণ, ছন্দোময়তা সমস্ত কিছুই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। মহাকাব্যে কী ধরনের বাক্‌রীতি বা ভাষাভঙ্গি ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং এই ভাষাভঙ্গি বা বাক্‌রীতিতে রূপক অলংকারের ব্যবহার কীরূপ হবে তা বোঝাবার জন্য অ্যারিস্টটল বিস্তৃতভাবে ভাষাভঙ্গির গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন এবং হোমার থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'পোয়েটিক্‌স'-এর অন্য কোনো বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের এমন বিস্তৃতি অনুপস্থিত।

অন্যান্য শিল্পের মতো মহাকাব্যেও জীবনেরই অনুকরণ রূপায়িত হয়। অনুকরণের উপরই কাব্যের মূল কাঠামো স্থাপিত। 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল অনুকরণের ত্রিবিধ মানদণ্ডের কথা

উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন উপযুক্ত দৃষ্টান্ত আহরণ করে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

জীবনকে যেভাবেই অনুকরণ করা হোক না কেন অনুকৃত বিষয়টি সংগত, সম্ভাব্য ও বিশ্বস্ত হওয়া চাই। বস্তুজগতের সমস্তকিছুই পরিপূর্ণরূপে সংগত, এখানে অসংগতি বলে কিছু নেই। তাই বিশ্বজগতে যা কিছু ঘটেছিল বা এখনও ঘটে চলেছে সে সমস্ত কিছুই সম্ভাব্য। কিন্তু কবি বিশ্বজগতের ঘটনাসমূহের অবিকল চিত্ররূপ তাঁর কাব্যে উপস্থিত করেন না, কারণ কবি কল্পনাবিলাসী এবং স্রষ্টা। তিনি তাঁর কল্পনার সাহায্যে কাব্য-সাহিত্যে জীবনের প্রতিরূপ অঙ্কন করেন। এই অঙ্কনকর্মে কবি যদি সংগতিবোধ, সম্ভাব্যতার বোধ এবং বিশ্বাস্যতার বোধ থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে তাঁর সৃষ্ট প্রতিকৃতি কখনো জীবনের সারূপ্য লাভ করতে পারবে না। কাব্যে জীবনকে জীবন্ত, যথাযথ ও বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করা উচিত। কবির বর্ণনায় বস্তুজগতের প্রতিচ্ছবি আশা করা যায় না কিন্তু তিনি তাঁর কল্পনার সাহায্যে তাঁর অঙ্কিত চিত্র বা বর্ণিত বিষয়কে উপস্থাপিত করেন। কবির বর্ণনার বিষয় যদি বস্তুবিশ্বের নিয়ম ও তত্ত্বের দ্বারা সমর্থিত না হয় তাহলে তা মূল্যহীন। কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল এইজন্যই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্ভাব্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে মহাকাব্যের রচয়িতাকেও এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

কবি-কল্পনায় সর্বদা বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নাও ঘটতে পারে। অলৌকিক ঘটনা বা বিশ্বাস মানবচিত্তকে চিরকাল ধরে প্রভাবিত করছে। অলৌকিক ঘটনাবলির প্রতি জনসাধারণের যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে বলে কাব্য-সাহিত্যে অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হতে পারে। মহৎ কবি ও স্রষ্টাগণ এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করেন, যার ফলে সেই অলৌকিক ঘটনাসমূহ লৌকিক বা যুক্তিপূর্ণ ঘটনাবলির আবর্তে ঢাকা পড়ে যায় অথবা অলৌকিক আবহ ও বিশ্বাসের পশ্চাৎপটে এই সমস্ত ঘটনাবলিকে স্থাপন করার ফলে তা অবিশ্বাস্য হওয়া সত্ত্বেও বেমানান বা বিসদৃশ বলে মনে হয় না। হোমার তাঁর কাব্যে এরকম অলৌকিক ঘটনার যথেষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্যের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে এবং সমস্তরকম বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করে আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনাসমূহকে হোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এবং সংগতিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অ্যারিস্টটলের মতে কাব্যসাহিত্যে অসংগত বিষয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনা সাধারণভাবে না থাকাই উচিত, কিন্তু অবশ্যম্ভাবীরূপে যদি কোনো অসংগত বিষয় উত্থাপিত হয় তবে কবিকে কৌশল প্রয়োগের দ্বারা সেই অবিশ্বাস্য বা অসংগত বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্যতায় প্রতিষ্ঠা দিতে হবে, তাতেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হবে।

কাব্যের জগৎ এবং ব্যবহারিক বস্তুজগতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। অতএব কাব্যে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা এবং বিষয় বস্তুজগতের আলোকে বিচার্য নয়। অ্যারিস্টটল বলেছেন অসংগতিপূর্ণ বা আপাতবিরোধী বিষয় এবং ঘটনামাত্রই যে নিন্দনীয় তা নয়। শিল্পের প্রয়োজন এক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার্য।

অ্যারিস্টটল তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ডে আপাতবিরোধী বিসদৃশ ঘটনাবলিকে বিচার করার যে সমস্ত মানদণ্ড নির্দেশ করেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে আপাতবিরোধী ও অসংগতিপূর্ণ ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কবি কোন্ প্রসঙ্গে, কী অর্থে এবং কোন্ সূত্রের সাহায্যে এসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, — তা পরীক্ষণীয়। প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস অনুযায়ী কাব্যে বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশ ঘটলে তা দূষণীয় নয়। এই জন্য নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও পৃথিবীর মহাকাব্যসমূহ বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্পদরূপে চিরকাল ধরে বিরাজমান।

এই মানদণ্ডেই অ্যারিস্টটল হোমারকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম মহাকবিরূপে গণ্য করেছেন। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'অডিসিকে' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মধ্যে অবশ্যই কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে 'ইলিয়াড' এবং 'অডিসি' কাব্যদ্বয় সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও ত্রুটিহীন মহাকাব্যের উদাহরণ। মহৎ সাহিত্য মাত্রই এই বিশেষ লক্ষণের অধিকারী। প্রাচ্য 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-ও এই বিশেষ লক্ষণ থেকে বঞ্চিত নয়।

আত্ম-সমীক্ষামুলক প্রশ্ন

মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি উভয়ত্রই অলৌকিকতা সংযোজনার প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য কী? (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটল হোমারকে কোন অর্থে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দান করেছেন? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"এপিকের মধ্যে বিস্ময়কর ও অসম্ভব ঘটনা স্থান পেতে পারে যদি সেগুলি অবশ্যম্ভাবিতা ও সম্ভাব্যতার নিয়ম মেনে চলে। স্বর্গ বা নরকের বর্ণনা অনেক এপিক কবি অঙ্কন করেছেন। প্রাচীন এপিকে দেবতারা মানুষের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন, দেখতে পাই। আধুনিককালে হার্ডি নাটকের আকারে মহাকাব্য লিখেছেন 'The Dynasis'. নেপোলিয়নের কথা নিখুঁত ও বাস্তবপন্থায় তিনি তুলে ধরেছেন, কিন্তু এখানে aerial sprits-দের কোরাস-যুক্ত করেছেন তিনি। এঁরা মানুষদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এবং কাব্যটিকে অতিমানবীয়তার স্পর্শ এনে দিয়েছেন। আধুনিককালে মহাকাব্যে নাটকের গুণকে সংযুক্ত করে লেখা হলেও দুয়ের মধ্যে মূলত তফাত আছেই। আধুনিককালে ঔপন্যাসিকদের কেউ কেউ দীর্ঘ উপন্যাসের কালকে চব্বিশ ঘণ্টা কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। তবুও ট্র্যাজেডির ঘনীভূত ঐক্য, গতি ও গভীরতা তাতে ফুটে ওঠেনি। আবার অন্যদিকে মহাকাব্য ও উপন্যাসের বিস্তৃতি নাটকে আনা যায় না — ফলে মহাকাব্যিক মহনীয়তা ও গাম্ভীর্য নাটকে কিছুতেই আনা যায় না"।

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা : ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

৫.৩ মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি : তুলনামূলক আলোচনা

মহামতি অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে মহাকাব্যের রূপরীতি নির্ণয় প্রসঙ্গে ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের বিভিন্ন সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ট্র্যাজেডির মতো মহাকাব্যের কাহিনিও একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হবে এবং সেই ঘটনাটি হবে পরিপূর্ণ ও আদি-মধ্য-অন্ত সম্পন্ন। মহাকাব্যের কাহিনি-বিন্যাসেও ট্র্যাজেডির মতো নাটকীয়তা অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

মহাকাব্যের মূল কাহিনি একটিমাত্র ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে নিঃসন্দেহভাবে। 'ইলিয়াড' ও 'অডিসির' ঘটনাবৃত্তে একটিমাত্র কাহিনি উপস্থিত। 'মহাভারত', 'রামায়ণ'-এর মতো বৃহদাকার মহাকাব্যগুলির কাহিনিবৃত্তেও একটি করে

ঘটনাধারা বর্তমান; 'প্যারাডাইস লস্ট', 'ডিভাইন কমেডি', ইত্যাদি কাব্যসমূহও ঘটনাবৃত্ত রচনার দিক থেকে এর ব্যতিক্রম নয়। এই দিক থেকে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের মধ্যে কাহিনি নির্মাণে সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় পার্থক্য অধিক। আমরা আমাদের আলোচনায় মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে উভয়ের সাদৃশ্যের কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। এবারে আসুন উভয়ের বৈসাদৃশ্যের দিকগুলিকে চিহ্নিত করা যাক।

(ক) মহাকাব্য বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনি ব্যক্ত করে। চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নাটকীয় সংঘাত ও উপস্থাপনা কৌশলের আশ্রয় এখানে গ্রহণ করা হয়। অন্যথায় মহাকাব্য রোমান্স বা ইতিহাসে পর্যবসিত হয়। এ বিষয়ে বলা হয়েছে— "The variety and life of Epic are to be found in the drama that springs up at every counter of the personage".

(খ) ট্র্যাজেডির দৈর্ঘ্য পরিমিত। এর ঘটনাপ্রবাহকে সূর্যের এক আবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মহাকাব্যের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ নেই।

(গ) মহাকাব্যের সমস্ত উপাদান ট্র্যাজেডিতে বর্তমান কিন্তু ট্র্যাজেডির সমস্ত উপাদান মহাকাব্যে উপস্থিত নয়। ট্র্যাজেডিতে সংগীত ও দৃশ্যসজ্জা এর বৈচিত্র্য সাধন করে।

(ঘ) মহাকাব্যে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয় তা অবলম্বনে বহুসংখ্যক ট্র্যাজেডি রচিত হতে পারে। এইদিক থেকে মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির তুলনায় সংহতি ও ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মহাকাব্যে বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটে। প্রতিটি ঘটনা বর্ণনার একটি নিয়মিত দৈর্ঘ্য আছে। মহাকাব্য পাঠে মনে হয় যে, সমস্ত ঘটনা-বৈচিত্র্য ঐক্যসূত্রে বিধৃত কিন্তু ট্র্যাজেডির ঐক্য যেরূপ অখণ্ড, সুবিন্যস্ত ও অবিচ্ছেদ্য, এপিকের ঐক্য সে জাতীয় নয়।

(ঙ) ট্র্যাজেডির মতো মহাকাব্যেও আখ্যানকে (Plot) অবলম্বন করে কাহিনি নির্মাণ করতে হয়। এই কাহিনির মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত পর্যায় বর্তমান থাকে। অর্থাৎ ঘটনা-প্রবাহ আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না, এদের মধ্যে কার্য-কারণের যোগসূত্র ও পারম্পর্য বর্তমান থাকা উচিত। সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্য উভয়ত্রই বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য থাকা উচিত এবং এগুলি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হওয়া উচিত। মহাকাব্যের দৈর্ঘ্য ট্র্যাজেডির মতো কালগত ঐক্যের দ্বারা পরিমিত হয় না। তবে ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্য উভয়জাতীয় রচনার দৈর্ঘ্যই মূলত কাহিনির প্রয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"মহাকাব্যের আয়তন বিশাল, কিন্তু ট্র্যাজেডির আয়তন তুলনায় সীমিত। ট্র্যাজেডি একটি বিশেষ সময়-সীমার মধ্যে অভিনীত হয় বলে তার আয়তনেরও একটি সীমা আছে। মহাকাব্যে এই অসুবিধে না থাকায় তার আয়তনের সীমা-নির্দেশের প্রয়োজন নেই। তাই একটি ঘটনার আদি-মধ্য ও অন্তকে দেখানোর জন্য যতখানি আয়তন প্রয়োজন সেই আয়তনে তিনি মহাকাব্যটি রচনা করেন। ট্র্যাজেডি রচয়িতার যথেচ্ছ ঘটনা-সমাবেশের স্বাধীনতা নেই, কিন্তু মহাকাব্যের কবি তাঁর কাব্যকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য অনেক বেশী ঘটনা-সন্নিবেশ করতে পারেন। ট্র্যাজেডিতে একই সময়ে সংঘটিত ঘটনার নানা দিকের অনুকরণ সম্ভব নয়, কিন্তু মহাকাব্যে তা সম্ভব, কারণ তা বর্ণনাত্মক রীতিতে লেখা হয় বলে। আর এই ঘটনাংশ যুক্ত করে মহাকাব্যের বিশালতা ও মহনীয়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নানা উপকাহিনী যুক্ত করে মহাকাব্যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করা চলে, কিন্তু অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিতে উপকাহিনী যুক্ত করাকে প্রশংসা করতে পারেননি। মহাকাব্যের দৈর্ঘ্য হবে এমন যাতে— "It must be possible for the beginning and the end the of the work to be taken is one view – a condition which will be fulfilled if the poem be shorter than the old epics", অর্থাৎ দৈর্ঘ্য হবে এমন যাতে আদি ও অন্ত যেন এক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, কিন্তু তাঁর এ মন্তব্য খণ্ডকাব্য ও নাটকাদি অল্প-আয়তনের কাব্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য, মহাকাব্যের মত বিশাল রচনার পক্ষে নয়।"

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

(চ) কাব্য ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্য শুধু রীতিগত নয়। হেরোডোটাস যদি তাঁর গ্রন্থ কাব্যেও রচনা করতেন তবু সেই গ্রন্থ ইতিহাসই হত। ইতিহাস যা ঘটে তাই বর্ণনা করে কিন্তু কাব্যে থাকে সম্ভাব্যতার পরিচয়। ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ কিন্তু কাব্য বাস্তবাশ্রয়ী হয়েও বাস্তবের স্বরূপকে প্রকাশ করে। ইতিহাসে থাকে বিশেষের পরিচয় কিন্তু কাব্যে নির্বিশেষ ও চিরন্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। মহাকাব্যে ঘটনার সত্যতার দাবি যথেষ্ট, কারণ মহাকাব্য বাস্তব ঘটনা ও মানবজীবনের কাহিনি অবলম্বন করে তাদের বিশেষ তাৎপর্য প্রকাশ করে। এখানে কবি-কল্পনার অবকাশও রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে কোনো ঘটনার পরিবর্তন হলে তা বিসদৃশ বলে প্রতিভাত হবে। মহাকাব্যের ধর্ম হল শিল্পসৃষ্টির নিয়মে বাস্তব উপাদানসমূহের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করা। কবির কল্পনায় যখন ঘটনাসমূহ কাব্যে রূপান্তরিত হয় তখন পাঠক মানবজীবনের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে।

ইতিহাস একটি যুগের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। এগুলির মধ্যে পারম্পর্য নাও

থাকতে পারে। কিন্তু হোমার ট্রয়যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে 'ইলিয়াড' রচনা করলেও তিনি ঘটনাসমূহকে নির্বাচন করেছেন এবং অনেক ঘটনাকে প্রাসঙ্গিক উপাখ্যানরূপে বর্ণনা করেছেন। ট্র্যাজেডিতে একই সঙ্গে অনেক ঘটনা প্রদর্শন করা যায় না, কিন্তু এপিকের ক্ষেত্রে এই রীতি গ্রহণ করা যায়। এর ফলে মহাকাব্যে বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি প্রকাশিত হয়।

(ছ) স্থাপত্যধর্মী উন্নত হিরোয়িক ছন্দেই মহাকাব্য লিখিত হয়। অপ্রচলিত শব্দ ও রূপক ইত্যাদি এই ছন্দে সহজেই স্থানলাভ করে। হিরোয়িক মাত্রার ছন্দ অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় নিজের উপযুক্ততার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। বর্ণনারীতির মহাকাব্যকে তাই অন্য ছন্দে লেখা চলে না। কিন্তু ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ নেই। আয়াম্বিক এবং ট্রকায়িক তিন মাত্রার উদ্দীপক ছন্দ — প্রথমটি গতি ও দ্বিতীয়টি নৃত্যের অনুগামী— যে কোনো ছন্দেই, এমনকি হিরোয়িক ছন্দেও ট্র্যাজেডি রচিত হতে পারে।

এপিকে থাকে বিষয়-বৈচিত্র্য ও তা পাঠককে আনন্দ দান করে। এপিক— "Conduces to grandeur of effect to diverting the mind of the hearer, and reliving the story with varying episodes".

(জ ট্র্যাজেডিতে অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ বা বিস্ময়কর উপাদান থাকলেও মহাকাব্যের ক্ষেত্রেই এগুলির ব্যবহার প্রশস্ত। মহাকাব্যের আয়তনের বিশালতার আড়ালে এইসমস্তকে বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়। মহাকাব্য শ্রব্যকাব্য বলে অনেক আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা এতে থাকতে পারে।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিকে 'Higher form of Art' বলেছেন। ট্র্যাজেডি দৃশ্যকাব্য। এতে সমস্ত ঘটনা দর্শকগণের সামনেই অনুষ্ঠিত হয় এবং তা প্রত্যক্ষ করে দর্শকগণ আনন্দ লাভ করে। তদুপরি কাহিনি আখ্যান চরিত্র ইত্যাদির মধ্যে এক গভীর সামঞ্জস্য ও ঐক্যের ফলে তাদের রসপিপাসা চরিতার্থ হয়।

(ঝ) নাটকীয় রীতিতে সুদৃঢ় ঐক্য ও দর্শকের একাগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার সুযোগ বেশি। মহাকাব্যের নিজস্ব ঐক্য থাকলেও তুলনায় এর গঠন শিথিলতর।

(ঞ) মহাকাব্য কোনো জাতি বা মানবের সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও বিপর্যয়ের কাহিনি বর্ণনা করে। এপিকের বীর নায়কগণের কাহিনি সমাজের বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে বর্ণিত হয় ঘটনা-মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের কাহিনি। নাটকের ঘটনাসমূহ চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তবে ট্র্যাজেডির মধ্যে জীবনের পূর্ণরূপ ও মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়।

(ট) মহাকাব্য শ্রব্যকাব্য এবং বর্ণনামূলক (Narrative in form), এতে নাটকীয় উপাদানও থাকে। অন্যদিকে ট্র্যাজেডি হল দৃশ্যকাব্য এবং কার্যাত্মক।

মহাকাব্যে কবি ঘটনাসমূহ বিবৃত করেন ও তাদের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে

চরিত্রসমূহ পরিস্ফুট হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য যে মহাকাব্যের রূপরীতিমূলক আলোচনায় অ্যারিস্টটল সাধারণভাবে কবিকে নির্লিপ্ত থাকার বিধান দিয়েছেন, — কিন্তু মহাকাব্যের ক্ষেত্রে কবির এই নির্লিপ্তি বা নিরপেক্ষতার অবকাশ যথেষ্ট কম। মহাকাব্যের বর্ণনামূলকতাই এক্ষেত্রে কবির নিরপেক্ষতার পরিপন্থী হিসাবে কাজ করে।

আত্ম-সমীক্ষামুলক প্রশ্ন

কাহিনি নির্মাণের দিক থেকে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে সাদৃশ্য কী? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

দৈর্ঘ্য ও উপাদানগত বিচারে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির পার্থক্য কতটুকু? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"এবং মহাকাব্য বর্ণনাভিত্তিক বলে কবি নিজেও তাঁর নিজস্ব কথা বা মন্তব্য, স্বগতোক্তি প্রভৃতি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ মহাকাব্যের ঘটনাবলীকে অনুকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ব্যাখ্যাকারী হিসাবেও নিজেকে ব্যবহার করেন; ট্র্যাজেডির ঘটনাবলীতে নাট্যকার কেবলই অনুকারক, ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাঁর কোন ভূমিকাই

সেখানে স্বীকৃত নয়। হোমার নিজে তাঁর কাব্যকথা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ব্যক্তিগত রুচি অরুচির কথাও বলেছেন, সন্দেহ নেই তিনি খুব কমক্ষেত্রেই এরূপ করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কালের মহাকবিরা এ বিষয়ে তাঁর মত ধৈর্যবান নন। মিলটন তাঁর প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে অসংখ্যবার নিজের মতামত ব্যক্ত করে কিছু কিছু অংশের ব্যাখ্যা বা প্রসঙ্গকথা হিসাবে বহু অংশ রচনা করেছেন। বাংলার নবীনচন্দ্র সেনও বহু ক্ষেত্রে এরূপ করেছেন, সে তুলনায় মধুসূদন তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যে নিজের জবানীতে খুব বেশি কিছু বলেননি। ট্র্যাজিক নাটক— শুধু ট্র্যাজিক নাটক কেন, সমস্ত প্রকার নাটকেই কেবল নাটকীয় চরিত্র সমূহই কথা বলবে বা হস্তভঙ্গি, মুদ্রা বা যুদ্ধ ইত্যাদির আঙ্গিক প্রদর্শন করবে, কিন্তু নাট্যকার সম্পূর্ণই আড়ালে থাকবেন, এমনকি তাঁর নিজস্ব কোন মতামতই তিনি কোথাও জাহির করবার সুযোগ পাবেন না এবং পেতে পারেন না। এক কথায় বলা যায় নাটকে নাট্যকার ষোল-আনা নিরপেক্ষ ও নিরাকার থাকবেন, তার ফলে তাঁর অনুকৃত বিষয়টি সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন অবস্থায় দর্শকের সামনে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহাকাব্যে কবি নিজস্ব ইচ্ছা রুচি ও প্রয়োজন ইত্যাদির সাহায্যে পাঠকমণ্ডলীর সামনে তাঁর অনুকৃত বিষয়কে তুলে ধরেন বলে তাতে নিরপেক্ষতার কোন অবকাশ থাকেনা, অন্তত তার অবকাশ কম। অবশ্য হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীনতম মহাকবিরাও তাঁদের অনুকৃত বিষয়কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখার দিকে অশেষ যত্ন নিয়েছেন — তার প্রমাণ যথেষ্টই আছে।"

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা' : সুধাংশু শেখর তুঙ্গ]

৫.৩.১ মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি : ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব

মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির তুলনামূলক আলোচনায় অ্যারিস্টটল কর্তৃক হোমারের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হয়েছে। তিনি হোমারকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে হোমারই একমাত্র কবি যিনি কাব্যের ক্ষেত্রে কবি হিসাবে অংশগ্রহণের স্বরূপটি অনুধাবন করেছিলেন। কবির নির্লিপ্ততা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি স্বল্পকথায় ভূমিকা শেষ করে কোনো না কোনো চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন এবং প্রত্যেক চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। কিন্তু মহাকাব্য ও তার শ্রেষ্ঠ কবি হোমারের যথেষ্ট প্রশংসা করেও অ্যারিস্টটল 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডিকে মহাকাব্যের তুলনায় উন্নততর ও শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসাবে অভিহিত করেছেন।

ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের মধ্যে শিল্পের বিচারে কোনটি মহত্তম সে প্রশ্ন অ্যারিস্টটল উত্থাপন করেছেন এবং নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। যে সাহিত্য মহত্তর তা উচ্চতর ও অভিজাত শ্রেণির কাছে বেশি গ্রহণীয় এবং এইজন্য যে সাহিত্য উচ্চতর নয় বিশিষ্ট শ্রোতাদের কাছে তার আবেদন নেই। এই মানদণ্ডে বলা যায় যেসমস্ত শিল্পে সবকিছুই অনুকৃত তা মূলত স্থূল অথবা অমার্জিত। নাটকে অভিনেতারা স্থূল-সূক্ষ্ম সবরকম

অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের রসাস্বাদনে সাহায্য করেন। অভিনয় ব্যতীত দর্শকগণ রসগ্রহণ করতে পারে না। এই যুক্তিতে বলতে হয় যে ট্র্যাজেডির আবেদন সেইসব স্থূল রুচির দর্শকদের কাছে যারা অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি ব্যতীত রসগ্রহণে অসমর্থ। অতএব একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে মহাকাব্যের আবেদন সেইসমস্ত বিশিষ্ট পাঠকের কাছে যাঁরা সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন। এই শ্রেণির কাছে অঙ্গভঙ্গির সাহায্য অপ্রয়োজনীয়। অন্যদিকে ট্র্যাজেডির আবেদন অবশিষ্ট জনসাধারণের কাছে। অতএব স্থূলতার মানদণ্ডে উভয়ের মধ্যে ট্র্যাজেডি নিম্নস্তরের সৃষ্টি। কিন্তু অ্যারিস্টটল এই প্রচলিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে তিনি যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপ—

ক) অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির শিল্পকলাকে যাঁরা স্থূল বলে অভিহিত করেন, তাঁরা অভিনয়কলার প্রতি লক্ষ রেখেই তাঁদের যুক্তি উত্থাপন করেন। কাব্যকলা তাঁদের লক্ষ্য নয়। নাটকের অনুরূপ অঙ্গভঙ্গির আতিশয্য মহাকাব্য ও আবৃত্তিতেও থাকতে পারে।

খ) অভিনয় ব্যতিরেকে শুধু পাঠের মাধ্যমেও ট্র্যাজেডির রসাস্বাদন করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "That tragedy may produce its effect even without movement or action in just the same way as Epic poetry."

গ) অন্য আর একটি দিক থেকেও ট্র্যাজেডি উন্নততর। ট্র্যাজেডিতে ছয়টি উপাদান প্রযুক্ত হয়, কিন্তু মহাকাব্যের উপাদান মাত্র চারটি। আনন্দজনক উপাদানের আধিক্যহেতু ট্র্যাজেডি অবশ্যই উন্নততর। ট্র্যাজেডিতে সংগীত ও দৃশ্যসজ্জা যুক্ত হওয়ায় এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"অ্যারিস্টটল বলেন ট্র্যাজেডিতে মহাকাব্যের সমস্ত উপাদান আছে, কিন্তু মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির সব উপাদান নেই। ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের মধ্যে বহু সাধারণ ধর্ম ও গুণ বর্তমান থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট আছে। ট্র্যাজেডি ক্ষুদ্রতর এবং সূক্ষ্মতর; মহাকাব্য স্থূলকার ও ঈষৎ রূঢ়। উভয়ের ফলশ্রুতি অনেকখানি একই রকম — দর্শকচিত্তকে মহৎ আনন্দ রসে সিঞ্চিত করা। আন্তিগোনে, ওয়দিপাস তিরেন্নাস প্রভৃতি ট্র্যাজেডি পাঠ করলে বা তাদের মঞ্চাভিনয় প্রত্যক্ষ করলে দর্শক সর্বতোপ্রকারে অভিভূত হয় ও তার চিত্তে এক অমোঘ আনন্দের সৃষ্টি হয়, সে আনন্দ অতি দীর্ঘস্থায়ী। ইলিয়াদ, অদিসি বা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য পাঠ করলেও দর্শক সমানভাবে অভিভূত হয় এবং তার চিত্তে সমান ধরনের গভীর আনন্দের সঞ্চার হয়। সুতরাং ভাবধর্মে ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্য একই রকম। তবে ট্র্যাজেডি আকৃতিতে ক্ষুদ্র বিধায় মহাকাব্যের তুলনায় তাকে শ্রেষ্ঠতর বলা যেতে পারে। অ্যারিস্টটলের বিচারে এই জন্য মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে ট্র্যাজেডিই সূক্ষ্মতর। এবং সেজন্য শ্রেষ্ঠতর। "

['অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা' : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ]

ঘ) মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর ছন্দও ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে।

ঙ) পঠন অথবা অভিনয় উভয় রীতিতেই নাটকের বাস্তবতা অনুভূত হয়। অ্যারিস্টটল বলেন — "That its reality of presentation is felt in the play as read and as well as in the play as acted."

চ) নাটকের রসনিষ্পত্তির জন্য অধিকতর সংকীর্ণ পরিসরই যথেষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ যে আনন্দ বহুকাল ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করে, তা তরলতায় পর্যবসিত হয়। তুলনায় নাটকের সংহত ঘনীভূত আনন্দই অধিকতর উপভোগ্য।

ছ) স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট ট্র্যাজেডির ভাবের একাগ্রতা মহাকাব্যে অনুপস্থিত। ভাবের একাগ্রতার মানদণ্ডে ট্র্যাজেডি অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

জ) নাটকীয় রীতি অনুকরণের দিক থেকে অধিক উচ্চতর। এই উচ্চতর অনুকরণরীতির মানদণ্ডে অ্যারিস্টটল নাট্যরীতিকে মহাকাব্যিক রীতির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে অভিহিত করেছেন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"অ্যারিস্টটলের মূল্যবান বক্তব্য সত্ত্বেও এ— বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা চলে। নাটক অধিকতর অনুকৃত শিল্প বলে এর রীতি এপিকের চেয়ে 'মহত্তর' অ্যারিস্টটলের একথা সকলেই গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না, এপিকেরও নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা এমন আছে যা নাটকের আধারে সম্ভব নয়। বর্ণনামূলক রীতিতে লিখিত মহাকাব্যের একটা বড় ধর্ম হল এতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার সুবিধে। এখানে মহাকবি নিজের বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করেই বলতে পারেন এবং যেখানেই বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সেখানে তিনি সংক্ষেপে তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে পারেন। অবশ্য 'Rhetoric' গ্রন্থে অ্যারিস্টটল বলেছেন (1415 a) যে নাট্যকার 'Prologue'-এর সাহায্যে এ-কাজ করতে পারেন; কিন্তু তবুও বর্ণনামূলক মহাকাব্যেই এ কাজ অধিকতর ভালোভাবে করা যায়।"

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন :

(ক) অ্যারিস্টটলের অনুসরণে মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের স্তরসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(গ) অ্যারিস্টটল কেন মহাকাব্যের তুলনায় ট্র্যাজেডিকে শ্রেষ্ঠতর বলে দাবি করেছেন? এ প্রসঙ্গে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৫.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এবারে আসুন অ্যারিস্টটলের মহাকাব্য সম্পর্কিত আমাদের এই আলোচনার সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যাক।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখলাম যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে বীরযুগেই মহাকাব্যের প্রকৃত সৃষ্টি। জাতির সমাজমানসের ত্যাগ ও নিবৃত্তিসাধনের ইতিবৃত্তই এই যুগের মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এইগুলি জাত মহাকাব্যের শ্রেণিভুক্ত, সাহিত্যিক মহাকাব্যের অবস্থান এর বিপরীতে। অ্যারিস্টটল প্রথমোক্ত ধারা অবলম্বনেই তাঁর আলোচনা সম্প্রসারিত করেছেন।

মহাকাব্যের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে অ্যারিস্টটল সূত্র নির্দেশ করেছেন। মানুষের অনুকরণপ্রবণতা এবং সংগতিবোধ ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ থেকেই মহাকাব্যের উৎপত্তি। মহাকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে হোমারকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

মহাকাব্যের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন বারবার এবং ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা প্রতিতুলনার মানদণ্ডে তিনি মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করেছেন। আমরা আমাদের আলোচনায় সেই সমস্ত প্রসঙ্গ পূর্বাপর বিশ্লেষণ করেছি। মহাকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মহাকাব্য অনুকরণ, এবং এটি বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে একটিমাত্র ছন্দে বিবৃত হয়। ট্র্যাজেডির মতো এর কাহিনিও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহাকাব্যে থাকবে আদ্যন্ত নিটোল একটি কাহিনি। একটিমাত্র ঘটনা এবং একজনমাত্র নায়কই মহাকাব্যের উপযুক্ত অবলম্বন। মহাকাব্যের ছন্দ এবং কাহিনিবৃত্তের ওপর অ্যারিস্টটল অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির তুলনামূলক আলোচনায় দেখা গেল যে ঘটনা, কাহিনিবৃত্ত ও নাটকীয়তার দিক থেকে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন বিষয়ে এদের পার্থক্যও রয়েছে। উভয়ের উপাদান, দৈর্ঘ্য, ছন্দ ও অলৌকিকতা ইত্যাদি এই পার্থক্য সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের সর্ববিধ আলোচনার শেষে হোমারকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি হিসাবে অভিহিত করেও মহাকাব্যের তুলনায় ট্র্যাজেডিকে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। উপাদানের সংখ্যাধিক্য, ছন্দসংযোজনা, বাস্তবতা, ভাবের একাগ্রতা, নাটকীয় রীতি ইত্যাদির মানদণ্ডে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিকে মহাকাব্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

৫.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

ভার্জিল :

বিখ্যাত রোমীয় কবি। প্রসিদ্ধ 'ইনিড' কাব্যটি তাঁরই রচনা।

মিলটন :

প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তিনি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিচারে কিছুদিন কারাভোগ করেন। কারামুক্ত হওয়ার পর তিনি 'প্যারাডাইস লস্ট', 'প্যারাডাইস রিগেন্ড' এবং 'স্যাম্‌সন্‌ অ্যাগোনিস্টেস' নামক তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ Areopagitica বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কুমারসম্ভব :

কবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। এতে হর-পার্বতীর মিলনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটির সাতটি খণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

বাল্মীকি :

'রামায়ণ' প্রণেতা ভারতের আদিকবি।

রঘুবংশ :

মহাকবি কালিদাস-কৃত সংস্কৃত মহাকাব্য। রামচন্দ্রের পিতামহ রঘুর বংশ বর্ণনা করা হয়েছে এতে। রঘুর পিতা দিলীপ থেকে শুরু করে রামের অধস্তন ২১ শ পুরুষের বর্ণনা এতে প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯ টি সর্গে বিভক্ত ও 'রামায়ণ' অবলম্বনে লিখিত।

টাসো :

এঁর জীবৎকাল ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। টাসো বিখ্যাত ইতালীয় কবি। 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

ব্যাস :

'মহাভারত' ও অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা এবং বেদ বিভাগকর্তা মুনি।

ডিভাইন কমেডি :

বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তে রচিত মধ্যযুগের বিরাট কাব্যগ্রন্থ। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এর রচনা শুরু হয়। এই গ্রন্থ বহুবার পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই কাব্যের জন্য কবির প্রণয়িনী বিয়ত্রিচ-এর নামও জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে।

নোম কবিতা :

নোম কবিতা হল একক সংগীত বিশেষ। এটি গীত হত দেবতা অ্যাপলোর উৎসবে।

৫.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

প্রশ্নাবলি ষষ্ঠ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

৫.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

ষষ্ঠ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৬
অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'
অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ : বিবিধ প্রসঙ্গ

বিষয় বিন্যাস

৬.০ ভূমিকা (Introduction)
৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৬.২ ট্র্যাজেডি শ্রেণি
৬.৩ উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্ক্রিয়ার নানারূপ
৬.৪ অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতা
৬.৫ অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এর পরিচ্ছেদ-ভিত্তিক মর্মার্থ
৬.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৬.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৬.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৬.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৬.০ ভূমিকা (Introduction)

আমরা আমাদের আলোচনার প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি যে, বর্তমান অধ্যায়ে কিছু অনালোচিত বিবিধ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য। এই অধ্যায়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে গৃহীত বিষয়সমূহের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো পারম্পর্য বা সম্পর্কসূত্র অনুপস্থিত। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনায় এইসমস্ত প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। তদুপরি অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স'-এর বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রসগ্রহণের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত প্রসঙ্গসমূহের উপযোগিতা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত বর্তমান অধ্যায়ে 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের পরিচ্ছেদ-ভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার বা মমার্থ সংযোজিত হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যাতে অ্যারিস্টটল-কথিত সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্রসমূহ স্বল্পায়াসে অনুধাবন করা যায়।

মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা ট্র্যাজেডির মধ্যে চিত্রিত হয়। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে অষ্টাদশ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অনুবাদক ও অ্যারিস্টটল-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। অ্যারিস্টটলকৃত ট্র্যাজেডির শ্রেণিবিন্যাস এরূপ — জটিল ট্র্যাজেডি, করুণ ট্র্যাজেডি, নৈতিক ট্র্যাজেডি ও সরল ট্র্যাজেডি।

উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্ক্রিয়া অ্যারিস্টটলের মতে এক প্রকার পরিবর্তন। এই পরিবর্তন তাঁর মতে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে পরিবর্তন। এর ফলে যে সমস্ত ব্যক্তির সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনুরাগ বা ঘৃণার সৃষ্টি হয়। অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে আবিষ্ক্রিয়ার নানা রূপ বা রীতি চিহ্নিত করেছেন এবং এক বিশেষ প্রকার আবিষ্ক্রিয়াকে শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁর মতে সেই উদ্‌ঘাটনই শ্রেষ্ঠ যেখানে পরিস্থিতির বিপর্যয়ের সঙ্গেই তা প্রকাশিত হয়।

কাহিনি এবং চরিত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটল দুটি মূল্যবান সূত্রের অবতারণা করেছেন। সে দুটি হল অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতা। তিনি বলেছেন কাহিনির প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি আচরণ কাহিনির মধ্য থেকেই উদ্ভূত হবে। বাইরে থেকে তা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকতা পরিহার করাই শুধু নয়, তাঁর মতে কাহিনির পক্ষে অসম্ভাব্য প্রসঙ্গমাত্রেই ক্ষতিকর। কাহিনির ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটনাসূত্রে জাত নয়, তাই বস্তুত অসম্ভব।

কাজের অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতার ধারণা মূলত জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এর জন্ম, সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতার বিধি-বিধান জীবনে ক্রিয়াশীল বলেই মানুষ কাব্যেও তার আস্বাদ পেতে চায়। কাব্যের গঠনে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলেও তা মানুষের জীবনবিন্যাসের অক্ষমতাকে প্রকাশ করে।

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবারে আমরা এই বিষয়ক আলোচনার ষষ্ঠ বিভাগে প্রবেশ করতে চলেছি। আমাদের এই বিভাগের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনালোচিত কিন্তু প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিশেষ প্রসঙ্গ।

বর্তমান বিভাগে আমরা আমাদের বিবিধ বিষয়ক আলোচনাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যে সেই আলোচনা থেকে-

- আপনারা অ্যারিস্টটল-কৃত ট্র্যাজেডির শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- নাট্যবৃত্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনিবার্যতা (necessity) এবং সম্ভাব্যতা (probability)— এই প্রসঙ্গদ্বয়ের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- আবিষ্ক্রিয়ার নানারূপের আলোচনার মাধ্যমে আপনারা আবিষ্ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ রীতিটিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্‌স'-এর পরিচ্ছেদ-ভিত্তিক মর্মার্থ শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে আপনারা স্বল্প পরিসরে পোয়েটিক্‌স গ্রন্থের বিষয়সমূহ সম্পর্কে এক সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

৬.২ ট্র্যাজেডির শ্রেণি

ট্র্যাজেডির স্রষ্টা ইস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস, কিন্তু ট্র্যাজেডিতত্ত্বের প্রথম সূত্রকার ও ব্যাখ্যাতা মহামনীষী অ্যারিস্টটল। প্রথম সূত্রকারের শ্রেণিবিভাগ হিসাবে 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির যে শ্রেণিবিভাগ অ্যারিস্টটল করেছেন, পরবর্তীকালের আলোচনায় তা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির যে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন তা এরূপ—

১) জটিল (Complex) ট্র্যাজেডি।

২) করুণ (Pathetic) ট্র্যাজেডি।

৩) নৈতিক (Ethical) ট্র্যাজেডি।

৪) সরল (Simple) ট্র্যাজেডি।

জটিল ট্র্যাজেডি (Complex Tragedy) : অ্যারিস্টটলের মতে জটিল ট্র্যাজেডিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণির ট্র্যাজেডির বৃত্তগঠনরীতিতে বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন একটু বেশি মাত্রায় উপস্থিত। বিপ্রতীপতা এবং উদ্‌ঘাটন দুটিই অ্যারিস্টটলের মতে এক ধরনের পরিবর্তন। প্রথমোক্ত রীতিতে নাট্য-ঘটনা সম্ভাব্য ও আবশ্যকের নিয়মাধীন হয়েও তা বিপরীত দিকে গতিশীল হয়। দ্বিতীয়টিতে যে পরিবর্তন তা মূলত অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে। বিপ্রতীপতার সঙ্গে সঙ্গেই যেখানে উদ্‌ঘাটন প্রকাশিত হয় সেটিই অ্যারিস্টটলের মতে সর্বোৎকৃষ্ট। এই ধরনের ট্র্যাজেডির মূলভাব করুণা (pity) এবং ভয় (fear)। কিন্তু এই করুণা দর্শকগণকে ক্রন্দনাকুল করে তোলে না। কারণ পেরিপেটি ও ডিসকভারি বৃত্তের ভাবকে এক নতুন মর্যাদা দান করে।

করুণ ট্র্যাজেডি (Pathetic Tragedy) : এই ধরনের ট্র্যাজেডিতে কারুণ্যের মাত্রাধিক্য দেখা যায় এবং ভাবাবেগ (Passion) সৃষ্টির দিকে নাট্যকারের লক্ষ থাকে বেশি। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে সফোক্লিসের 'Ajax' এবং ইউরিপিডিসের 'Ixion' - এর নামোল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটির নায়কের অজ্ঞানকৃত ভুলের জন্য তাঁর যে নিন্দা ও অখ্যাতির রচনা হয় তা মৃত্যুরও অধিক। নায়কের এই মর্মান্তিক বেদনাই নাটকের ভাবকে কারুণ্য দান করেছে। অ্যারিস্টটল এই শ্রেণিটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিলেও পরবর্তীকালে এটি অনেক সমালোচক দ্বারা অস্বীকৃত হয়েছে। তবু এই শ্রেণির ট্র্যাজেডি শুধু গ্রিক ট্র্যাজেডির যুগেই নয়, পরবর্তী এলিজাবেথ যুগে এবং আধুনিক কালেও যথেষ্ট রচিত হয়েছে। এই শ্রেণির ট্র্যাজেডিতে করুণরস সৃষ্টির উপাদান থাকা সত্ত্বেও এগুলি ট্র্যাজিকবোধ সৃষ্টিতে সক্ষম কিনা নাট্যবিচারে এপ্রসঙ্গটিই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য।

নৈতিক ট্র্যাজেডি (Ethical Tragedy) : বাইওয়াটার তাঁর অনুবাদে এই শ্রেণির ট্র্যাজেডিকে চরিত্র-মুখ্য ট্র্যাজেডি বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের নাটকে কোনো একটি নৈতিক সমস্যার নির্ভরে কোনো একটি চরিত্রকে আশ্রয় করে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির দিকে নাট্যকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এই সমস্যা সমাধানের মধ্যেই নাটকের সার্থকতাও নিহিত থাকে।

সরল ট্র্যাজেডি (Simple Tragedy) : এটি অ্যারিস্টটল-কৃত ট্র্যাজেডির সর্বশেষ বিভাগ। Complex Tragedy-র বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন এতে অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া এই ধরনের ট্র্যাজেডিতে ঘটনাবিন্যাসেও সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতার সূত্র রক্ষিত হয় না। তবে অ্যারিস্টটল কথিত করুণা ও ভীতি এরূপ ট্র্যাজেডিতে দর্শকচিত্তে উদ্রিক্ত হয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"লক্ষ করলে দেখা যাবে এমন শ্রেণী বিভাজনের মূলে আছে ট্রাজেডির গঠন ও ভাবের চিন্তা। অ্যারিস্টটল 'দৃশ্যসর্বস্ব' (spectacular) উপাদান সমন্বিত নাটককে কোনো শ্রেণীভুক্ত করেননি। 'Phorcides' এবং 'Prometheus' -এ দুটি নাটক দৃশ্যপ্রাণ বলে এদের তেমন তিনি মূল্য দেননি। অ্যারিস্টটল যে-পন্থায় শ্রেণী বিভাগ করেছেন পরবর্তী কালে নাটকের শ্রেণী বিভাজনে তা খুব একটা সহায়ক হয়নি।

অ্যারিস্টটলের এই শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা বলা চলে। অ্যারিস্টটল জটিল (Complex) ট্রাজেডিকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন— এতে নায়কের পরিস্থিতি বা ভাগ্য বিপর্যয় এবং প্রত্যভিজ্ঞান (Recognition) থাকার বলে 'বিস্ময়' ভাবও দেখা দেয়— একথাও তিনি বলেছেন। অনেক পরে অধ্যাপক নিকল ট্রাজেডির মূলভাব বলতে 'awe and grandeur' -এর কথা বলেছেন এবং অ্যারিস্টটলের Pity বা 'অনুকম্পা' -কে অস্বীকার করেছেন। তবে 'বিস্ময়ের' ভাব শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডিতে যে থাকে একথা অ্যারিস্টটল যখন বলেছেন, তখন নিকল ট্রাজেডির 'মূলভাবের' প্রসঙ্গে যে একেবারে নূতন কথা বলেছেন, তা বলা যায় না — এর ইঙ্গিত তার মধ্যেও মেলে।"

[অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

আত্ম-সমীক্ষামুলক প্রশ্ন

অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতা বলতে সাধারণভাবে কী বোঝায় ? (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির শ্রেণি কয়টি ও কী কী? কোন শ্রেণির ট্র্যাজেডিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

চরিত্রকেন্দ্রিক ট্র্যাজেডিকে কেন নৈতিক ট্র্যাজেডি বলে উল্লেখ করা হয়েছে?
(৩০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

৬.৩ উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্ক্রিয়ার নানারূপ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নাটকের বৃত্তগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বিপর্যাস, এবং উদ্‌ঘাটনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। উদ্‌ঘাটনকে তিনি বলেছেন যে এটি হল অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের অবস্থাপ্রাপ্তি। এই উদ্‌ঘাটন করুণা ও ভয় উদ্রেক করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ্যারিস্টটল এই আলোচনায় আবিষ্ক্রিয়ার প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে কোন প্রকার উদ্‌ঘাটন শ্রেষ্ঠ তা দৃষ্টান্তসহ প্রতিপন্ন করেছেন।

'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে উদ্‌ঘাটনের বাহ্যিক নিদর্শনের উল্লেখ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল কতকগুলি যান্ত্রিক প্রকৃতির লক্ষণ ও চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামতও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি চিহ্ন দ্বারা আবিষ্ক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে এই ধরনের উদ্‌ঘাটন প্রস্তুত হয় কতকগুলি চিহ্ন বা বস্তুর সাহায্যে, যেমন দেহের কোনো ক্ষতচিহ্ন অথবা কোনো জন্মগত চিহ্ন, এমনকি উল্‌কিচিহ্ন। তাঁর মতে এই চিহ্নগুলি শিল্পমূল্যে অনুন্নত। গ্রিক নাটকে প্রচুর পরিমাণে এই সমস্ত চিহ্নের সাহায্যে উদ্‌ঘাটন রচিত হয়েছে। অ্যারিস্টটল এই প্রক্রিয়াকে অভিনন্দিত করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গেই অ্যারিস্টটল বলেছেন যে নানারকম

অলংকারকেও অনেক নাট্যকার বহিরঙ্গ উপায় হিসাবে উদ্‌ঘানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

কোনো চরিত্রের মুখে নিজের পরিচয়-প্রকাশকে অ্যারিস্টটল উদ্‌ঘাটনের অন্য আর একটি শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 'ইফিজেনিয়া'-তে অরিস্টিস নিজের পরিচয় নিজেই প্রকাশ করেছেন এবং 'ইফিজেনিয়া' তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছেন একটি পত্রের সাহায্যে। এই ধরনের উদ্‌ঘাটনও অ্যারিস্টটলের মতে উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশল নয়।

উদ্‌ঘাটনের অন্য আর একটি শ্রেণি হল স্মৃতির সাহায্যে লুপ্ত ঘটনার উদ্ভাসন। অনেক ক্ষেত্রে একটি বস্তু দেখে সেই বস্তুর বা অনুরূপ বস্তুর সঙ্গে জড়িত সম্পূর্ণ ঘটনা স্মৃতির অতল থেকে চিত্তপটে উঠে আসে। এরূপ বিষয়কে 'ল অব অ্যাসোসিয়েশন' বলে। গ্রিক নাটকে প্রচুর পরিমাণে এই রীতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

যুক্তি-বিচারের সাহায্যে নির্ণীত উদ্‌ঘাটনকে অ্যারিস্টটল এর আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনাকে যুক্তির নির্ভরে সংযুক্ত করে এখানে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়। পোলিইডাসের নাটকে ইফিজেনিয়ার দ্বারা এভাবেই সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

এর পরবর্তী স্তরে আছে যৌগিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রসঙ্গ। একে অনুমাননির্ভর উদ্‌ঘাটনও বলা যায়। অনুমানকে অবলম্বন করে এখানে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। এতে পাত্রপাত্রীদের কোনো একজনের মনে মিথ্যা অনুমানের সঞ্চার ঘটে। অ্যারিস্টটল এই প্রক্রিয়াকেও নিম্নস্তরের কলাকৌশল বলে মনে করেন।

ঘটনার নিজস্ব ধারা থেকে উদ্ভূত স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট উদ্‌ঘাটনকে অ্যারিস্টটল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে মনে করেন। তিনি 'ইডিপাস' ও 'ইফিজেনিয়া'-র ঘটনাবলির মধ্যে নিহিত ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রকাশিত উদ্‌ঘাটনকেই সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করেছেন।

৬.৪ অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতা

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতা (necessity and probability) শব্দদ্বয় প্রয়োগ করেছেন। কাব্য নির্বিশেষ বা সর্বজনীনকে উপস্থাপিত করে। নির্বিশেষ বা সর্বজনীন শব্দটির সীমারেখা নির্ধারণে অ্যারিস্টটল বলেন যা নির্বিশেষ বা সার্বজনীন তা হল মূর্ত। এই ব্যাপারটি চরিত্রগত কোনো সাধারণ সত্যের মানদণ্ডে তিনি প্রয়োগ করেননি। তাঁর মতে এটি ঘটনার সম্ভাব্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতার ফল। বিশেষ বা ব্যক্তিকে আশ্রয় করলেও তা নির্বিশেষে পরিণত হয়। অ্যারিস্টটল মনে করেন কাব্যিক সর্বজনীনতা ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়, চরিত্র ও চিন্তার মাধ্যমে তা ততটুকু প্রকাশিত হয় না। একজন ব্যক্তির অনেক কাজ যখন আবশ্যিকতা বা অবশ্যম্ভাবিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা সেই অভিমুখে চালিত হয়, তখন তার কাজ সর্বজনীনতার দিকেই যায়। আবশ্যিকতার ঐক্যবিধায়ক শৃঙ্খলের মানদণ্ডেই ইতিহাসের

বিশেষ কাব্যে সর্বজনীন বা নির্বিশেষরূপে পরিবেশিত হয়। অ্যারিস্টটল আবশ্যিকতা বা necessity -কে একটি অপ্রতিরোধ্য সত্তা হিসাবে অভিহিত করেছেন। ইডিপাসের কাহিনি ইতিহাস-নির্ভর না কবিকল্পিত — তা বিচার্য নয় — বিচার্য হল আবশ্যিকতার নিয়ম। এই নিয়মের মানদণ্ডেই কবি কর্তৃক শিল্পের উপাদানসমূহের পুনর্বিন্যাস ঘটে, অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জিত হয় এবং নতুন উপাদানও যুক্ত হয়। অনিবার্যতার বোধই কবির আখ্যানকে সর্বজনীন করে তোলে।

গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল অবশ্যম্ভাবিতাকে (necessity) কাব্যের সামান্য সত্যের মর্যাদা দান করেছেন। একে অনেক সময় কার্যকারণ সম্পর্ক বলে মনে হয়, কখনো মনে হয় তা পূর্ববর্তী ঘটনাবলির অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু বস্তুত তা নয়। শিল্পের কার্যকারণের সঙ্গে বিজ্ঞানের কার্যকারণের পার্থক্য আছে। প্রাত্যহিক জীবনে এবং বিজ্ঞানে কার্য হল কারণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু বস্তুত এইগুলি অমূর্ত। কাব্যের মূল কথা হল এর মূর্ততা (concritness)। এতে প্রতিটি স্তরের উপস্থিতিতে পরস্পর স্থিরীকৃত হয়। অ্যারিস্টটলের মতে নাট্যকর্ম একক দৃষ্টিতে গ্রাহ্য। নাট্যের উপাদান অথবা বৃত্তকে অবশ্যই বিশ্লিষ্ট করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে সেগুলির কোনো আলাদা মূল্য থাকে না। নাটকে অবস্থার সঙ্গে চরিত্রের সংঘাতে ঘটনা সৃষ্টি হয়। বাইরের অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার স্থান এখানে নেই। অর্থাৎ তাঁর মতে বাইরের প্রভাবে নাটকের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত হবে না, তা অভ্যন্তরীণ নিয়মেই গড়ে উঠবে। তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য হল এই যে নাটকে বর্ণিত ঘটনা, অবস্থা ও চরিত্রের নৈতিক গুণ এবং চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জসপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বস্তুত কবির ধর্ম যা ঘটতে পারে তা পরিস্ফুট করা, যা ঘটেছে তা বর্ণনা নয়। স্বভাবতই এখানে আকস্মিকতার কোনো স্থান নেই। কাব্যে বা নাটকে পরিণতির অনিবার্যতা, চরিত্র ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক, ঘটনার গতি ও পরিণতির ওপর চরিত্রের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"কাব্যিক অবশ্যম্ভাবিতা ও বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল প্রথমটিতে বিস্ময়কর উপাদান থাকে। এখানে অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে বিস্ময় সহাবস্থান করে। মনে রাখতে হবে ট্রাজিডি শুধুমাত্র আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ঘটনাকেই অনুসরণ করে না — যে ঘটনা অনুকম্পা ও ভীতি-ভাব জাগ্রত করে তাকেও অনুকরণ করে। আর এমনতর ঘটনা মনে সব থেকে বেশী প্রভাব ফেলে 'When they occur unexpectedly and at the sametime in consequence of one another' (1452) । আর সকল আবিষ্ক্রিয়ার মধ্যেও সেইটি যখন ঘটনার মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় ও সম্ভাব্য ঘটনার মধ্য দিয়ে 'বিস্ময়' নিয়ে আসে। আর এমনটিই হয়েছে ঈডিপাস নাটকে। নাটকের এই অবশ্যম্ভাবিতাকে দুটি কারণে কার্যকারণতত্ত্ব বা পূর্ববর্তী ঘটনার ফল বলে মনে করা যায় না। প্রথমত, নাট্যবৃত্তের সব স্তরগুলিকে এখানে 'একক দৃষ্টি'তে (sin-

gle view) দেখা হয়, দ্বিতীয়ত, এখানে সর্বদাই অপ্রত্যাশিতের উপাদান নিহিত থাকে। আবার বিজ্ঞান যে দৈব-সংঘটনকে অস্বীকার করে, নাট্যে যেখানে বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ব্যাপার থাকে, সেখানে দৈব ঘটনারও স্থান থাকে।"

['অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা' : ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়]

অবশ্যম্ভাবিতা বা অনিবার্যতা অর্থাৎ যা বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে এবং দৈব সংঘটনকেও যার অন্তর্গত করে তা দর্শকের মনে সম্ভাব্যতার (Probability) বোধ সঞ্চার করে। অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতা দুটি এক নয়, কিন্তু অনিবার্যতার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই সম্ভাব্যতার আত্মপ্রকাশ। অনিবার্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েই সম্ভাব্যতা বাস্তব ও বিস্ময়কর অর্থাৎ সত্য ও কল্পনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। কাব্যনাটকে কোনো ব্যক্তির বক্তব্য ও কার্যের সঙ্গে তার চরিত্রের সম্পর্ক অনিবার্য অথবা সম্ভাব্য হবে — এই নিয়মবন্ধনই হল 'সামান্য সত্য'।

'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে অ্যারিস্টটল সম্ভাব্যতা শব্দটিকে অন্য আর একটি অর্থেও ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে জীবনে যা ঘটে না এমন ঘটনার প্রতিষ্ঠাও কাব্যে প্রশস্ত, যদি তা পাঠকের মনে প্রতীতি সঞ্চার করতে পারে। তাই কাব্যে অবিশ্বাস্য সম্ভবের তুলনায় বিশ্বাস্য অসম্ভবের পরিস্ফুটন অধিক কাম্য। কাব্যে সত্য বা অসত্যের মূল্যায়ন বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার্য নয়। কাব্যের ক্ষেত্রে কবিকে বস্তুর শিল্পসম্মত রূপ নির্মাণ করতে হবে, যার প্রতিটি অঙ্গ প্রাণীদেহের অনুরূপ আবশ্যক ও সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত এবং গঠনবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক ও পারম্পর্য কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

অ্যারিস্টটল কী কী ধরনের উদ্‌ঘাটনের উল্লেখ করেছেন? কোন্ প্রকার উদ্‌ঘাটন তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ ? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী ? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

কাব্যের ক্ষেত্রে বিশ্বাস্য অসম্ভবের স্থান কী ? (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

৬.৫ অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এর পরিচ্ছেদ-ভিত্তিক মর্মার্থ

ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স বা কাব্য ও শিল্পতত্ত্বমূলক গ্রন্থটি পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি মূলত বিভিন্ন বিষয়ের রূপরীতির সূত্রনির্দেশ করেছেন। তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির অন্তরঙ্গ বিচারে বিভিন্ন বিষয়ের প্রচুর শ্রেণিবিভাগ ও তুলনামূলক আলোচনার দিকে তাঁর যে এক বিশেষ ঝোঁক ও পক্ষপাত ছিল তা ধরা পড়ে এবং তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটল তাঁর পূর্বের ও সমকালের প্রচলিত কাব্যশিল্পের ওপর ভিত্তি করেই এসমস্ত মূল্যবান আলোচনা উত্থাপিত করেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে কোনো সাহিত্যতাত্ত্বিক দ্বারা তাঁর কিছু কিছু সূত্র প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তবু উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতার মানদণ্ডে অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' অদ্যাবধি সমান জনপ্রিয় ও সমাদৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এখনো পর্যন্ত এই গ্রন্থটি নানা দেশে অজস্র ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদকগণ অনেকেই তাঁদের অনুবাদে একে 'পোয়েটিক্স' আবার কেউ কেউ কাব্যতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

গ্রন্থের প্রথমেই অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়েই তিনি তাঁর অন্বিষ্ট এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন— "কাব্য ও তার শ্রেণীবিভাগ, প্রত্যেকটি শ্রেণীর সম্ভাবনা, কীভাবে একটি কাহিনীর গ্রন্থন হলে কাব্য সুষ্ঠু হয়, (বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কতটা পার্থক্য, পার্থক্যের প্রকৃতি কী এবং) কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় আমি আলোচনা করব।" (অনুবাদ : শিশিরকুমার দাশ)

আমরা এবার ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অনুসরণ-ক্রমে 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ-ভিত্তিক মর্মার্থ উপস্থিত করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ :

এখানে তিনি বলেছেন যে সমস্ত শিল্পই অনুকরণ। মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডিথিরাম্বিক কবিতা এবং বাঁশি ও বীণাবাদন ইত্যাদি সবকিছুই সাধারণভাবে অনুকরণের নানা উপায়। এদের একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য তিনটি বিষয়ে---অনুকরণের মাধ্যম, অনুকরণের বিষয় এবং অনুকরণের রীতিতে। কাব্য, নৃত্য ও সংগীতকে শ্রেণিবিভক্ত করা হয় মাধ্যমের সাহায্যে। যেমন নৃত্যের মাধ্যম ছন্দ, সংগীতের সুর; কাব্যের মাধ্যম ছন্দ ও ভাষা; কোরাল লিরিকের মাধ্যম হল ছন্দ সুর ও ভাষা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুকৃত শিল্পের বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। লৌকিক জীবনের তুলনায় ট্র্যাজেডিতে উন্নত বা সুন্দরতররূপে অনুকরণ করা হয়। লৌকিক জীবনের তুলনায় কমেডিতে মানুষকে হীনভাবে অনুকরণ করা হয়। আবার লৌকিক জীবনে মানুষ যা ঠিক তেমনি যথাযথভাবে অনুকরণের আলাদা একটি রীতিও রয়েছে। মানুষের মধ্যে উন্নততর হেয় অথবা ভালোমন্দের ভেদাভেদ নৈতিক পার্থক্যেরই পরিচায়ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

তৃতীয় পরিচ্ছেদে কাব্যে যে পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় তার কথা বলা হয়েছে। মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু এক হলেও কবি দুভাবে অনুকরণ করতে পারেন —

(ক) বর্ণনার দ্বারা — হোমার যেরূপ অন্য ব্যক্তির মুখে অথবা নিজে বর্ণনা করেছেন।

(খ) পাত্রপাত্রীকে দর্শক-সমক্ষে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীলরূপে উপস্থাপিত করে। একে নাটকীয় রীতি বলা হয়।

কমেডির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে তিনি এই অধ্যায়ে দুই একটি মন্তব্য করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

চতুর্থ পরিচ্ছেদে স্থানলাভ করেছে কাব্যের উৎপত্তি, কাব্যের ক্রমবিকাশ ও ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশের কথা।

কাব্যের উৎপত্তির মূলে দুটি কারণ রয়েছে। এদুটি কারণের মূল আমাদের স্বভাবে নিহিত। তার মধ্যে একটি হল অনুকরণবৃত্তি এবং অন্যটি ছন্দ ও সংগতিবোধ। মানুষের মধ্যে অনুকরণবৃত্তির প্রকাশ শৈশব থেকেই দেখা যায়। এই দুই বৃত্তিই ক্রমাভ্যাসের ফলে কাব্যসৃষ্টির শক্তি দান করে।

ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাব্যের দুটি ভাগ। গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষের দ্বারা মহাপুরুষদের ক্রিয়াকলাপ অনুকৃত হল, ফলে সৃষ্টি হল দেবস্তুতি ও মহাপুরুষস্তুতি। লঘু-প্রকৃতির লোক নিম্নশ্রেণির মানুষের অনুকরণ করলেন, ফলে সৃষ্টি হল ব্যঙ্গরচনা। এর ছন্দ আয়াম্বিক বা ব্যঙ্গের ছন্দ। প্রথম স্তরের লেখকরা ছয়-মাত্রার হিরোয়িক ছন্দে লিখেছেন। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি উন্নত ও সুন্দরের অনুকরণ এবং ব্যঙ্গ ও কমেডি নিম্নশ্রেণির অনুকরণ। ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ডিথিরাম্ব গীতি থেকে এবং কমেডির উৎপত্তি ফ্যালিক গীতি থেকে। ইস্কাইলাসে এসে ট্র্যাজেডিতে দ্বিতীয় অভিনেতা যুক্ত হল, সফোক্লিসে তৃতীয় অভিনেতা এবং চিত্রিত দৃশ্য ব্যবহৃত হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

এতে আছে কমেডি, এর প্রকৃতি এবং ক্রমবিকাশের কথা। কমেডি নিম্নশ্রেণির চরিত্রের অনুকরণ। যে বিকৃতি বেদনাদায়ক বা ক্ষতিকর নয় তা হাস্যকর। ট্র্যাজেডির ক্রমবিকাশের মতো কমেডির কোনো ইতিহাস নেই।

এই পরিচ্ছেদে এপিক ও ট্র্যাজেডির তুলনা করা হয়েছে। উভয়ত্রই উচ্চশ্রেণির চরিত্রের ছন্দোবদ্ধ অনুকরণ স্থান পায়। দৈর্ঘ্য ছন্দ এবং বর্ণনার দিক থেকে উভয়ের পার্থক্য আছে। এপিক পূর্বাপর একই ছন্দে লিখিত কিন্তু ট্র্যাজেডিতে বহু ছন্দ থাকে, এর রীতি বর্ণনাত্মক। মহাকাব্যে ঘটনার কালমাত্রার সীমাবদ্ধতা নেই। মহাকাব্যের সব উপাদান ট্র্যাজেডিতে আছে কিন্তু ট্র্যাজেডির সব উপাদান মহাকাব্যে নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

এখানে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ও এর ছয়টি উপাদানের কথা বলা হয়েছে।

ট্র্যাজেডির বিষয় : (ক) একটি মাত্র ঘটনা,
(খ) গুরুগম্ভীর,
(গ) সম্পূর্ণ,
(ঘ) নির্দিষ্ট আয়তনযুক্ত।

মাধ্যম : এর মাধ্যম ভাষা এবং তাকে নানাভাবে অলংকৃত করা হয়।

রীতি : বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত।

সমাপ্তি : ভাবমোক্ষণ (Catharsis)।

গুরুত্ব অনুসারে ছয়টি উপাদান ট্র্যাজেডিতে থাকে — কাহিনি বা আখ্যান, চরিত্র, অভিপ্রায়, রচনারীতি, সংগীত ও দৃশ্যসজ্জা। বৃত্ত হল কার্যের অনুকরণ। কার্যের অনুকরণ এবং বৃত্ত বলতে বোঝায় ঘটনার যুক্তিনির্ভর বিন্যাস। চরিত্র মানুষের এমন একটি ধর্ম যা থাকার জন্য আমরা ব্যক্তিতে গুণ আরোপ করি। চরিত্র নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে।

অভিপ্রায়ের অবকাশ সেখানেই যেখানে কোনো সিদ্ধান্ত অথবা সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্র্যাজেডি মানুষের অনুকরণ নয়, ঘটনা এবং জীবনের অনুকরণ। চরিত্র মানুষের গুণাবলির নির্ণায়ক, কিন্তু কার্যের জন্যই মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। ঘটনা ব্যতীত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়না, কিন্তু চরিত্র না থাকলেও ট্র্যাজেডি হতে পারে। পেরিপেটি এবং ডিসকভারি বৃত্তেরই অংশ। তাই বৃত্তই ট্র্যাজেডির আত্মা, চরিত্রের স্থান দ্বিতীয়।

রচনারীতি হল শব্দসমূহের মাত্রাগত বিন্যাস, অর্থাৎ শব্দের মধ্যে অর্থশক্তির প্রকাশ। সংগীতের স্থান অলংকরণ হিসাবে প্রধান। দৃশ্যসজ্জার আবেগগত আকর্ষণ থাকলেও এর শিল্পমূল্য কম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

এতে আছে প্লট বা বৃত্তের আদর্শ গঠন সম্পর্কে আলোচনা। বৃত্ত হবে সম্পূর্ণ ও সমগ্র — যার আদি-মধ্য ও অন্ত আছে। এর আয়তন এমন হবে যাতে সমগ্র বৃত্তটিকে দেখা যায়। অর্থাৎ বৃত্ত অত্যন্ত বড়ো বা অত্যন্ত ছোটো হবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

এই পরিচ্ছেদে বৃত্তের ঐক্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নায়ক-ঐক্য এবং বৃত্ত-ঐক্য এক নয়। বৃত্তের ঐক্য বলতে মূলত ঘটনা-ঐক্যকে বোঝায়। তা হবে একটি ঘটনারই অনুকরণ। এই ঘটনার এমনই এক সমগ্র রূপ থাকবে, যার অঙ্গের সংযোগ-সম্পর্ক হবে সুনির্দিষ্ট।

নবম পরিচ্ছেদ :

বৃত্তের বিষয়-প্রকার কেন্দ্রিক আলোচনা এখানে রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে ইতিহাস ও কাব্যের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। গদ্যে বা পদ্যে লেখার পার্থক্যে ঐতিহাসিক ও কবির পার্থক্য নয়। ঐতিহাসিক যা ঘটেছে তা বলেন এবং কবি বলেন যা ঘটতে পারে তা। কাব্য তাই ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিকতাময় এবং মহত্তর, কারণ কাব্য সামান্যকে প্রকাশ করে এবং ইতিহাস প্রকাশ করে বিশেষকে। ট্র্যাজেডির প্রচলিত বিষয়বস্তু পরম্পরাগত কাহিনির মধ্যেই রয়েছে। কবি যদি ঐতিহাসিক বিষয়ও নির্বাচন করেন তবু তিনি কবির মর্যাদা লাভ করবেন।

বৃত্তের মধ্যে এপিসোডিক বৃত্তকে অ্যারিস্টটল নিকৃষ্ট বলেছেন। এখানে কাহিনি সম্ভাব্য ও আবশ্যিক পারম্পর্যের শর্ত লঙ্ঘন করে। ঘটনাধারার কার্যকারণ অবলম্বনে দর্শক-চিত্তে ট্র্যাজিকবোধ উৎপন্ন হলে তাকে সর্বোৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি বলা যাবে।

দশম পরিচ্ছেদ :

বৃত্তের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা। সরলবৃত্ত হল যেখানে ঘটনা একক এবং ক্রমবিন্যস্ত। এতে বিপ্রতীপতা এবং উদ্‌ঘাটন থাকে না। জটিলবৃত্ত হল সেটি যেখানে

বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন নায়কের ভাগ্যপরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত থাকে। এই ব্যাপার দুটি বৃত্তের অন্তর্নিহিত গঠন থেকেই উৎসারিত হওয়া উচিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ :

এখানে রয়েছে কাহিনিবিন্যাসের তিনটি অংশের আলোচনা। বিপ্রতীপতা বলা হচ্ছে তাকেই যেখানে ঘটনাধারা থেকে যে ফল প্রত্যাশিত তার বিপরীত ফল পাওয়া যায়। এটি এক ধরনের পরিবর্তন। উদ্‌ঘাটনও এক ধরনের পরিবর্তন যা অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে পরিবর্তন। বিপ্রতীপতার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্‌ঘাটন প্রকাশিত হলে সেটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। বৃত্তের তৃতীয় অংশ হচ্ছে দুর্ভোগদৃশ্য, যেখানে মঞ্চের ওপর মৃত্যু-আঘাত ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ :

এখানে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির কতকগুলি উপবিভাগ বা সন্ধি অংশের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল — প্রোলোগ, এপিসোড, এক্‌সোড ও কোরাস গান। কোরাস প্যারোড ও স্টেসিমোন এই দুটি ভাগে বিভক্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ :

এতে আদর্শবৃত্তের কথা আলোচিত হয়েছে। জটিলবৃত্তই আদর্শ বৃত্ত। এর পরিণতিতে করুণা ও ভীতি জাগ্রত হয়। এই বৃত্তে অতি ভালো বা সৎ মানুষের মন্দ পরিণাম-চিত্র থাকবে না। এতে নৈতিক বোধ পীড়িত হবে। দুর্জন ব্যক্তির ভালো পরিণাম দেখানোও চলবে না। কারণ তা নীতির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। দুর্জন ব্যক্তির মন্দ পরিণামও দেখানো যাবে না। এতে করুণা ও ভীতি জাগ্রত হবে না। অ্যারিস্টটলের মতে মাঝামাঝি ধরনের চরিত্র আশ্রয় করে এই আদর্শবৃত্ত গড়ে উঠবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ :

এখানে বৃত্তে ঘটনার বিন্যাস এবং খাঁটি বৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ট্র্যাজেডিতে দৃশ্যসজ্জার সাহায্যে করুণা ও ভীতি জাগ্রত করা যেতে পারে, অভ্যন্তরীণ গঠন থেকেও তা জাগ্রত হতে পারে। প্রথমটি শৈল্পিক উপায়ের দিক থেকে নিকৃষ্ট এবং দ্বিতীয়টি শ্রেষ্ঠ। ট্র্যাজিক ঘটনা যখন এমন লোকের মধ্যে সংঘটিত হয় যারা পরস্পর প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ, তখনই তা সবচেয়ে বেদনাদায়ক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ :

এই পরিচ্ছেদে চরিত্রের আলোচনা স্থান পেয়েছে। চরিত্র চিত্রণের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এখানে করেছেন অ্যারিস্টটল। তাঁর মতে — চরিত্র ভালো হবে; চরিত্র ঔচিত্য অনুযায়ী অঙ্কন করতে হবে, চরিত্র হবে বাস্তবিক এবং চরিত্রের সংগতি থাকা দরকার। এছাড়াও চরিত্রকে সম্ভাব্য ও যুক্তিসম্মতভাবে অঙ্কন করতে হবে। চরিত্রটি বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ হিসাবে অঙ্কিত হবে না, হবে আদর্শায়িত।

চরিত্রের নৈতিক উদ্দেশ্য ভালো হলে চরিত্রটিও ভালো হবে। শৌর্যবীর্য পুরুষের গুণ, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তা দেখানো উচিত নয়। তাই চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে ঔচিত্য প্রয়োজন। সংগতি হল এমন জিনিস যা পূর্বাপর রক্ষা করতে হবে। অসংগতিপূর্ণ কোনো চরিত্র অনুকৃত হলে তাকে বরাবর অসংগতিপূর্ণ করেই অঙ্কন করতে হবে। বৃত্তের গঠনের মতো চরিত্রাঙ্কনেও কবিকে সর্বদা সম্ভাব্যের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ :

এখানে উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্ক্রিয়া এবং এর প্রকারভেদ আলোচিত হয়েছে। উদ্‌ঘাটনের প্রকারভেদের মধ্যে রয়েছে ঃ- প্রথমত, কোনো চিহ্নের সাহায্যে, যেমন— জন্মগত চিহ্ন বা ক্ষতচিহ্ন বা বাহ্যবস্তু। অ্যারিস্টটলের মতে এটি প্রশংসনীয় নয়। খেয়ালখুশি মতো কবিরা উদ্‌ঘাটনের যে চিহ্ন উদ্ভাবন করেন তার শিল্পমূল্য নেই। এটিও হেয় রীতি। উদ্‌ঘাটনের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রকারগুলি হল যথাক্রমে স্মৃতিনির্ভর, যুক্তি-বিচারনির্ভর এবং অযৌক্তিক মিথ্যা অনুমাননির্ভর উদ্‌ঘাটন। অ্যারিস্টটলের মতে সর্বোৎকৃষ্ট উদ্‌ঘাটন হচ্ছে যা ঘটনার নিজস্ব ধারা থেকেই জন্মলাভ করে এবং যেখানে চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ :

এতে ট্র্যাজেডির দুটি পর্ব এবং ট্র্যাজেডির চারটি শ্রেণির কথা বলা হয়েছে। ট্র্যাজেডির দুটি পর্ব থাকে--- গ্রন্থিবন্ধন ও গ্রন্থিমোচন। গ্রন্থিবন্ধন ঘটনার আরম্ভ থেকে পরিণতির শুরু পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। গ্রন্থিমোচন হল সেই পরিবর্তনের শুরু থেকে উপসংহার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ঘটনা। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির চারটি শ্রেণি নির্দেশ করেছেন— জটিল ট্র্যাজেডি, করুণ ট্র্যাজেডি, নৈতিক ট্র্যাজেডি এবং সরল ট্র্যাজেডি। জটিল ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণভাবে বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটনের ওপর নির্ভরশীল। যন্ত্রণার ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য হৃদয়াবেগের জাগরণ। নৈতিক ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য নীতি প্রচার এবং সরল ট্র্যাজেডিতে বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন থাকে না, ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটে চলে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ :

এই পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডি বা নাটকের অভিপ্রায় এবং রচনারীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল অলংকারশাস্ত্রের বিষয়। রচনারীতিতে যা সৃষ্টি হয় তা অভিপ্রায়েরই অন্তর্গত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ :

মহাকাব্য বিষয়ক আলোচনা এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। মহাকাব্যের রীতি বর্ণনাত্মক। এটি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লেখা। ট্র্যাজেডির সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে এর সাদৃশ্য আছে।

মহাকাব্যের কাহিনির গঠন ট্র্যাজেডির অনুরূপ। একটিমাত্র সমগ্র ও সম্পূর্ণ এবং আদি, মধ্য, অন্তযুক্ত ঘটনাকে ভিত্তি করে এটি লিখিত হবে। ঐতিহাসিক রচনা থেকে এর

গঠন আলাদা। ইতিহাস একটি যুগকে রূপদান করে, এর ঘটনাগুলির মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের যোগ কম থাকে। মহাকাব্যের ছন্দ একটিই হবে এবং ঘটনাগত ঐক্য থাকবে নাটকেরই অনুরূপ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ :

এই পরিচ্ছেদে আছে মহাকাব্যের প্রকার, এর ছন্দ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনা। ট্র্যাজেডির অনুরূপ মহাকাব্যেরও চারটি শ্রেণি। এপিকে বিপ্রতীপতা উদ্‌ঘাটন ও দুর্ভোগ-চিত্র থাকে। এপিকে অভিপ্রায় ও রচনারীতি উন্নত ও শিল্পসম্মত হওয়া উচিত। এই সমস্ত বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মতে হোমারই আদর্শ কবি। ট্র্যাজেডির সঙ্গে এপিকের পার্থক্য গঠন, আয়তন এবং ছন্দের ক্ষেত্রে। মহাকাব্যের ছন্দ হিসাবে হিরোয়িক ছন্দ উন্নত ও স্থাপত্যধর্মী। অপ্রচলিত শব্দ ও রূপকাদি এতে সহজেই স্থান পায়। মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক স্বভাব হোমার সুন্দরভাবে বজায় রেখেছেন। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য জিনিসের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছদ :

এপিক ও ট্র্যাজেডির তুলনা এই অধ্যায়ের অন্তর্গত। মহাকাব্যের আবেদন শিক্ষিত শ্রোতার কাছে। এর মার্জিত কলা উন্নততর। ট্র্যাজেডির আবেদন অবশিষ্ট জনসাধারণের কাছে। এই যুক্তিতে ট্র্যাজেডির তুলনায় মহাকাব্য উন্নত ও শ্রেষ্ঠ শিল্প। কিন্তু অ্যারিস্টটল এই যুক্তি অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডির নিন্দার লক্ষ্য কাব্যকলা নয়, অভিনয়কলা। অঙ্গভঙ্গির আতিশয্য মহাকাব্য-আবৃত্তিতেও ঘটতে পারে। আর ট্র্যাজেডি অভিনয় ব্যতীতও রসসৃষ্টিতে সক্ষম। তাঁর মতে ট্র্যাজেডিই মহাকাব্যের তুলনায় উন্নত সৃষ্টি। কারণ ট্র্যাজেডিতে মহাকাব্যের সমস্ত উপাদান উপস্থিত। মহাকাব্যের ছন্দ ট্র্যাজেডিতে ব্যবহৃত হতে পারে। সংগীত ও দৃশ্য ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে প্রযুক্ত। এদুটি তীব্র আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া স্বল্প পরিসরে ট্র্যাজেডি উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ করতে পারে। কিন্তু মহাকাব্যে বহুকাল-ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করা আনন্দ তার তীব্রতা হারায়। কাহিনিগত ঐক্যরক্ষার দিক থেকেও বৃহদায়তন মহাকাব্যের তুলনায় স্বল্পায়তন ট্র্যাজেডির সুবিধা বেশি। এই সমস্ত মানদণ্ডে ট্র্যাজেডির মাধ্যমে যদি বিশেষ জাতীয় আনন্দ লাভ করা যায় তাহলে ট্র্যাজেডি যে উন্নততর কলাসৃষ্টি, তা অবশ্য স্বীকার্য।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য যে আমাদের প্রস্তাবিত পাঠক্রম অনুযায়ী এই সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত হয়েছে। 'পোয়েটিকস্'-ধৃত ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য সম্পর্কিত প্রসঙ্গদ্বয়েই আমাদের পাঠক্রম সীমাবদ্ধ। তাই আমরা এই পর্বে ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যের সঙ্গে যুক্ত পরিচ্ছেদসমূহের আলোচনাই উপস্থাপিত করেছি। সপ্তদশ, বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ এবং পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার এবং আলোচনা পাঠক্রমভুক্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার মানদণ্ডে এবং বাহুল্যবোধে বর্জিত হয়েছে।

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) ট্র্যাজেডির শ্রেণিবিভাগ পর্যালোচনা করুন। প্রসঙ্গত কোন্ শ্রেণির ট্র্যাজেডিকে অ্যারিস্টটল কেন শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন তা বুঝিয়ে লিখুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অভিমতের যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৬.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবারে আসুন আলোচিত বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ গ্রহণ করা যাক।

ট্র্যাজেডির শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির চারটি শ্রেণি নির্ধারণ করেছেন। এগুলি হল জটিল ট্র্যাজেডি, করুণ ট্র্যাজেডি, নৈতিক ট্র্যাজেডি এবং সরল ট্র্যাজেডি। অ্যারিস্টটলের মতে জটিল ট্র্যাজেডিই ট্র্যাজেডির চারটি শ্রেণির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটনের দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায়। পেরিপেটি ও ডিসকভারি এই ট্র্যাজেডির কাহিনিবৃত্তের ভাবকে এক নতুন মর্যাদা দান করে। করুণ ট্র্যাজেডিতে কারুণ্যের মাত্রাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এই শ্রেণিটিকে অনেকে অস্বীকার করেছেন। নৈতিক ট্র্যাজেডিতে কোনো একটি চরিত্রকে আশ্রয় করে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির প্রতি নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে। সরল ট্র্যাজেডিতে বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটন অনুপস্থিত থাকে, ঘটনাবিন্যাসেও সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতার সূত্র রক্ষিত হয় না।

উদ্‌ঘাটনের প্রকারভেদের আলোচনায় দেখা গেল যে অ্যারিস্টটলের মতে নাটকের বৃত্ত গঠনে বিপ্রতীপতা ও উদ্‌ঘাটনের গুরুত্ব যথেষ্ট। উদ্‌ঘাটন অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্রতীপতার সঙ্গে অন্বিত থাকে। উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এটি হল অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের অবস্থা প্রাপ্তি।

অ্যারিস্টটল উদ্‌ঘাটনের বিভিন্ন বাহ্যিক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কিছু যান্ত্রিক প্রকৃতির লক্ষণ ও চিহ্নের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই চিহ্নগুলি শিল্পমূল্যে অনুন্নত। চরিত্রের নিজের মুখে আত্মপরিচয় প্রকাশমূলক উদ্‌ঘাটনকেও অ্যারিস্টটল নিম্নস্তরের বলে উল্লেখ করেছেন। উদ্‌ঘাটনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার হিসাবে অ্যারিস্টটল যথাক্রমে স্মৃতিনির্ভর, যুক্তিনির্ভর এবং অনুমাননির্ভর উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঘটনার নিজস্ব ধারা থেকে উদ্ভূত স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট উদ্‌ঘাটনই অ্যারিস্টটলের মতে শ্রেষ্ঠ।

অনিবার্যতা ও সম্ভাব্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল অ্যারিস্টটল 'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই দুটি পরিভাষার উল্লেখ করেছেন। অনিবার্যতাকে অ্যারিস্টটল কাব্যের সামান্য সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। অনিবার্যতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে নাটকে বর্ণিত ঘটনা, অবস্থা ও চরিত্রের নৈতিক গুণ এবং চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। আকস্মিকতার কোনো স্থান এতে নেই। অনিবার্যতা বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে দর্শকের মনে সম্ভাব্যতার বোধ সঞ্চার করে। অনিবার্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েই সম্ভাব্যতা বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপিত করে।

অধ্যায়-ধৃত প্রসঙ্গসমূহের শেষ পর্যায়ে আমরা অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'-এর পরিচ্ছেদভিত্তিক সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেছি। আমাদের পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতিসূত্র রক্ষা করে এই আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৬.৭ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

ইস্কাইলাস :

তাঁর জীবৎকালের ব্যাপ্তি ৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ইনি গ্রিসের প্রধান তিনজন ট্র্যাজেডি রচয়িতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁর রচনার মধ্যে মাত্র সাতটি নাটক পাওয়া গেছে।

৬.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। অ্যারিস্টটল সব শিল্পকেই অনুকরণ বলেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যশিল্পে অনুকরণ প্রকৃতির প্রতিরূপ সৃষ্টি কিনা অথবা অন্যকিছু তা তাঁর উক্তির আলোকে প্রতিপন্ন করুন।

২। অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডিতে প্লটই মুখ্য, চরিত্র অপেক্ষাকৃত গৌণ। এই মতের সপক্ষে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৩। ট্র্যাজেডি কী বুঝিয়ে দিন এবং ট্র্যাজেডিতে ক্যাথারসিসের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। নিজের পরিচিত একটি এপিককে অবলম্বন করে অ্যারিস্টটল-বর্ণিত এপিকের বিশেষত্বগুলি বুঝিয়ে দিন।

৫। অ্যারিস্টটলের অনুসরণে ট্র্যাজেডির ষড়ঙ্গের পরিচয় দিন ও তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করুন।

৬। কাব্য-নাট্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য সম্ভব অপেক্ষা বিশ্বাস্য অসম্ভবপরতার মূল্য বেশি।' ---উক্তিটি বিশ্লেষণ করে অ্যারিস্টটলের মতের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৭। ট্র্যাজেডির ছয়টি অঙ্গের আলোচনাকালে অ্যারিস্টটল প্লট বা কাহিনিবৃত্তের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্লটকে ট্র্যাজেডির আত্মা বললেও চরিত্র-সৃষ্টির ভূমিকা তিনি কখনো লঘু করে দেখেননি। এই অভিমত কতদূর গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।

৮। অ্যারিস্টটলের অনুসরণে ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করুন। অ্যারিস্টটল কোন্‌টিকে কেন উন্নততর বলেছেন, বুঝিয়ে দিন।

৯। ইতিহাসের সত্যের চেয়ে কাব্যের সত্য অধিকতর দার্শনিক গুরুত্বপূর্ণ। — অ্যারিস্টটলের এই উক্তি নিজের মন্তব্যসহ ব্যাখ্যা করুন।

১০। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞার আলোকে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন এবং ট্র্যাজেডি কেন আমাদের আনন্দ দেয় এবিষয়ে বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রীর বক্তব্য আলোচনা করুন।

৬.৯ প্রসঙ্গ পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব : সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

২। কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল : শিশিরকুমার দাশ।

৩। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ : ভবানীগোপাল সান্যাল।

৪। নাটকের কথা : ড. অজিতকুমার ঘোষ।

৫। অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৬। কাব্যতত্ত্ব-বিচার : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৭। সাহিত্য-তত্ত্বের কথা' : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৮। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ।

* * *

বিভাগ-৭
সাহিত্যের পথে
সাহিত্যের পথে : নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা -১

বিষয়বিন্যাস

৭.০ ভূমিকা (Introduction)
৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৭.২ নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা
৭.২.১ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি
৭.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৭.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৭.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ আশ্বিন মাসে। এতে যে প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি রচনার পিছনে একটি বেদনার ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন বিখ্যাত এক সাময়িক পত্র 'প্রবাসী'-তে। সেখানে বলা হয়েছিল — "রবীন্দ্র-সাহিত্য সার্বজনীন নহে"... ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি এর উত্তর দেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রবন্ধে তার উত্তর তিনি দিয়েছেন, এই প্রবন্ধগুলি এবং কবির কিছু ভাষণ নিয়েই রচিত 'সাহিত্যের পথে'।

তবে এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ হল সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-বিচার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন অভিমত। এই রচনাগুলির পিছনে দুটি উদ্দীপনা কাজ করেছে — একদা একটি ছাত্র কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন— "Is art too good for human nature's daily food ?" অপর উদ্দীপনা সম্পর্কে কবি বলেছেন — "... অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে বাল্যকাল থেকেই হাতে-কলমে সাহিত্য নিয়েই আছি। ... নিরন্তর সাহিত্য প্রবাহ বয়ে বয়ে আমার অন্তর প্রকৃতির মধ্যে যে পথ তৈরি হয়েছে সেই পথ দিয়ে আজকার দিনের আলোচনা হয়তো একটা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করতেও পারে।..."

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি কবি বন্ধুবর শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একখানি পত্র বিশেষ। এই গ্রন্থে প্রবেশ করার মূল চাবি হল এই পত্রটি। এই ভূমিকা স্বরূপ পত্রখানিতে রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্যের রহস্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতি মুহূর্তে এই জগৎকে নব-নব রূপে আমরা যে জানছি সেই জানা দু-ধরনের— জ্ঞানের দ্বারা ও ভাবের দ্বারা। জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় বিষয়কে। বিষয়ই যেখানে মূল লক্ষ্য এবং জ্ঞাতা উপলক্ষ মাত্র। এই ক্ষেত্র বিজ্ঞানের। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কেবল বিষয়ের উপাদানকে বিশ্লেষণ করাই তার কাজ, কোনো আবেগের স্থান তাতে নেই।

কিন্তু ভাবের জানার দ্বারা আসলে আমরা নিজেকেই জানি। এখানে বিষয় উপলক্ষ মাত্র। এই ক্ষেত্র সাহিত্যের ক্ষেত্র। যে কোনো বিষয়কে উপলক্ষমাত্র করে আমাদের আত্ম পরিচয় ঘটে।

বিজ্ঞানের সত্যতা যুক্তি-প্রমাণ নির্ভরশীল; কিন্তু সাহিত্যের সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে। তার মধ্যে যথার্থতা না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের উপলব্ধিতে সে-ই একান্ত সত্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপলব্ধির নিবিড়তাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। কেন-না মানুষের অন্তর কল্পনার ঐশ্বর্যে ভরপুর। তাই এই কল্পনার প্রেরণাতেই সৃষ্টি রূপকথার। বৈচিত্র্যের লীলাই সাহিত্যের কাজ, সে লীলায় সুন্দর অসুন্দর উভয়ই থাকতে পারে। সাহিত্য কেবল সৌন্দর্যই রচনা করে না। আসলে যা আনন্দদায়ক সাহিত্যে তাকেই সুন্দর বলা হয়। বাস্তব জগতের সৌন্দর্যের সঙ্গে সাহিত্যের সৌন্দর্য মেলে না। বাস্তব জগতে যে দুঃখ মানুষকে পীড়া দেয়, সেই দুঃখকে মানুষ দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সাহিত্যের জগতে গভীর দুঃখ ট্র্যাজেডিরূপে দেখা দেয়, এই ট্র্যাজেডিতেই মানুষ খুঁজে পায় ভূমার আনন্দ। আসলে সাহিত্যে মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। সাহিত্য-লীলার জগৎ অর্থাৎ আনন্দের ক্ষেত্র, জগত স্রষ্টার মতো মানুষও লীলাময়, সাহিত্যে ও আর্টে তার এই লীলা প্রকাশিত হয়, তার আনন্দ রসে-রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে।

বাস্তব সত্য এবং সাহিত্যের সত্যে পার্থক্য আছে। সাহিত্যের সত্য হল মানুষ যাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে, যাকে পেয়ে সে আনন্দিত হয়। তর্কের দ্বারা, প্রমাণের দ্বারা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, কেন-না এই সত্য একান্ত উপলব্ধির দ্বারা প্রাপ্ত। সে সুন্দর বা অসুন্দর যাই হোক না কেন, সে মনোরম, সে রসস্বরূপ। অনুভূতির বাইরে এই রসের সত্যতা নেই।

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হল 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধটির উৎসর্গ পত্রটি, যা কবি তাঁর বন্ধুবর অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন। এই আলোচনা থেকে আপনারা জানতে পারবেন —

- বিশ্বজগৎকে জানবার দুটি প্রক্রিয়া — জ্ঞান ও ভাব।
- জ্ঞানের জানা ও ভাবের জানা তথা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের জানার পার্থক্য।
- বাস্তব এবং সাহিত্যে সুন্দর ও অসুন্দর।

- বাস্তব সত্য এবং সাহিত্যের সত্য।
- সাহিত্যে মানুষের অনুভব বা উপলব্ধির প্রকাশ।

আসুন, আমরা এবারে মূল আলোচনায় অগ্রসর হই।

৭.২ নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা

এবার আমরা 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র তথা বন্ধুবর শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৭.২.১ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নব নব রূপে অভিনব সৃষ্টিতে ধরা দিয়েছেন। তাঁর বিচিত্রমুখী প্রতিভার একটি বিশেষ দিক হল সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন আলোচনা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থে পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়। এর মধ্যে 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' এবং 'সাহিত্যর স্বরূপ' — এই তিনটি গ্রন্থই প্রধান। অবশ্য অন্যান্য গ্রন্থে ও প্রবন্ধেও প্রাসঙ্গিকভাবে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আলোচনা রয়েছে। তবে এই তিনটি গ্রন্থ বিশুদ্ধভাবেই সাহিত্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত আলোচনা।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, এই গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রখানি কবিবন্ধুবর অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির একখানি চিঠি। এই চিঠিটিই 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটির নির্যাস-স্বরূপ।

চিঠিতেই তিনি সাহিত্যতত্ত্ব-সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ও অভিনব ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন।

প্রাচীনকাল থেকে এযাবৎ সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত আলংকারিক ও রসিক সমালোচক আলোচনা করেছেন। আচার্য ভরতমুনিই প্রথম বাণীমন্দিরে সাহিত্যরসের প্রদীপখানি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তা থেকে লক্ষ প্রদীপমালায় অগ্নি সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ইন্ধনকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে দীপালোকবর্ত্তিকায় দীপাবলি সাজালেন তা অভিনব এবং একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব মনোলোকের আলোক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কেবল ব্রহ্মস্বাদস্বরূপ আস্বাদন মাত্র নয়। তাঁর ভাষায় সাহিত্য হল মিলন — এই মিলন বিশ্বজগতের সঙ্গে বিশ্বজীবনের, বিশ্বমানবের। সাহিত্যের তাৎপর্য হল নৈকট্য বা সম্মিলন। সাহিত্যের অর্থ হল যোগ ঘটানো এবং এই যোগসাধনই হল শেষ কথা। এই মিলনাকাঙ্ক্ষার অর্থ হল অবরোধের মধ্য হতে মনকে মুক্ত করা। সাহিত্যে

এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে। — " মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।"

যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু সাহিত্য মিলিত করে পরস্পরের হৃদয়কে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় কেবল রস নয়, রস যাকে অধিকার করে নিষ্পন্ন হয় সেই মানুষ এবং মানুষের হৃদয়েরও খাসদখল।

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যেমন গভীর, তেমনই মৌলিক। সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মগত কথাই হল বহুবিচিত্র বিরোধর মধ্যে ঐক্য। রবীন্দ্র-দর্শনে ভারতীয় সংস্কৃতির এই মূল সুরটি প্রচ্ছন্ন ছিল, তারই আলোকে তাঁর সাহিত্যচিন্তাও বিশেষভাবে আলোকিত।

আমাদের আলঙ্কারিকেরা শব্দ ও অর্থের মিলনকেই সাহিত্য বা কাব্য বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুনভাবে সেই মিলনের ব্যাখ্যা করেছেন যার সঙ্গে পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকদের ব্যাখ্যার কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মিলনকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে দেখেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যের মিলনের পশ্চাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, তা মেলার জন্যই মেলা যাতে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়। তিনি বিশাল বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলন ইচ্ছার প্রকাশকেই বলেছেন সাহিত্য।

বাঁচার ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের ভিতরে আছে আর একটি ক্ষুধা এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই হল বাইরের জগতের সঙ্গে মেলার ইচ্ছা। এখানে সে বাইরের জিনিসকে সমগ্রভাবে হৃদয় ও আত্মার মধ্যে গ্রহণ করতে চায়।

বহুর মধ্যে এককে দেখা এবং এককে অসীম বৈচিত্র্যে দেখা মিস্টিক সাধকদের কাজ। আমার উপনিষদে আছে আমাদের ভিতরের আত্মাই এক এবং অবিভাজ্য এবং তাই সত্য। বাইরে জড় বা চেতন দিয়ে আমরা যা দেখি তা প্রতীয়মান সত্য, এবং ভিতরের সত্য আত্মারই বাহ্যরূপ। বাইরের এই প্রতীয়মান বস্তুকে ভিতরে আনার চেষ্টাই হল ওই আত্মার ঐক্যকে উপলব্ধি। এই মিস্টিক ভাবনা ও উপনিষদ ভাবনার সংস্কারবশত রবীন্দ্রনাথও বারবার ওই বাইরের সঙ্গে আমাদের আত্মার মিলন কামনার কথা বলেছেন। বিশ্বকে অখণ্ডরূপে জীবন্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ করে উপলব্ধির মধ্যেই শিল্প আনন্দের সন্ধান পাব।

রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বের সঙ্গে আত্মার মিলনের কাজটি সম্পূর্ণ হয় কল্পনাশক্তির সহায়তায়। যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক, কল্পনার দ্বারাই সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়ে একাত্মতা সম্ভব হয়। যা মনের জিনিস নয়, মন তাতে প্রবেশ করে তাকে মনোময় করে তোলে। এটি মানুষের একধরনের লীলা এবং এই লীলায় আছে আনন্দ।

আবার তাঁর মতে এই মিলন প্রয়োজন নিরপেক্ষ। সাহিত্যের জগৎ তাঁর মতে অপ্রয়োজনের জগৎ। শিল্পীর অন্তরে যখন সৃষ্টির নেশা জাগে তখন কেবল সৃষ্টিকর্মই তাঁর লক্ষ্য হয়, অন্য কিছু নয়। এর মধ্যে রয়েছে উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য।

এই মিলন-সূত্রটি ব্যতীত সাহিত্য-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি।

এই উৎসর্গ পত্রটিই গ্রন্থটির ভূমিকা-স্বরূপ। এখানে রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্যের রহস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত অধ্যাত্মরসের অনুভূতিপ্রবণ কবি। কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের নানা আলোচনায় তিনি বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং সাহিত্যের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্যকে দেখিয়েছেন।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে বহু বিষয়েই পার্থক্য আছে, তার মধ্যে প্রথম পার্থক্যটি হল উপাদানগত পার্থক্য।

এই বিশ্বকে নিয়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েরই কারবার। কিন্তু বিশ্বের উপাদানকে গ্রহণ করার বা দেখার দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ের ক্ষেত্রে পৃথক।

মন দিয়ে এই বিশ্বজগৎকে আমরা দুইভাবে জানতে পারি — জ্ঞানে এবং ভাবে।

জ্ঞানের জানা হল বিজ্ঞানের আর ভাবের জানা হল সাহিত্যের।

বিজ্ঞানের কাজ বিষয়কে জানা, জ্ঞানের মাধ্যমে সেই বিষয়কেই জানা যায়। সেখানে জ্ঞায়ের প্রকাশই বড় কথা, জ্ঞাতা থাকেন নেপথ্যে, বিজ্ঞান যখন একটি বস্তুকে আবিষ্কার করে তখন আবিষ্কৃত সেই বস্তুটিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু জ্ঞাত বিষয় থেকে জ্ঞাতা নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সত্য হল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। জ্ঞাতা জ্ঞেয় বিষয়কে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করেন, এবং অংশের সঙ্গে সমগ্রকে মিলিয়ে নেন। আজকের জ্ঞাত বিষয় পরবর্তীকালে প্রমাণের দ্বারা সংশোধিত বা পরিবর্তিত হতে পারে। জ্ঞানের কথা প্রথমবার প্রচারের দ্বারাই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতার এক ধরনের মানসিক নির্লিপ্তি দেখা যায়।

কিন্তু ভাবে জানা যায় আপনাকেই। সেখানে বিষয়টি উপলক্ষ মাত্র, বিষয়ীর উপলব্ধিই প্রধান। সাহিত্যে মানুষের আপনার উপলব্ধিকেই প্রাধান্য দেয়।

বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর প্রতিই বিজ্ঞানের কৌতূহল এবং বিজ্ঞান বিষয়ের যাথার্থ্যকে যাচাই করে।

কিন্তু সাহিত্যে বিষয়ের যাথার্থ্য নয়, তার সত্য থাকে আপন উপলব্ধিতে। সাহিত্যিকের অনুভূতিশীল মন বিশ্বের সমগ্র বস্তুর মধ্যে যেগুলিকে সত্য বলে অনুভব করে কেবল তাকেই গ্রহণ করে।

বিশ্বের সমস্ত অজানাকে জানার চেষ্টা বিজ্ঞানের। তাই বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার। কিন্তু ভাবলোকের জানা বলে —

"জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপতি ভেল।
.....

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ

তব হিয়া জুড়ন ন গেল।।"

তাই ভাবলোকের যে-কোনো সত্যই "তিল তিলে নূতন হোয়।"

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সত্যে আছে মূলগত প্রভেদ, প্রচলিত অর্থে বাস্তব বলতে আমরা বুঝি যে, যা কিছু ঘটে গেছে, ঘটেছে, বা যা কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান। এই বাস্তব নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার। সাহিত্যের বাস্তব এটি নয়। সাহিত্যের বাস্তব হল সত্য। আর বিজ্ঞানের বাস্তব হল তথ্য। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "আমাদের মন যে -জ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করে, সেটা দুইমুখে পদার্থ। তার একটা দিক হল তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে, সেই হচ্ছে 'সত্য'।" আসলে মানুষ তার সত্যকে তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করে।

বস্তুজগতের বস্তুর প্রতি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞান বহির্বিশ্বের বস্তুটি যেমনভাবে আছে সেভাবেই দেখে। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা নির্বাচন সে করে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানী নিজের কোনো ভালোলাগা-মন্দলাগার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বস্তুটিকে দেখেন না। তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টি নৈর্ব্যক্তিক। অপরপক্ষে সাহিত্যিক বস্তুটিকে বাছাই করে মনোলোকে প্রবেশ করান, এবং তার সঙ্গে নিজের সৃজনশীল কল্পনা বা প্রতিভার সংযোগ ঘটিয়ে তাকে সৃষ্টি করেন। তখন মন-কর্তৃক গৃহীত সত্যটির সঙ্গে সাহিত্যিক একাত্ম হয়ে যান। তাই সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে। তাই সাহিত্যের সত্যতা মানুষের উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। বিষয় অদ্ভুত, অতথ্য হলেও উপলব্ধি যদি গভীর হয়, তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে গ্রহণ করা হয়।

মানুষের মনে আছে কল্পনার ঐশ্বর্য, যার প্রেরণায় যে নিজের সত্তাকে বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে। শিশুকাল থেকে তার এই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিয়েছে রূপকথা। এই বৈচিত্র্যের লীলাই সাহিত্যের ধর্ম তা নয় — বস্তুর রূপ নয়, স্বরূপের পরিচয় গ্রহণ করাই তার লক্ষ্য।

সাহিত্যে আছে উপলব্ধির আনন্দ। মানুষ অনুভূতির গভীরতার দ্বারা যতখানি বাহিরকে অন্তরে আত্মস্থ করে নেয়, ততই তার আনন্দের সীমা বাড়তে থাকে।

সাহিত্যের বাইরে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সঙ্কুচিত, নানা প্রয়োজনের দায়ে বদ্ধ। তাই যা কিছু অনিষ্টকর তা মানুষকে আনন্দ দেয় না। কিন্তু সাহিত্যের জগৎ এই প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে — তাই ভালো-মন্দ-সুন্দর-অসুন্দর-সকলই স্থান পায় সাহিত্যে এবং সে সকলই আমাদের আনন্দ দান করে। কেন-না সাহিত্যের অনুভূতি হল আত্মিক আনন্দের উপলব্ধি। এমনকি লৌকিক দুঃখও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনন্দের অনুভূতিতে পরিণত হয়।

রস অনুভূতি সাপেক্ষ। বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ রসে প্রকাশিত হয় যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হয়। অর্থাৎ রসের যোগে আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই আনন্দ।

সাহিত্যে জীবনের মর্মসত্য ব্যক্ত হয়। কেন-না সাহিত্য প্রকাশধর্মী। তাই প্রকাশই সাহিত্যের বড় কথা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। সাহিত্যে মানুষ আপনাকে উপলব্ধি করে, আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই জানাই সত্য, যার নিবিড় উপলব্ধি সৌন্দর্যের পরিচায়ক।

যতক্ষণ আমরা সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ আত্মপ্রকাশ ঘটে না। নিবিড় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে যখন সকল সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, মানুষ তখনই বিশ্বভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সাহিত্যের বোধ যেমন প্রাত্যাহিক বোধের চেয়ে পৃথক, সাহিত্যের প্রকাশ যেমন পৃথক, তেমনি সাহিত্যের সৌন্দর্যকেই প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা যায় না। একটি নিশ্চিত ধারণা রয়েছে যে, সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের কাজ। রবীন্দ্রনাথও এই মতেই বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনিও অনুভব করেছেন যে, এ সাধারণ মতের সঙ্গে সাহিত্য বা আর্টের অভিজ্ঞতা মেলে না। ভাঁড়ু দত্ত সুন্দর নয়, অথচ চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ু দত্ত সাহিত্যের জগতে এক চিরকালীন আসন অধিকার করে আছে।

সাহিত্যের জগতে যা আমাদের আনন্দ দেয়, মন তাকেই সুন্দর বলে, তাই তা হয়ে ওঠে সাহিত্যের সামগ্রী। এই সুন্দর প্রমাণিত হয় একমাত্র নিবিড় বোধের দ্বারা।

মন যদি শোকে-দুঃখে আলোড়িত হয়, তবে সেই মন কাব্যে আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয়, তখনই তা সাহিত্যে বিশুদ্ধ আনন্দের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রেই দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। অনিষ্টের আশঙ্কা যদি না থাকে, তবে দুঃখও সুন্দর, কেন-না তা অস্মিতা-সূচক। কারণ দুঃখই আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করে।

বাস্তব জগতে মানুষ দুঃখ-ভয়-বিপদকে বর্জন করতে চায়, কেন-না এগুলিকে সে অনিষ্টকর বলেই জ্ঞান করে। অথচ বিরহ যেমন মিলনকেই নিবিড় করে তোলে, তেমনি দুঃখ-বিপদের বেদনাই মানুষের আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল করে তোলে — এর মুখোমুখি না দাঁড়ালে মানুষ নিজেকেও সম্পূর্ণ জানতে পারে না। সাহিত্যে-আর্টে মানুষ এই সম্পূর্ণ জানাটুকুকেই উপভোগ করে।

বাস্তব জগতে শোক-দুঃখ ভোগের বলেই তা অনিষ্টকর, তাই মানুষ তাকে বর্জন করতে চায়। কিন্তু সাহিত্যের জগতে এই শোক-দুঃখই উপভোগের — তা নিবিড় উপলব্ধির। সেজন্যই তা আস্বাদনীয়, কেন-না তার মধ্যেই মানুষ নিজেকে নিবিড়ভাবে পায়, সত্য করে পায়। সেজন্যই গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে — সে ভূমাই—"ভূমৈব যুখম্"।

বাস্তব জীবনে আনন্দ বা দুঃখ বিষয়-নির্ভর। বাহ্য ঘটনার দ্বারা সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সাহিত্যে যে চেতনা মনে জাগে তা মানুষের মনের অন্তর্নিহিত স্থায়ী ভাবকে

জাগায় ও রস-সম্ভোগের কারণ হয়। তাই রস বা কাব্যের আনন্দ বাহ্য ঘটনা-নিরপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের মতে বদ্ধ জল যেমন বোবা তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের অভ্যাসের পুনরাবৃত্তিতে চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দুঃখে বিপদে অপ্রকাশের জড়ত্ব কাটিয়ে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করে। এই আত্ম-সাক্ষাৎকার আনন্দের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মতে এই আনন্দ হল সৌন্দর্য। কীট্‌স্-এর বাণী — 'Truth is beauty, beauty truth'- এর উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, সত্যকে আমরা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করি, তাই সে সুন্দর। তাতেই আমরা নিজেকে পাই, তাই সে আনন্দদায়ক।

যাজ্ঞবল্ক্যের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, যে জিনিস আমাদের প্রিয় তার মধ্যে আমরা নিজেকেই সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তা সুন্দর। তাই এই সত্য সুন্দর। সাহিত্যে এই উপলব্ধির ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। সুতরাং সাহিত্য হল লীলার জগৎ, অর্থাৎ আনন্দের ক্ষেত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের সত্য নির্বাচিত। এই সত্য সার্থক ও পূর্ণতার পরিচায়ক। এই সার্থক সত্য হল মন যেখানে নিশ্চিত ধ্যানে দেখে, যাকে চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে গ্রহণ করে। যে অসুন্দর হলেও মনোরম। আসলে সৌন্দর্যের দুটি দিক — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও মনোহারিতা। জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হল আপাতভাবে তৃপ্তিকর। কিন্তু মনোহরকে সাধনার মাধ্যমে বেদনার বিনিময়ে লাভ করা যায়। কেন-না এতে থাকে মনের দান, চৈতন্যর প্রকাশ। বেদনার মাধ্যমেই জাগে এই চৈতন্য, দুঃখ সাধনার মাধ্যমেই পরমকে লাভ করা যায়।

আসলে সাহিত্যে বিষয় উপলক্ষ মাত্র, মূললক্ষ্য হল ভাবের প্রকাশ। তাই সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ আপনাকে উপলব্ধি করে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মূলগত প্রভেদ এখানেই। বিজ্ঞানে বস্তু বা জ্ঞেয়ই আসল লক্ষ্য এবং এই জ্ঞেয় জ্ঞাতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু সাহিত্যে তা অসম্ভব। সাহিত্যের মূল কথা হল —

"আমারই চেতনার রঙে
পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।"

কেন-না, সাহিত্যের বিষয় তার বিশিষ্টতা নিয়ে, তার সমগ্রতা নিয়ে প্রকাশিত।

জগতে ভালো-মন্দ-সুন্দর-অসুন্দর-সকলই আছে। উপলব্ধির গুণেই সে সত্য হয় — তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, তথ্য প্রমাণের দ্বারা যে সত্যকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে তার থেকে এই সত্য পৃথক। সাহি ত্যের এই সত্যের উপলব্ধি মানুষের মনে আনন্দ জাগায়, সেই আনন্দই তার শেষ কথা। আসলে কাব্যের আনন্দ হল রসের আনন্দ এবং সেই রস ও সৌন্দর্য কোনো পৃথক বস্তু নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।"

তবে উপলব্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূল্যভেদকে স্বীকার করেছেন। কেন-না সকল উপলব্ধিকেই নির্বিচারে এই মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা যায় না। সাহিত্য বিজ্ঞান নয়, তাই সাহিত্যে আছে মূল্যভেদ। বিজ্ঞান গঙ্গাকে একটি জলধারা বলেই জানে এবং বিশ্বের জলধারার সঙ্গে মূলগতভাবে গঙ্গার জলধারার মিল দেখতে পায়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই গঙ্গাই হয়ে ওঠে "পতিতোদ্ধারিণী মা" — সামান্য জলধারার সঙ্গে তার দুস্তর এক পার্থক্য এই অনুভূতির যোগেই সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে— "মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়।" অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বস্তুর মূল্যায়ন হয় সাধারণভাবে, কোনো বিশেষ নির্বাচন সেখানে নেই, তাই আপাতদৃষ্টিতে যা একজাতীয় বিজ্ঞান তাকে একই মূল্যে মুখ্যায়িত করে। কিন্তু সাহিত্যের জগতে, আনন্দ সম্ভোগের ক্ষেত্রে মানুষের বাছ-বিচার আছে অর্থাৎ নির্বাচনের ব্যাপারটি রয়েছে। সকল বস্তু সেখানে একভাবে মূল্যায়িত হতে পারে না।

সাহিত্যে শিল্পেই সাময়িক ও শাশ্বতের ব্যাপার আছে। সামায়িক তার বাইরের চাকচিক্য ও ভঙ্গিমা দিয়ে মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে তাও মানুষকে একপ্রকার আনন্দ দেয়। কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হতে পারে না, কারণ তা মুহূর্তের উত্তেজনা মাত্র। অস্বাস্থ্যকর মন সাময়িক আত্মতৃপ্তির জন্য আনন্দের নামে এই কুপথ্যকেই গ্রহণ করে, একেই প্রচলিত মত-অনুযায়ী বলে আধুনিকতা। আসলে এটি হল আধুনিকতার ভঙ্গিমা — আধুনিকতার উদারতা, ভাবনার বিস্তৃতি এর মধ্যে নেই। কিন্তু উত্তেজিত মন মানুষকে এই প্রকৃত সত্যটি বুঝতে দেয় না। কখনও কখনও কোনো কোনো শিল্প সাহিত্য এই 'শৌখিন মজদুরিটি' করে থাকে।

তবে চিরকাল এই ভঙ্গিমা চলতে পারে না। এক সময় মন শান্ত হয়, সুস্থ স্থির হয়। তখন মানুষ তার চিরকালের স্বভাবকে ঘুরে পায়। তখন আসে সহজ সম্ভোগের দিন। তখন সাহিত্য তার সাময়িক আধুনিকতার ভঙ্গিমাকে ত্যাগ করে শাশ্বত করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। হৃদয় দিয়ে এই চিরন্তন সত্য-শিব-সুন্দরকে তখন উপলব্ধি করা যায়। তখন যা আনন্দ দেয় তা সুন্দর এবং যা সুন্দর তাও আনন্দ দান করে। রবীন্দ্রনাথ এই অনুভূতির সত্যকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, কেন-না অনুভূতির বাইরে রসের সত্যতা নেই বলেই তাঁর স্থির বিশ্বাস।

৭.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি কবি বন্ধুবর শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একখানি পত্র বিশেষ। এই গ্রন্থে প্রবেশ করার মূল চাবি হল এই পত্রটি। এই ভূমিকা স্বরূপ পত্রখানিতে রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্যের রহস্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতি মুহূর্তে এই জগৎকে নব-নব রূপে আমরা যে জানছি সেই জানা দু-ধরনের —জ্ঞানের দ্বারা ও ভাবের দ্বারা। জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় বিষয়কে। বিষয়ই যেখানে মূল

লক্ষ্য এবং জ্ঞাতা উপলক্ষ মাত্র। এই ক্ষেত্র বিজ্ঞানের। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কেবল বিষয়ের উপাদানকে বিশ্লেষণ করাই তার কাজ, কোনো আবেগের স্থান তাতে নেই।

কিন্তু ভাবের জানার দ্বারা আসলে আমরা নিজেকেই জানি। এখানে বিষয় উপলক্ষ মাত্র। এই ক্ষেত্র সাহিত্যের ক্ষেত্র। যে কোনো বিষয়কে উপলক্ষমাত্র করে আমাদের আত্ম পরিচয় ঘটে।

বিজ্ঞানের সত্যতা যুক্তি-প্রমাণ নির্ভরশীল; কিন্তু সাহিত্যের সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে। তার মধ্যে যথার্থতা না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের উপলব্ধিতে সে-ই একান্ত সত্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপলব্ধির নিবিড়তাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। কেন-না মানুষের অন্তর কল্পনার ঐশ্বর্যে ভরপুর। তাই এই কল্পনার প্রেরণাতেই সৃষ্টি রূপকথার। বৈচিত্র্যের লীলাই সাহিত্যের কাজ, সে লীলায় সুন্দর অসুন্দর উভয়ই থাকতে পারে। সাহিত্য কেবল সৌন্দর্যই রচনা করে না। আসলে যা আনন্দদায়ক সাহিত্যে তাকেই সুন্দর বলা হয়। বাস্তব জগতের সৌন্দর্যের সঙ্গে সাহিত্যের সৌন্দর্য মেলে না। বাস্তব জগতে যে দুঃখ মানুষকে পীড়া দেয়, সেই দুঃখকে মানুষ দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, এরিয়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যের জগতে গভীর দুঃখ ট্র্যাজেডিরূপে দেখা দেয়, এই ট্র্যাজেডিতেই মানুষ খুঁজে পায় ভূমার আনন্দ। আসলে সাহিত্যে মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। সাহিত্য-লীলার জগৎ অর্থাৎ আনন্দের ক্ষেত্র, জগত স্রষ্টার মত মানুষও লীলাময়, সাহিত্যে ও আর্টে তার এই লীলা প্রকাশিত হয়, তার আনন্দ রসে-রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে।

বাস্তব সত্য এবং সাহিতের সত্যে পার্থক্য আছে। সাহিত্যের সত্য হল মানুষ যাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে, যাকে পেয়ে সে আনন্দিত হয়। তর্কের দ্বারা, প্রমাণের দ্বারা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, কেন-না এই সত্য একান্ত উপলব্ধির দ্বারা প্রাপ্ত। সে সুন্দর বা অসুন্দর যাই হোক না কেন, সে মনোরম, সে রসস্বরূপ। অনুভূতির বাইরে এই রসের সত্যতা নেই।

৭.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

নবম বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

৭.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

নবম বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৮
সাহিত্যের পথে
সাহিত্যের পথে : নির্বাচিত প্রবন্ধ আলোচনা - ২

বিষয় বিন্যাস

৮.০ ভূমিকা (Introduction)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা

৮.২.১ তথ্য ও সত্য

৮.২.২ বাস্তব

৮.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৮.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৮.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৮.০ ভূমিকা (Introduction)

বিশ্বখ্যাত দেশ-বিদেশের আলঙ্কারিক এবং সাহিত্য তাত্ত্বিকদের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের বিচিত্র চিন্তা-চর্চাকে আপন অন্তর-সত্তার রসে জারিত করেছেন তিনি, এবং সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যে ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন তা কিন্তু অভিনব। আসলে তাঁর সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনা তাঁরই সৃষ্টিশীল সত্তার পরিচায়ক একটি বিশেষ অংশ। তাই তা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব। তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটির 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধটি তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটি এক ভিন্ন পটভূমিতে রচিত। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'বাস্তব'। ১৯১৪ সালে এই প্রবন্ধটি রচিত হয়। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এই প্রবন্ধটির রচনাকালের একটি ব্যবধান রয়েছে।

এই রচনাটির আরম্ভের পূর্বেও এক একটি প্রারম্ভিক পটভূমিকা রয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটি। এরপর দীর্ঘ সাত বৎসর কবির কোনো সাহিত্যতত্ত্বমূলক রচনা আমরা পাইনি। এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর 'সবুজপত্র'-এর চতুর্থ সংখ্যায় (১৯১৪ শ্রাবণ, ১৯১৪ ইং) প্রকাশিত হয় এই 'বাস্তব প্রবন্ধটি। এতে অনতিপ্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি পালাবদলের ছাপ।

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

'সাহিত্যে পথে' গ্রন্থে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিভিন্ন তত্ত্বকে বিচিত্র প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিতে তিনি যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলিকে সূত্রাকারে সাজিয়ে নিলে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার একটি সম্যক পরিচয় আমরা পেতে পারি। প্রতিটি প্রবন্ধ গভীরভাবে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন উপলব্ধিকে। তথ্যকে বিশ্লেষণ করে আমরা ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পারি, কিন্তু সাহিতের সত্য নির্ভর করে মানুষের উপলব্ধির উপর, কোন তথ্যের উপর নয়। তথ্য ব্যাপারটিকে সাহিত্য যে একেবারে বর্জন করে, তা নয়, কিন্তু এই তথ্যকে অবলম্বন করে আমাদের অনুভূতি যে সত্যে উপনীত হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই সত্য, সেই সত্য কেবল তথ্য নির্ভর নয়। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় কবি যে কথা বলেছেন —

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নয়,
কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যর চেয়ে
সত্য জেনো।"

'তথ্য ও সত্য' এবং 'বাস্তব' প্রবন্ধে একথাকেই যেন কবি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

সাহিত্য হল মানুষের প্রকাশ। এই প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সাহিত্য তাই লীলা। সাহিত্য কিন্তু খেলার সমরূপ নয়। কেননা, খেলার মধ্যে যে সংগোপনে এক ধরনের প্রয়োজন প্রচ্ছন্ন থাকে, আমাদের জৈব সত্তাকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য যে বিশেষ প্রক্রিয়া গুলির প্রয়োজন, খেলার মধ্যে যে সেই প্রক্রিয়া গুলির প্রচ্ছন্ন রূপায়ণ ঘটে তা আমরা মনুষ্যেতর জীবের খেলার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু সাহিত্যের প্রকাশ চেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল বিশুদ্ধ অনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, কোন প্রয়োজনকে নয়। তাই সাহিত্য হল লীলা।

আমাদের আত্মার মধ্যে আছে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ। সেটিই রূপায়িত হয় সাহিত্যে, শিল্পে। এখানে আমরা পরিপূর্ণ এককে চরমরূপে দেখতে পাই। এই একের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ তথ্য ও সত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে। আমাদের সত্তার দুটি দিক। যে দিকে আছে 'ব্যক্তিগত আমি' তা তথ্য ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু যেখানে 'আমি মানুষ' — এর অর্থ 'আমি' বিরাট একের আলোকে নিত্যতায় উদ্ভাসিত তখন সে হয়ে ওঠে সত্য। অর্থাৎ, তথ্যের মধে উপলব্ধির দ্বারাই সত্যের প্রকাশ ঘটে। সাহিত্যের সত্যকে বুঝতে হলে তাকে রসের ভূমিকায় বুঝতে হয়। অর্থাৎ তা রূপ-রস-সঙ্গীতের সৌন্দর্যে যুক্ত হয়ে অখণ্ড ঐক্য লাভ করে এবং আনন্দের মূল্যে চিত্তে স্বীকৃতি পায়।

এই যে সাহিত্যের সত্য এই হল বাস্তব। 'বাস্তব' প্রবন্ধটির আলোচনায় কবি 'বাস্তব' সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করে সাহিত্যের বাস্তব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বর্তমান যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ। স্বভাবতই সাহিত্যের উপরেও বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সাহিত্য ও বিজ্ঞান এককথা হতে পারে না। বিশ্বের যাবতীয় অজানা বস্তুর প্রতি বিজ্ঞানের কৌতূহল। কিন্তু সাহিত্যে মানুষের অনুভূতিশীল মন বিশ্বের ইতস্ততঃ ছাড়ানো বস্তু থেকে কেবল সেইগুলিকেই মাত্র গ্রহণ করে যেগুলিকে সে সত্য বলে গ্রহণ করে। সাহিত্যের এই বাছাই করা বস্তুই হল বাস্তব, এটি কোন জড়পিণ্ড বাস্তব নয় — মানুষের উপলব্ধিতে অনুভব করা বাস্তব। অর্থাৎ বাস্তব বলতে সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি, সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিতের বাস্তবের কথা বলেননি, তাঁর মতে বিজ্ঞানের বাস্তব হল তথ্য এবং সাহিতের বাস্তব হল সত্য। বিজ্ঞানের বাস্তব যথা যায়, নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিজ্ঞান এই যথার্থ বাস্তবকে দেখে। কিন্তু সাহিত্যের বাস্তব হল বাছাই করা জিনিস। সেই বাছাই করা বস্তুটির একটি বিশেষভাব সাহিত্যিকের অন্তরে প্রবেশ করে সাহিত্যিকের আপন প্রতিভা বা কল্পনার দ্বারা নতুন করে সৃষ্ট হয়। সেই গৃহীত সত্যটিই সাহিত্যের বাস্তব। বিজ্ঞানে বস্তুর ভালো-মন্দ যাচাই হয় তথাকথিত বাস্তবের কষ্টিপাথরে। কিন্তু সাহিত্যের ভালো-মন্দ সাধারণ ভালো-মন্দের ধারণায় পড়ে না। মন যদি মন্দকেও গ্রহণ করে তবে ভাবের দ্বারা আভাষিক্ত হয়েই সাহিত্যে তা সত্য ও বাস্তব হয়ে ওঠে। উপর্যুক্ত দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। এ-দুটি প্রবন্ধ থেকে আপনারা জানতে পারবেন—

- বাস্তব ও সত্য কী
- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বস্তুর বাস্তব ও সত্য এবং সাহিত্যের দৃষ্টিতে বস্তুর বাস্তব ও সত্য
- বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব ও সত্য এবং সাহিত্যের অনুভূতি সাপেক্ষ দৃষ্টিতে বাস্তব ও সত্য
- আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বাস্তব ও সত্য এবং সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত
- রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যের বাস্তব ও সত্য এবং চিরন্তনতা
- পাশ্চাত্যের সংস্পর্শ লাভ করা বাংলা সাহিত্য এবং সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

আসুন, এবারে আমরা 'তথ্য ও সত্য' এবং 'বাস্তব' প্রবন্ধ দুটির মূল আলোচনায় অগ্রসর হই।

৮.২ নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা

এবার আমরা 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের নির্বাচিত প্রবন্ধ — 'তথ্য ও সত্য' এবং 'বাস্তব' নিয়ে আলোচনা করব।

৮.২.১ তথ্য ও সত্য

বিশ্বখ্যাত দেশ-বিদেশের আলঙ্কারিক এবং সাহিত্য তাত্ত্বিকদের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের বিচিত্র চিন্তা-চর্চাকে আপন অন্তর-সত্তার রসে জারিত করেছেন তিনি, এবং সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যে ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন তা কিন্তু অভিনব। আসলে তাঁর সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনা তাঁরই সৃষ্টিশীল সত্তার পরিচায়ক একটি বিশেষ অংশ। তাই তা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব। তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটির 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধটি তারই প্রমাণ।

সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে একটি ব্যাকরণিক দিক আছে— আবেগ প্রবণ এবং সৃষ্টিকাতর মন নিয়ে সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা চলে না। তাত্ত্বিককে হতে হয় নির্মোহ, নিরাসক্ত। সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে পাল্টে দিয়েছেন। সাহিত্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তথ্যকে নয়, সত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই সত্যের স্থান রয়েছে হৃদয়ে।

সাহিত্য মানুষের জটিল ও রহস্যময় মনের সৃষ্টি। তার বিষয় আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের স্থূল প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য হল মিলনের ক্ষেত্র। এই মিলন বিশ্ব-জগতের সঙ্গে মানবাত্মার মিলন। এই মিলন সম্পূর্ণ হয় কল্পনাশক্তির সহায়তায়। যা আমাদের থেকে পৃথক, কল্পনার সাহায্যেই তার সঙ্গে আমাদের একাত্মতা সম্পূর্ণ হয়। যা আমাদের মনের বস্তু নয়, মন তাতে প্রবেশ করে তাকে মনোময় করে তোলে। এ এক ধরনের লীলা এবং এই লীলায় আছে আনন্দ।

সাহিত্যের মিলনতত্ত্বটি বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মিলনকে বলেছেন প্রয়োজন-নিরপেক্ষ। সাহিত্যের জগতকে তিনি বলেছেন অপ্রয়োজনের জগৎ।

সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসকে অনেকে খেলার সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁদের মতে, খেলা প্রয়োজন নিরপেক্ষ এবং তার উদ্দেশ্য অবসর বিনোদন। সাহিত্য ও শিল্পের উদ্দেশ্যও একই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এত সহজভাবে খেলা এবং সাহিত্য শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যকে মেনে নিতে পারেননি। কেন-না আপাতদৃষ্টিতে খেলাকে বিশুদ্ধ অবসর বিনোদনের ব্যাপার হিসেবে দেখা হলেও তার মধ্যে একধরনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জীবন ধারণের জন্য আমাদের মধ্যে কতগুলি বেগ আবেগ আছে। এজন্যই শিশু শোওয়া অবস্থায় হাত-পা নাড়ে, বড় হলে অকারণে ছুটোছুটি করে। মেয়েরা মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে বলেই ছোটো মেয়েরা পুতুল খেলে; ছেলেদের মধ্যে জিগীষা বৃত্তি থাকার জন্যই বালকেরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

যদিও আমরা প্রয়োজনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খেলায় যোগদান করি, তা সত্ত্বেও খেলার বৃত্তি ও প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি মূলত এক। তাই খেলায় জীবন-যাপনের নকল এসে পড়ে। মনুষ্যেতর প্রাণীর খেলার নমুনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই কুকুরের খেলা লড়াইয়ের প্রয়োজন মেটায় এবং বিড়ালের খেলা ইঁদুর শিকারের নকল। সুতরাং খেলার ক্ষেত্র জীবনযাত্রার ক্ষেত্রের প্রতিরূপ বলা যায়।

কিন্তু সাহিত্যের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ হল মূলকথা। এই প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দ রূপকে ব্যক্ত করা। এর সাহিত্যগত ফলকেই রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্য বলতে চান। অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাইরে প্রত্যক্ষ গোচর করে তাকে পর্যাপ্ততা দান করার যে প্রয়াস তাকে বলা হয় লীলা। কেন-না এই অহেতুক আনন্দের অর্থ হল প্রয়োজন নিরপেক্ষ আনন্দ, যাকে বলা যায় অলৌকিক আনন্দ।

সেজন্যই আমাদের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও যদি সাহিত্যে রূপায়িত হয়, তবে যে কেবল একটি সংবাদমাত্র নয়, তা অনাবিল আনন্দ আস্বাদনের ব্যাপার হয়ে ওঠে। যেমন, বিদ্যাপতি যখন বলেন—

"যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহিরে ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।"

এটি কেবল গোধূলি লগ্নে ঘর থেকে বের হয়ে আসা একটি বালিকার সংবাদমাত্র নয়, কবিতাটির বিষয়বস্তুও এটি নয়, এই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ করে ছন্দে-বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা-সংযোগে যে একটি সামগ্রিক বস্তু ধরা দিয়েছে, সেটিই এই কবিতার আসল ব্যাপার। এই অনির্বচনীয় ব্যাপারটি তার স্থূল বিষয়কে অতিক্রম করে প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজ কবি কীটস্ একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কীটস্-এর মতে এই পূজাপাত্রটি কেবল মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার আধার মাত্র নয়, অর্থাৎ এটি কেবল মানুষের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়নি। অর্থাৎ এর দ্বারা অর্ঘ্য নেবার প্রয়োজন সিদ্ধ হলেও সেই প্রয়োজন সাধনই এর শেষ কথা নয়। গ্রীক শিল্পী একটি পূর্ণতার আদর্শকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন এর মধ্য দিয়ে। তাই এর রূপের দ্বারা অপরূপ ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। অন্তরের এই অহৈতুকী আনন্দকে বাইরে প্রত্যক্ষগোচর বা প্রকাশ করার দ্বারা একে ব্যপ্ত করার যে প্রয়াস তাকে লীলা বলা হয়। এই লীলা খেলার সমগোত্রীয় হতে পারে না। কেন-না, তা হল মানুষের রূপসৃজনের তৃষ্ণা; প্রয়োজন সাধনের চেষ্টা নয়। তাতে দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্য-কর্মের সম্পর্ক থাকলেও সে-সম্পর্ক অবান্তর। কেন-না, সে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাপার। খেলার সঙ্গে এই লীলার পার্থক্য হল, প্রয়োজন সাধনের জন্য যে সকল প্রবৃত্তি নিয়ে আমরা জন্মেছি, তাদের আমরা খেলায় প্রকাশ করি। খেলাতেই খেলার শেষ হয়। তাই খেলার মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার নকল।

কিন্তু লীলায় আছে আনন্দ। সেই আনন্দ জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দিকটির বহু উর্দ্ধ লোকে। তাই লীলা ও খেলা এক বস্তু নয়।

ভারতীয় মতানুসারে বলা যায়, আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে এক অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ। একথা রবীন্দ্রনাথও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর মতে, কোনো জানাই একান্তভাবে স্বতন্ত্র জানা নয়, আমরা যা কিছুকেই জানি তা কোনো-না কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। যেখানে এই ঐক্যের অভাব ঘটে সেখানেই আমাদের জানা বা পাওয়া অস্পষ্ট ও খণ্ডিত হয়। কাব্যে, চিত্রে, গীতে, শিল্পকলায় যখন রঙে-রসে-রেখায় আমরা পরিপূর্ণ একেকে চরমরূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরবাসী একের সঙ্গে বহির্বিশ্বের একের মিলন ঘটে। আমাদের অন্তর্লোকবাসী এক যখন লীলাময় হয়, যখন সৃষ্টির মাধ্যমে যে আনন্দ আস্বাদন করতে চায়, তখনই প্রকাশের আবেগে সে একেকে বাইরে সুপরিস্ফুট করে তুলতে চায়। তখন বিষয় উপাদানকে আশ্রয় করে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয়ে উঠে। প্রয়োজনের দিক দিয়ে, উপাদানের দিক থেকে এর মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এর প্রকৃত মূল্যায়ন হয় তার অনুভবে, আস্বাদনে।

বর্ণে-গন্ধে-রূপে-রেখায় আমরা গোলাপ ফুলে একের সুষমা দেখি বলেই তা আমাদের আনন্দ দেয়। নিখিলের অন্তরেও রয়েছে সেই ঐক্যের সুষমা। নিখিলের এই ঐক্যকে ছিন্ন করলে লাভ হয়, আর নিখিলকে এক করে নিলে হয় রস। লোভের দ্বারা এই একের ধারণা, একের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কেন-না, লোভ একক মনের ব্যাপার, যা নিখিল থেকে মানুষকে পৃথক করে লাভালাভের হিসাবের দ্বারা। আর রস অন্তরকে মহামিলনানন্দে তৃপ্ত ও পূর্ণ করে।

অসীম একের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির এক আকুলতা— তাই ঋতুতে ঋতুতে সে প্রকৃতিকে সাজায় বিচিত্র বর্ণে-গন্ধে-বিন্যাসে নব নব রূপে। সৃষ্টির এই ব্যাকুলতার শেষ নেই। তাই প্রকৃতির ভরা পাত্রটি নিঃশেষ করে দেয় সে নতুন করে ভরার নেশায়। এই তার লীলা। বেদনার তারে ঝংকার না দিলে তো বীণায় সুর জাগে না। রবীন্দ্রনাথ বেদের উল্লেখ করে সে কথাই বলেছেন যে — "অসীম একের আকূতিই তো সেই বেদনা যা, বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করে রয়েছে।" রূপে-আলোয়-আকাশে নানা আবর্তে আবর্তিত— সূর্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে অনু-পরমাণুতে সুখে দুঃখে জন্মে-মরণে সৃষ্টির সেই কান্না মানুষের অন্তরে বেজে ওঠে তাকেও জাগিয়ে তুলেছে। তাই তার সৃষ্টিলীলার প্রকাশ ঘটেছে রঙে-রেখায়-সুরে। তাই শিল্প-সাহিত্যে-অব্যক্তের গভীর হতে বায় যায় অনির্বচনীয়ের রসধারা। এর দ্বারা পার্থিব তৃষ্ণা মেটে না। স্থূল বাস্তববাদী জড়বাদীরা একে বাজে খরচ বলেই মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে এর উল্টো কথাই বলেছেন— "সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। ...পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে (ঘাস) শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে যে চির প্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে।" ('বিচিত্র প্রবন্ধ', "পনোরা-আনা") শরীরে পিপাসা ছাড়াও মানুষের আর-এক পিপাসা আছে তা অন্তরের পিপাসা। সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনের ঊর্ধে তা। সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্যে মানুষের সেই পিপাসারই প্রকাশ। মানুষের

মধ্যে এই পিপাসা কেন জাগে তা রহস্যময়। কিন্তু এই পিপাসাই মানুষকে সত্যের আলোয় পৌঁছে দেয়। নিত্যদিনের অভ্যাসের স্থূলতায় এই সত্যের দীপ্তি আবৃত হয়ে থাকে।

জ্ঞানের দুটি দিক আছে— তথ্য ও সত্য। যে বস্তু যেমন আছে সেই যথাযথ রূপটি হল তথ্য, এই তথ্যকে অবলম্বন করে সত্য প্রকাশিত হয়। এই সত্য হল পূর্ণতা, সুষমা। বহু বস্তুর মধ্যে মন যাকে বিশেষরূপে গ্রহণ করে, তা-ই হল সাহিত্যের সত্য।

সত্যের উপলব্ধিতে যে আনন্দ তার নাম সৌন্দর্য। ব্যক্তিগত পরিচয়ের দ্বারা যখন মানুষ প্রকাশিত হয় তখন তা তথ্যের দ্বারা খণ্ডিত একটি ব্যক্তিসত্তা মাত্র। কিন্তু ব্যক্তিগত আমিকে ছাড়িয়ে যখন সে 'মানুষ' রূপে প্রকাশিত হয় তখনই বৃহত্তর একের নিত্য আলোকে প্রকাশিত হয়। তথ্যের মধ্যে এই সত্যের প্রকাশই প্রকাশ।

সাহিত্য ও ললিতকলায় প্রকাশই হচ্ছে প্রধান। তথ্যকে আশ্রয় করে সে মনকে সত্যের স্বাদ দেয়। এই স্বাদটি একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। এই মিলনের প্রেরণাতেই মানুষ নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে। এই প্রকাশের তাড়নাই ক্রমাগত তাকে প্রাণধারণের সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রকাশ হল ঐশ্বর্য। আলো যেমন তাপের ঐশ্বর্য, তেমনি মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বকীয় ভাব, যা নিজের মধ্যে সংযুক্ত রাখা যায় না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান, তার দ্বারাই মানুষের প্রকাশে নিত্য উৎসব। এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তিই তার প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্য। সাহিত্যে শিল্পে এই প্রাচুর্যেরই প্রকাশ।

তাই শিল্পের মধ্যে কেবল প্রয়োজন ব্যক্ত হয় না, বা কেবল তথ্যকে আশ্রয় করে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। শিল্পী সাহিত্যিক তথ্যকে সেইটুকুই মাত্র গ্রহণ করবেন যাকে উপলক্ষ করে কোনো একটি বিশুদ্ধ সুষমাময় ছন্দ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই বিশ্বছন্দের ঐক্যসূত্রেই তথ্যের মধ্যে সত্যের আনন্দ আমরা আস্বাদন করতে পারি। এই ঐক্য না থাকলে তথ্য নীরস সংবাদমাত্র হয়ে দেখা দেয়।

তথ্য সংগ্রহ শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজ নয়। তাঁর কাজ আরো মহৎ, আরো বৃহৎ। তাই সামান্য তথ্যকে আশ্রয় করে তার ভিতরের সত্যকে গভীরভাবে অনুভব করা যায় শিল্পে-সাহিত্যে। এই সত্যের ঐক্যের অনুভবেই আমরা আনন্দ পাই। কেন-না আমরা যখন সত্যের পূর্ণস্বরূপকে দেখি তখন তার সঙ্গে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বন্ধন থাকে না, সত্যগত সম্বন্ধের মুক্তস্বরূপ যেখানে আমরা অনুভব করতে পারি।

পরীক্ষার দ্বারা অতি সহজেই তথ্য প্রমাণিত হতে পারে। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই তথ্য প্রমাণিত হয়। তাই তথ্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ভূমিকাই বড়ো। কিন্তু সাহিত্য বা আর্টের ক্ষেত্রে বস্তুর সত্যতা প্রমাণিত হয় রসের ভূমিকায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বস্তুজগতে ঘোড়া একটি তথ্যমাত্র। ঘোড়ার খুঁটিনাটি বর্ণনা তাই তথ্যের আওতায় পড়ে এবং সেই তথ্যই বস্তুজগতে একটি ঘোড়াকে নির্ভুলরূপে আমাদের পরিচিত করিয়ে দেয়। কিন্তু যথার্থ গুণী যখন একটি ঘোড়া আঁকেন তখন ছন্দে-বর্ণে-রেখায়-রঙের সংস্থানের দ্বারা একটি সুষমাময় রূপ নির্মাণ করে ঘোড়াটির এক সত্যস্বরূপকে আমাদের কাছে ফুটিয়ে তোলেন, এই ক্ষেত্রে ঘোড়ার তথ্য বাহুল্যমাত্র। তথ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত বিবরণের

প্রয়োজন আছে, তার কণামাত্র হিসাবের ভুল হওয়া চলে না, তবেই তথ্য তার যথার্থতা হারায়। কিন্তু সত্যের ক্ষেত্রে এই কড়াক্রান্তি হিসাবের কড়া নিয়ম চলে না। সত্যের মূল লক্ষ্য হল রূপ-রেখা-রঙ-গীতের এক সুষমাময় ঐক্য আর আমাদের অন্তর আনন্দের মূল্যেই এই ঐক্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, শ্রেণিগত সত্য দিয়ে তাকে যাচাই করে না। তথ্যকে নিখুঁত হতে হয়, সত্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যের সত্যে নিখুঁত ব্যাপারটিই শেষ কথা নয়।

কবিতায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দেরই একটি অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং এই বিশেষ অর্থটি শব্দের তথ্যগত সীমা। কিন্তু কবিতা কেবল এই সীমায়িত অর্থের বন্ধনে অর্থাৎ তথ্যের বন্ধনে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে না। এই সীমা অতিক্রম করে সেই শব্দের ভিতর দিয়েই সত্যের অসীমতা প্রকাশিত হয় কবিতায়।

আসলে তথ্য হল fact আর সত্য হল truth। তথ্য দিয়ে ইতিহাস রচিত হতে পারে, কিন্তু সত্য একান্তভাবেই সাহিত্যের বস্তু। তথ্য সীমায়িত, কিন্তু সত্য সীমাকে অতিক্রম করে এক বৃহতের ব্যঞ্জনা আনে। তথ্যের দ্বারা সত্যের আস্বাদন কখনোই সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় এই কথাটিই বলেছেন—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নয়।
কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে
সত্য জেনো।"

অর্থাৎ, সত্যের স্থান মানুষের অন্তরে, বহির্জগতের তথ্য দ্বারা সেই সত্যকে প্রমাণ করা যায় না। করলে, সত্য খণ্ডিত হয়।

যেমন, ছেলেভুলানো ছড়ায় আছে—

"খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।"

জুতা হল তথ্য, বস্তুজগতে তাকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত সহজ। কিন্তু 'জুতুয়া'-র মাধুর্যকে পেতে হলে মা এবং খোকার হৃদয়ের কাছে যেতে হয়, নইলে তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

শব্দের ভিতর দিয়ে সীমাকে অতিক্রম করে সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করার জন্যই কবিতায় এত ইশারা, কৌশল, ভঙ্গি।

জ্ঞানদাসের পদে আছে—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।"

—বাস্তব জগতে এই 'রূপের পাথার' ও 'যৌবনের বন'-এর অস্তিত্বের তথ্যগত কোনো প্রমাণ দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু রাধার দৃষ্টির সম্মুখে কৃষ্ণের রূপ যে শুধু রূপ নয়, সে যে রূপের সমুদ্র— তার তরঙ্গায়িত সেই লীলায় ক্ষণে ক্ষণে কত অপরূপের উদ্ভাসন— তার উপলব্ধিতেই এই কবিতার সত্য উদ্ভাসিত হয় আমাদের অন্তরে। আর 'যৌবনের বন' আমাদের দৃষ্টির কাছে কোনো অটবী-পরিবৃত অরণ্য হয়ে দেখা দেয় না, বরং, অরণ্যের সেই রহস্যময় রোমাঞ্চের ব্যঞ্জনা জাগায় যাতে লীলাময়ী রাধার মন পথ হারিয়ে ফেলে অনায়াসেই। ছোট্ট এই 'বন' শব্দটি কী গভীরভাবে রহস্যময় যৌবনের রূপকে এক পলকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে— এই হল সেই অসীমের আস্বাদন, যার দ্বারা আনন্দিত হয় মন। অর্থাৎ, সাহিত্যের সত্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা প্রমাণিত হয় রসের আস্বাদনে। তথ্যের দুর্গের পাথরের গাঁথুনির বন্ধনে যারা সত্যকে আবিষ্কার করতে চান, তাদের কাছে কবিতার সত্যমূল্য বিকৃত হয়। এর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতাটির উল্লেখ করে। তার বিষয় হল—

একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তীনগরের পথে পথে ভিক্ষা করে ফিরছেন। ধনীর, শ্রেষ্ঠীর, রাজবধূর বহুমূল্য ভিক্ষা পড়ে রইল পথে। প্রভুর ভিক্ষা মেলে না। বেলাশেষে গাছের তলে এক ভিখারী মেয়ের দেখা পাওয়া গেল; নিঃস্ব সেই মেয়ে তার একমাত্র জীর্ণ বস্ত্রখানি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রভুর নামে দান করল। অনাথপিণ্ডদ প্রভুর নামে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষাখানি গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

কবির এই কবিতা এই ধার্মিক খ্যাতিমান মানুষকে ক্ষুব্ধ করিছিল, তাঁর মতে এই কবিতা ছেলেমেয়ের অপাধ্য। নীতিবাগীশের কাছে তথ্য বড় হয়ে সত্য ঢাকা পড়ে গেল। তথ্যের দিক থেকে হয়তো এই সমালোচক সঠিক কথা বলেছেন, কিন্তু কবির কাজ সেই তথ্যকে নিয়ে নয়। সত্যের কাছে সমস্ত যুক্তি তর্ক হার মেনে যায়। সাহিত্যের জগতে তথ্যের অপলাপ ঘটলেও সত্য ভ্রষ্ট হয় না। কেন-না তথ্যবস্তু ও রসবস্তু সমধর্মা ও সমমূল্যের নয়। তথ্য দৃষ্টিকে খণ্ডিত করে সংবাদটুকুকে গ্রহণ করে তার বিচার বিশ্লেষণ করে, কিন্তু সত্যের মূল্য এই সবকিছুকে ছাপিয়ে অন্য এক ব্যঞ্জনার দিকে দৃষ্টিকে উন্মুক্ত ও উদ্ভাসিত করে। তাই কবি যখন বলেন—

"জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ নয়ন ন তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয় জুড়ন ন গেল।।"

—ডারউইনের থিয়োরি এখানে এসে হোঁচট খেলেও কবি এই লাখ লাখ যুগকে অনায়াসে অতিক্রম করতে পারেন রসের স্রোতে ভেসে। বিজ্ঞান যে সময়ের হিসাব করে, সাহিত্যের শিল্পের ক্ষেত্রে সেই হিসাব নিতান্তই অমূলক। কারণ তার হিসাব রস-সত্যের অসীম লোকে।

তথ্যান্বেষীর সন্ধানী দৃষ্টি ও নীরস হৃদয়কে ইঙ্গিত করে কবি তাই বলেছেন—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তথ্য এবং সত্যের পার্থক্যকে উদাহরণ ও যুক্তি এবং গভীর অনুভূতি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধটি এক কথায় অনুপম হয়ে উঠেছে।

৮.২.২ বাস্তব

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটি এক ভিন্ন পটভূমিতে রচিত। এই গ্রন্থের 'বাস্তব' প্রবন্ধটি ১৯১৪ সালে রচিত হয়। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এই প্রবন্ধটির রচনাকালের একটি ব্যবধান রয়েছে।

এই রচনাটির আরম্ভের পূর্বেও এক একটি প্রারম্ভিক পটভূমিকা রয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটি। এরপর দীর্ঘ সাত বৎসর কবির কোনো সাহিত্যতত্ত্বমূলক রচনা আমরা পাইনি। এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর 'সবুজপত্র'-এর চতুর্থ সংখ্যায় (১৯১৪ শ্রাবণ, ১৯১৪ ইং) প্রকাশিত হয় এই 'বাস্তব প্রবন্ধটি। এতে অনতিপ্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি পালাবদলের ছাপ।

রচনার ক্ষেত্রে, বিশেষত কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কবি বারবার আক্রান্ত ও সমালোচিত হয়েছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তির দ্বারা। কিন্তু কবির তৃতীয়বার বিদেশযাত্রার পূর্বে বিপিনচন্দ্র পালের লেখা 'চরিতচিত্র' প্রবন্ধ (বঙ্গদর্শন ১৯১২) কবির সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, তা উপেক্ষণীয় নয়। বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য ছিল যে, — রবীন্দ্রনাথ অসামান্য কল্পনাশক্তির অধকারী সাহিত্যিক, তাঁর সাহিত্যজগৎ এক অপরূপ কল্পনার জগৎ, কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, জাতীয় জীবনের বাস্তবতার উপর তার ভিত্তি নয়, বাঙালির পরিচিত জীবন থেকে তার উপাদান গৃহীত নয়, সে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে কবির অন্তর থেকে — এ এক আশ্চর্য সুন্দর মায়ার জগৎ বটে, কিন্তু তা সত্য নয়। কবি এর উত্তর দেননি, কিন্তু শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তী 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯১২ সালে 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশাচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন' নামক প্রবন্ধে এর উত্তর দিয়েছিলেন।

এরপরই ১৯১৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কবি তখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। রাধাকমলের বক্তব্য ছিল — রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সুন্দর ও মহৎ, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই। এতে লোকশিক্ষা হয় না। সাধারণ দরিদ্র অশিক্ষিত খেটে-খাওয়া মানুষের অভাব-অভিযোগ আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এতে নেই। এর ভাব আমাদের দেশজ ভাব নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য দেশের সর্বজনের সাহিত্য নয়, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সাহিত্য।

"রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়েছেন। তিনি মৃতুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

এরই উত্তর হিসেবে 'সবুজপত্রে' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধটি।

প্রবন্ধ বিশ্লেষণ :

'বাস্তব' প্রবন্ধে প্রধান বক্তব্য বিষয় তিনটি প্রশ্ন নিয়ে — (ক) সাহিত্যে বাস্তবতা, (খ) সাহিত্য ও লোকশিক্ষা (গ) সাহিত্যের জাতীয়তা।

এই প্রবন্ধে লক্ষণীয় দুটি ব্যপার রয়েছে। পূর্বে-রচিত কবির বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রবন্ধে, যেমন 'প্রাচীন সাহিত্য' ইত্যাদিতে অথবা সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধে যে প্রবল নৈতিকতার সুর ছিল, যে জীবনমূল্য ও সাহিত্যমূল্যকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা ছিল, রামায়ণ-মহাভারতের লোকশিক্ষা জাতিগঠন ও আদর্শের ভূমিকাকে কবি যেমন বড় করে দেখেছিলেন, এই প্রবন্ধে তার কোনো চিহ্ন আমরা খুজেঁ পাই না। এখানে কবি জোর দিয়েছেন রসের উপর, বিশুদ্ধ সাহিত্যমূল্যের উপর — Art of art's sake - এই তত্ত্বের উপর। এর পেছনে রয়েছে কবির এক ভিন্ন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যে আমরা যে বাস্তবতা পাই তা কোন্ বাস্তবতা? সাহিত্যের যথার্থ বাস্তবতা ওজন করে মাপার জিনিস নয়। তথ্যকে আশ্রয় করে যে ঘটনামূলক স্থূল বা বাস্তবতা, তা সংবাদপত্রের প্রকাশ-সামগ্রী; কিন্তু সাহিত্যের বাস্তবতা হল রসের সামগ্রী, তাই তথ্যকে আশ্রয় করে তা গড়ে ওঠে না। ঘটনামূলক বাস্তব প্রতিনিয়ত পাল্টে যায়, কিন্তু রসের বাস্তবতার একটি নিত্যতা রয়েছে, এক চিরন্তন আবেদন আছে।

কবির দ্বিতীয় মত হল, সাহিত্য কখনো লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করে না। সাহিত্য পাঠ করে তা থেকে কেউ যদি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু সাহিত্য জোর করে কাউকে শিক্ষা গ্রহণ করায় না।

কবির তৃতীয় মত হল, ভাব-প্রবাহের মধ্যে কোনো প্রাচীর বা বন্ধন নেই। ভাবের রাজ্যে "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে"— এই স্রোতই সতত বহমান। যুগের পরিবর্তনে মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। নতুন কালের সাহিত্য নতুন কালের ভাবকে গ্রহণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, জীবনের আঘাতেই জীবন জাগে। ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে যদি সেই প্রাণস্পন্দন থাকে যা অচেতন অন্তরকে সোনার কাঠির স্পর্শে সচেতন করে তুলতে পারে, তবে সেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালি নতুন ভাবকে গ্রহণ করবে— এটাই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্র-দর্শনে রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বে উপলব্ধিই সত্যের প্রমাণ। অনেক সময় কবি এই উপলব্ধিকে বলেছেন অনুভূতি। এই অনুভূতি হল হয়ে - ওঠা, মানুষের অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। যে শক্তির সাহায্যে এটি সম্ভবপর হয় রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন কল্পনা। কল্পনার সহযোগেই উপলব্ধি সত্যকারের উপলব্ধি হয়ে ওঠে। এই

উপলব্ধির মধ্যে বিষয় ও বিষয়ী একাকার হয়ে যায়। এই যে উপলব্ধি— একে তাই ঐক্যবোধও বলা যায়। এই ঐক্যবোধের মধ্যে আছে আনন্দ। এই মিলনের আনন্দকেই কবি বলেছেন প্রেম। কল্পনার দৃষ্টিই সাহিত্যের সত্যদৃষ্টি। এই কল্পনার প্রসাদেই আমরা বিশ্ববস্তুকে সমগ্র করে, একান্ত করে, স্পষ্ট করে, দেখতে পাই। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের মতে কল্পনা হল অন্য কিছুকে আপন এবং আপনাকে অন্য কিছু করার শক্তি; স্পষ্ট করে, সমগ্র করে দেখার শক্তি, ঐক্য সংস্থাপনের শক্তি। সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি এই শক্তি রয়েছে। কারণ, মানুষ মাত্রেই সৃষ্টিকর্তা। শিল্প-সাহিত্য তাই কল্পনারই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনাতত্ত্ব কিন্তু তথাকথিত বাস্তব-বিমুখ নয়।

বাস্তব কথাটির বহু অর্থ, বহু অভিব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কথাটিকে নানা সময়ে নানা অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যে বাস্তবতার অর্থ একান্ত বস্তুনগ্নতা, যা প্রকাশের নগ্নতা ও স্থূলতাকে সরবে নিজের বাস্তবিকতা বলে ঘোষণা করতে চায়, সেই ধরনের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি কবি চিরবিমুখ। তাঁর মতে, চিরন্তন সাহিত্য এই ধরনের বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত। এই কথাটিকেই যেন কবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর 'বাস্তব' প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল কবির বিমুখতা নিয়ে সমালোচনার উত্তর দেওয়া। তাই এ-প্রবন্ধের শুরু হয়েছে এভাবে — "দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মতো উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে। অতএব, যদি এমন কথা কেহ বলিত যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব, আমিও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্‌বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; ...

কিন্তু, একেবারে আমারই নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমাদের হোক, আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।"

এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই কবি সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করেছেন। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছেন — "যে যতই উৎপীড়ন করুক, ... যে লেখক তাহার লেখাটা তো রহিলই।" কাজেই এই সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তিনি সমালোচক তথা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে সাহিত্যতত্ত্বের সাধারণ আয়োজন করেছেন।

বাস্তবকে কবি যে অর্থে গ্রহণ করেছেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তিনি জানিয়েছেন— "বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি।" এই বাস্তবতা কোন্ ধরনের বাস্তবতা? কবির মতে— "মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুসের বহুধা প্রকৃতি, তাহার আয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।"

তবে, সাহিত্যের মধ্যে যে বস্তুকে আমরা খুঁজে বেড়াই, কবি বলেছেন, সে বস্তু হল রসবস্তু।

প্রাচীনকালে আলঙ্কারিকেরা ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বে রসকেই কাব্যের প্রাণ বলে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এইক্ষেত্রে তাঁদের তত্ত্বভাবনার এমন একটি সার্বজনীন ভিত্তি ছিল, ব্যক্তিগত রুচির একান্ততায় যার প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথই একমাত্র মনচিন্তাবিদ যাঁর সাহিত্যতত্ত্ব-ভাবনা যুগের সঙ্গে ঠিক পরিবর্তিত হয়নি বটে, কিন্তু পরিবর্তিত যুগের নবীন ভাবনার অভিঘাতের মুখোমুখি তিনি সাহিত্যতত্ত্বকে দাঁড় করিয়েছেন এবং নিজের ভাবনা দিয়ে তাকে তিনি বিচার করার চেষ্টা করেছেন; বলেছেন —

"রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়ে নলের গলায় মালা দিয়েছেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।"

অর্থাৎ, কবির মতে রসানুভূতির মূল আধার রসিকচিত্ত। রসিকের অন্তরের বাইরে রসের প্রকৃত কোনো অবস্থান নেই। যেহেতু রসের অনুভূতি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার, তাই এর বাস্তবতা বিজ্ঞানের বস্তু নয় যে, তাকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে প্রমাণিত সত্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

সে কারণেই নিতান্ত বস্তুবাদী সমালোচকও যদি নিজেকে রসিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে তাঁকে অরসিক বলে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কারণ, রসকেও যেমন দাঁড়িপাল্লায় মেপে ওজন করা যায় না, তেমনি এমন কোনো পরিমাপক যন্ত্র নেই যার দ্বারা রসিক-চিত্তের পরিমাপ করা সম্ভব।

সাহিত্য ব্যাপারটি প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা না-লাগার উপর নির্ভর করে। তবে প্রকৃত রসসাহিত্য বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে বিশেষ একজন সেই রসিকেরই অপেক্ষা রাখে, যিনি আপন অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারেন; সাহিত্য যেন সেই রসিকের দিকে চেয়েই বলতে চায় — "তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান।"

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত অ্যারিস্টটল বা প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ববিদদের মতের বিরোধী নয়। অ্যারিস্টটলও কাব্যিক আনন্দের কথা বলেছেন, তাঁর মতে ক্যাথারসিস-এর ফলে এই কাব্যিক আনন্দ শ্রোতা ও পাঠকের চিত্তে ছড়িয়ে যায়। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরাও কাব্যের উদ্দেশ্য হিসেবে পাঠক চিত্তে রস-নিস্পত্তির কথাই বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

রসতত্ত্বের ভাবনাটি সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। রসকে তিনি আনন্দময় চিত্তভাব অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে — "সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন, সেটা রসবস্তু।" এই রস অথবা আনন্দকে কাব্যে-সাহিত্যে কবি কীরূপে জাগ্রত করবেন? এর উত্তরে প্রাচ্য আলঙ্কারিকরা বলেছেন ধ্বনির ব্যঞ্জনার দ্বারা অথবা রীতির কৌশলে অথবা অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারা প্রথমে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে। এটি তার বাহ্যিক রূপ। অ্যারিস্টটল বলেছেন বাস্তবের সুসামঞ্জস্যময় অনুকরণের দ্বারা সৃষ্ট হবে সৌন্দর্য। অর্থাৎ, সৌন্দর্য সৃষ্টি হল সাহিত্য শিল্পের উপায় — যার মূলে রয়েছে আনন্দ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর মতে যা সত্য মঙ্গল ও পূর্ণের বোধ জাগায়, তা-ই হল সুন্দর। এই সত্য কোনো বৈজ্ঞানিক প্রামাণিক বস্তুর সত্যবোধ নয়, এই মঙ্গল কোনো সামাজিক কর্তব্যকর্মের মঙ্গল নয়, এই পূর্ণতা কোনো বস্তুর বহিঃরূপের আকৃতিগত পূর্ণতা নয়। ক্ষুধার্তের জন্য লঙ্গরখানা খুললে তা সামাজিক মঙ্গলবিধান করে, কিন্তু সাহিত্যে তার যথাযথ বিবরণ-দ্বারা তাকে চিরন্তন সত্যের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয় বলেই কবির বিশ্বাস।

আসলে এই সত্য, মঙ্গল, পূর্ণ এক উপলব্ধি। উপভোক্তার অনুভবলোকে এই বোধের উদ্ভাসন না ঘটলে সাহিত্যরসের আস্বাদ অনুভব করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ, তথাকথিত প্রথাসিদ্ধ ধারণাকে অস্বীকার করেছেন কবি। তাঁর বক্তব্য, সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। এই আনন্দ হল চৈতন্যের উদ্বোধন।

তবে কেবল অনুভবেই কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না; তত্ত্বের একটি সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ রসনিষ্পত্তির মূলে যে স্থায়ী ও সঞ্চারী রয়েছে, রয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির উপাদানসমূহ— এসকলের কথা বলেছেন; বলেছেন— আলোকার্থীকে আলোকলাভের জন্য যেমন দীপশিখাকে প্রজ্বলিত করবার জন্য যত্নবান হতে হয়, তেমনি রস আস্বাদনের জন্যও অলঙ্কার বাচ্য-রীতি-গুণ প্রভৃতির সহায়তার প্রয়োজন যা আহৃত হয় বস্তুজগত থেকে। পাশ্চাত্য মনীষী অ্যারিস্টটল বলেছেন, শিল্পকে বাস্তবের অনুকরণ হতেই হবে। এগুলি সাধারণ এবং সর্বজনবোধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। তিনি যে বাস্তবের কথা বলেছেন, সে বাস্তব কেবল বস্তুতন্ত্রতা নয়। তার মতে— "নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেই মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।"

তবে কবি-কথিত, কবি-অনুভূতি এই বাস্তব কী? এর উত্তর আমরা খুঁজে পাই রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধটিতে—

"আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে 'যা-তা'। কিন্তু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই করা জিনিস। নির্বিশেষে

বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চার-পাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব। আর যে-সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে যায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্য বর্জিত হয়ে তারা আমাদের কাছে ছায়া।"

এই যে বাছাই করা বাস্তব, তা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে বস্তুজগতের দৃশ্যমান নয়; এই মনের মতোকে সাধনার দ্বারা সৃষ্টি করতে হয়। সাহিত্যের বাস্তব রবীন্দ্রনাথের মতে এই সাধনার বাস্তব; কবির মনোভূমিই এই বাস্তবের উৎস। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এর কথা জানিয়েছেন—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

অর্থাৎ, সাহিত্যের বাস্তব আছে বলেই সত্য নয়, মন তাকে মেনে নেয় বলেই সে সত্য, তাই সে বাস্তব। অন্যত্রও একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-কথাই বলেছেন—

"প্রাকৃতিক জগতে অনেক কিছুই আছে যা অকিঞ্চিৎকর বলে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অনেক আছে যা বিশেষভাবে সুন্দর, যা মহীয়ান যা বিশেষ কোনো ভাবস্মৃতির সঙ্গে জড়িত। লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে তাই সে বাস্তবরূপে বিশেষভাবে আমাদের মনকে টেনে নেয়। মানুষের রচিত সাহিত্যজগতে সেই বাস্তবের বাছাই করা হতে থাকে। মানুষের মন যাকে বরণ করে নেয় সব-কিছুর মধ্যে থেকে সেই সত্যের সৃষ্টি চলছে সাহিত্যে; অনেক নষ্ট হচ্ছে, অনেক থেকে যাচ্ছে। এই সাহিত্য মানুষের আনন্দলোক, তার বাস্তবজগৎ। বাস্তব বলছি এই অর্থে, যে, সত্য এখানে আছে বলেই সত্য নয়, অর্থাৎ এ বৈজ্ঞানিক সত্য নয়— সাহিত্যের সত্যকে মানুষের মন নিশ্চিত মেলে নিয়েছে বলেই সে সত্য।"

['বাংলা ভাষা পরিচয় (২)]

এই সত্য এই বাস্তবের দিকে চেয়েই কবি বলতে পারেন —

"তুমি আমার সাধের সাধনা।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।।
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী।।"

কবি-অনুভূত এই বাস্তব সকলের বোধগম্য নয়। সাহিত্যে সাধারণত যারা বাস্তবের অনুসন্ধানী, তারা বস্তুর যথাযথ রূপটিকে চায়। কিন্তু সবকিছুর মতো বস্তুরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই তথাকথিত বাস্তব সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করলেও তাতে চিরন্তনত্ব থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে রসের আবেদনই সাহিত্য শাশ্বতকালের হয়ে ওঠে। যে-বস্তুকে অবলম্বন করে রসের প্রকাশ, সেই বস্তুর বিচার হয়তো সম্ভব। 'সাহিত্যে স্বরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— " ... লেখনীর জাদুতে, কল্পনার পরশমণিস্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, সুধাপানসভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। ... আর্ট এত সস্তা নয়। ... বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্ নয়, রিয়ালিজম্ ফুটে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা কিছুই হতে পারে না।"

কারণ, তাঁর মতে — "সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন, না পদ্মের উপরে?"

আসলে কোনো শিল্পীই বাস্তবতার নিরিখে তাঁর সৃষ্টিকালে নিযুক্ত হতে পারেন না। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য থেকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে রূপ-রঙ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি গ্রহণ করে স্রষ্টা যখন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক বিশেষ মূর্তিরূপ দান করেন, তখন তার পেছনে স্রষ্টা অনুভব করেন এক আনন্দময় আবির্ভাবকে। সেই অনুভব একান্তই তাঁর নিজস্ব— তাঁর নিভৃতচারী অন্তরের অনুভব। এই উপলব্ধি এক নিবিড় অস্মিতাসূচক উপলব্ধি। বাইরের কোলাহল-মুখরিত বিশ্বে তাঁর এই অনুভূতি মেশা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধির দ্বারাই সেই অবাঙ্মানসগোচর আনন্দের আস্বাদন সম্ভবপর হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য আনন্দ করা। কোনো সামাজিক উপযোগিতার জন্য, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। তাই তাঁর বক্তব্য হল—

"কিন্তু, লোকশিক্ষার কী হইবে? সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে। লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই।"

কারণ, সাহিত্য হল অন্তরের সাধনা। কবির সৃষ্টি কেবল আনন্দের সৃষ্টি। তার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নেই। নির্মাণের উদ্দেশ্য থাকে, কারণ মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে; কিন্তু সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য নেই, কারণ, সৃষ্টি করে মানুষ আপন মনের খেয়ালে। সাহিত্য হল সৃষ্টি, তাই এই সৃজন-প্রক্রিয়ায় কোনো ফরমায়েস বা আদেশ চলে না। তা কবির

অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত আনন্দের সম্ভোগ মাত্র। অর্থাৎ, স্রষ্টার ক্ষেত্রে এই আনন্দরস আস্বাদনের মূল উপাদান স্রষ্টার অন্তরের অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদ। সেই উপাদান লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে নীতিকথা হয়ে ওঠে না। বহির্জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে আপন তান মিলিয়েও সে পরিবর্তিত হয় না, তার কোনো জাত-দেশ-কালভেদ নেই। সে কোনো সামাজিক মঙ্গল বিধানের আদর্শকে গ্রহণ করে না। তার রয়েছে এক চিরন্তনত্ব, কবির অন্তরের এক ধ্রুব আদর্শের আলোক দিয়ে এক সৃষ্টি, তাই তা আনন্দময়, অনির্বচনীয়।

এই সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে যোগ অনুভূত হয়— যুগ যুগান্তর দেশ-দেশান্তরের বিশ্বমানবের হৃদয়ের যোগ। এই ঐক্যই চিরন্তন সাহিত্যের মূল কথা। আনন্দই তার কারণ, আনন্দই তার উদ্দেশ্য। এর মধ্যে যে-বাস্তবতা রয়েছে, তা কবির একান্ত অনুভবের বাস্তবতা। এই অনুভূতির মাধ্যমেই একান্ত ব্যক্তিগত বাস্তবের ধারণা বিশ্বজনের ধারণায় বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। তবে এই অনুভূতি সকলের নেই বলেই বঞ্চিতজনের কাছ থেকে কবিকে বহু আঘাত সহ্য করতে হয়।

যাঁর এই আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা নেই, তিনি সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যই সাহিত্য রচনায় হাত দেন; তিনি বাহিরের প্রতিই উৎসুক বলে আপন অন্তরাত্মার বাণীর রূপায়ণ ঘটাতে সক্ষম হন না, তাই তাঁর সাহিত্য শাশ্বত সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না।

[redacted]:

রস-সাহিত্যের আশ্রয় হল বাস্তবতা বা বাস্তবজীবন। কিন্তু নিছক তথ্য সমাবেশের দ্বারা সাহিত্যের মূল্য নির্ণীত হয় না। বাস্তবতার প্রমাণ কবির হৃদয়ে। কবির অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি যা গ্রহণ ও নির্বাচন করে তাই হল বাস্তব।

সাহিত্যে বাস্তবতার প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘকাল বহু আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। প্লেটোর মতে সাহিত্য অনুকরণের অনুকরণ এবং সাহিত্য সত্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত, তা বাস্তব ধর্মবিচ্যুত, সাহিত্যের বাস্তব ছায়াসদৃশ।

আবার অ্যারিস্টটলের মতে সাহিত্যে জীবনের রূপের পূণর্বিন্যাস ঘটে। সাহিত্যের বাস্তবতা জীবনের স্বরূপের প্রকাশ। তবে লৌকিক বাস্তব এবং সাহিত্যের বাস্তব পৃথক বস্তু। ব্যবহারিক জগতে যা সর্বদা ঘটে থাকে তা লৌকিক বাস্তব। কিন্তু ছন্দে-ভাষায়-ভঙ্গিতে-ইঙ্গিতে যখন কবি সেই বাস্তবতাকে জাগিয়ে তোলেন, তখন তা ভাষায় রচিত শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তা আমাদের মনে অপরূপের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে।

বাস্তবতার পরিচয় রূপের প্রকাশে, তা আমাদের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্যের মূলে আছে রস। সেই রস বস্তুকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। আর এখানেই সাহিত্যের বাস্তবতার মূল্য বিচারের সুযোগ ঘটে।

যুগের পরিবর্তনে রুচির, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সাহিত্যে রসভোগের আনন্দ কিন্তু অপরিবর্তনশীল। তাই সাহিত্যের বাস্তবতা কেবল বস্তু বা তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। আবার বাস্তবকে উপেক্ষা করেও রসসৃষ্টির প্রয়াস সম্ভব নয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাস্তবতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে একসময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। সেই সমালোচনার যোগ্য উত্তর দিয়ে কবি স্বয়ং 'বাস্তব' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন।

'সবুজপত্রে' রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, বাস্তব ও রস উভয়ের পরিবর্তন হয়। আবার এই পরিবর্তনের মধ্যে নিত্যরস ও নিত্যবস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য স্থায়ী হয় নিত্যরস ও নিত্যবস্তুর গুণে। বাস্তবকে উপেক্ষা করে রসসৃষ্টির চেষ্টা কাগজের ফুলের ন্যায় কৃত্রিম ব্যাপার। সাহিত্য স্থান কাল অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবে বিভিন্ন সত্যের উপলব্ধি করে ও বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সাহিত্যের সত্য ও সৌন্দর্য দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। এই পরিবর্তনশীল অনিত্য বাস্তবের মধ্যে নিত্যবস্তুকে লাভ করাই সাহিত্যে চরম সাধনা।

প্রমথ চৌধুরী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য বিচার করে বলেছেন — বস্তুতন্ত্রতার অর্থ যদি প্রত্যক্ষ, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত হয় তবে তার অভাবে দর্শন হয়, কিন্তু কাব্য হয় না। কারণ, কাব্য বস্তুজগতের স্বরূপকেই উদ্‌ঘাটন করে।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল প্রস্ফুটিত পদ্ম মৃণাল ও লতিকার উপর নির্ভরশীল। দুটিই বাস্তব।

প্রমথ চৌধুরীর মতে ব্যক্তি অবশ্যই সমাজ-নির্ভর, কিন্তু সমাজ ব্যক্তিমনের 'নিয়ামক-নক্ষত্র' নয়। ব্যক্তিমনের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার মূল্য আছে সাহিত্যে। তাই কবির মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়। সমাজ-জীবন ব্যক্তিমনের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও তার সৃষ্টি ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী প্রত্যেক কবির মন রসের স্বতন্ত্র উৎস। এই রস কবি আহরণ করেন আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে — সেই আধ্যাত্মিক জগৎ আমাদের সত্তার মূলে রয়েছে। তাই কবিমন কখনই কাল বা যুগের অধীন নয়। শিল্পকলা সাহিত্য মুক্ত আত্মার লীলা।

সাহিত্য-শিল্পের বাস্তবতাকে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বিষয়ের দামে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা চলে না। বহির্জগতে যাকে আমরা বাস্তব বলি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাকে সর্বদা ও সর্বত্র বাস্তব বলে স্বীকার করা যায় না। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তিনি বলেছেন—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,

ঘটে যা সত্য নয়। কবি, তব মনোভূমি

রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

অর্থাৎ, কবি তাঁর কল্পনার আলোকে ও আধ্যাত্মিক জগতের দীপ্তিতে জগতের যে অংশকে আলোকিত করেন তাই হল বাস্তব।

বাস্তবে নানা বাহুল্য, দ্বন্দ্ব ও বিক্ষিপ্ততা আছে। তাদের সংহত করতে পারলে মন তাকে গ্রহণ করে। "বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানব প্রকৃতি থেকে বাছাই করে সাজাই করে মানুষ আপনার একটি বিশেষ আনন্দলোক আপনি সৃষ্টি করে তুলেছে। দেশে দেশে কত কাব্য কত ছবি কত মূর্তি কত মন্দির তার এই সৃষ্টির অন্তর্গত।" বিশ্বের যেখানে আমাদের চিত্তের আলো বিশেষ করে পড়ে, সেখানেই বিধাতার সৃষ্টিকে রূপে-রসে-রঙে বরণ করে নিয়ে মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। রবীন্দ্রনাথের মতে এটিই হল বাস্তব।

কবি শিল্পী বিশেষ দেশে কালে বাস করেন, কিন্তু তাঁর চিন্ময় সত্তা জ্ঞানময় ও আনন্দময় লোকে প্রতিষ্ঠিত। কবির সৃষ্টি তাই যুগানুযায়ী হয়েও যুগাতীত।

কেবল প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণাই বাস্তবতার লক্ষণ নয়। রূপসৃষ্টির গুণে, নিত্যরসের আবেদনেই কাব্য স্থায়িত্ব লাভ করে লোকমানসে। বিষয়ের জন্য কাব্যের গৌরব নয়, বিষয় যখন বিশেষ রূপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে ওঠে তখনই তার প্রকৃত গৌরব স্বীকৃত হয়।

বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই বাস্তব ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের মতে, নিছক তথ্যের সমাবেশে বাস্তবের রূপ প্রকাশিত হয় না। কেবল বস্তুকে বা বিষয়কে নিয়ে রিয়ালিজম হয় না, বাস্তব প্রস্ফুটিত হয় রচনার যাদুতে। বিশেষ নির্বাচনের দ্বারা সাহিত্যে বাস্তব বিশুদ্ধরূপে আমাদের চেতনার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়।

কাব্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। কিন্তু রসের অবতারণাই সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। সাহিত্যে রূপসৃষ্টিই বড়ো কথা। রবীন্দ্রনাথের মতে নিছক তথ্যের সমাবেশে বাস্তবের রূপ প্রকাশিত হয় না। সাহিত্যের বাস্তবতা নির্বাচন সাপেক্ষে। বাস্তব হল মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাছাই করা জিনিস। যে-কোনো রূপ নিয়ে বা চেতনাকে স্পর্শ করে তা-ই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে এমন এক রূপ সৃষ্টি হয় যা মনকে জাগিয়ে তোলে ও ব্যাপ্তি দান করে। এই ব্যক্ত ও ব্যাপ্ত রূপ আনে অসীমের ব্যঞ্জনা। রূপস্রষ্টা কবি ও শিল্পী বাস্তবকে আমাদের চেতনার সামনে উপস্থিত করেন যখন, তখনই আমরা তার রূপ ও স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করি। এখানেই প্রকাশিত হয় সাহিত্যের বাস্তবতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কবির আছে অন্তরের অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদ। তিনি তাঁর সহজাত বেদনাময় চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন

করেন। নিখিলের সংস্পর্শে এসে যা তিনি অনুভব করেন তাই হল বাস্তব। কবি-শিল্পী তাঁর অন্তরের ধ্রুব আদর্শের আলোকে এই বাস্তবতার পরিচয় লাভ করেন। এর ফল আনন্দ এবং এই আনন্দ এবং এই আনন্দ অনির্বচনীয়।

অর্থাৎ কাব্যের বাস্তবতার প্রমাণ কবির নিজের মধ্যে এবং এই বাস্তবতা শিল্পীর মনের ভাব গ্রহণের উপর নির্ভর করে। এই সৃষ্টির সঙ্গে জাগতিক প্রয়োজনের কোনো সম্পর্ক নেই।

সৃষ্টির দুটি দিক আছে — একদিকে শিল্পীর আবেগ, যার ফলে বহির্জগতের উপাদান তিনি গ্রহণ করেন এবং অন্যদিকে তাঁর প্রশান্ত চিত্তে আবেগের চাঞ্চল্য সংহত করে তিনি রূপসৃষ্টি করেন।

সাহিত্যের বাস্তবতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, লোককে শিক্ষাদান করবার দায় সাহিত্যের নয়। সাহিত্য থেকে লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দেবার চিন্তা থেকে সৃষ্টি হয় না। কারণ, সাহিত্যের সৃষ্টির মূলে আছে আনন্দ। এই আনন্দ গ্রহণ করতে হলে সাধনার প্রয়োজন আছে। সকলেই তাই সাহিত্য শিল্পের রসিক হতে পারেন না। যিনি প্রকৃত রসপিপাসু তিনি যত্ন করে শিক্ষা করে এই রসলোকে প্রবেশ করে অপার আনন্দ অনুভব করতে পারেন।

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্যকে স্বীকার করেননি। আপাতদৃষ্টিতে যদি মনে হয় সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে, তবে তা নিতান্তই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। সৃষ্টির ন্যায় সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। "আনন্দই তাহার আদি-অন্ত-মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।"

সাহিত্যে কোনো লৌকিক বাস্তবতার দাবিকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নেননি। তাঁর মতে, যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্টতই চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু তার বিশিষ্টতা নিয়ে যদি দেখা দেয়, তবে তা-ই হল বাস্তব। বাস্তব হল জীবন-স্বরূপেরই প্রকাশ, তা কেবল বাহ্যিক রূপের ব্যাপার নয়।

৮.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

সাহিত্য বা কলা সৃষ্টিতে মানুষের চেষ্টাকে কেউ কেউ তার খেলা করা প্রবৃত্তির সঙ্গে এক করে দেখেন, তাঁদের মতে, খেলার মধ্যে প্রয়োজন সাধনের কোনো ব্যাপার নেই। খেলার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ অবসর বিনোদন। সাহিত্য এবং আর্টের উদ্দেশ্যও খেলার মতো। কিন্তু এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত ভিন্ন। তাঁর একান্ত নিজস্ব অভিমতকে তিনি তুলে ধরেছেন 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে।

মানুষের সত্তার একদিকে রয়েছে প্রাণধারণ অর্থাৎ টিঁকে থাকার ব্যাপার। সেজন্য মানুষের কতগুলি স্বাভাবিক বেগ-আবেগ রয়েছে। এর তাগিদেই মানুবশিশু শুয়ে শুয়ে হাত-পা নাড়ে, বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটোছুটি করে। এটি সে আপন প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা পায়। ছোটো বালিকার মধ্যে মাতৃভাবের প্রকাশ ঘটে তার পুতুল খেলায়। আসল কথা; প্রয়োজন সাধনের জন্য যেসকল প্রবৃত্তি নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি, সেগুলিই প্রকাশ পায় আমাদের খেলায়। এর মধ্যে কোনো কারসাজি নেই। তাই খেলাতেই খেলার শেষ হয়। খেলার মধ্যে আমরা যে জীবন-যাত্রার নকল দেখি তা মনুষ্যেতর প্রাণীর খেলাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত হয়।

কিন্তু সাহিত্যের প্রকাশ চেষ্টা অন্যরূপ। সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, কোনো প্রয়োজনকে নয়। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারে যা ঘটে, তাকে ব্যবহারের দায় থেকে মুক্ত করে কল্পনায় তাকে উপভোগ করা কখনোই সাহিত্যের লক্ষ্য হতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনের কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে সাহিত্যে যা ব্যক্ত হয় তা হল একটি সমগ্রবস্তু — তা মূল বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তা অনির্বচনীয়।

সৃষ্টি কেবল মানুষের প্রয়োজনকেই রূপায়িত করে তোলে না। তার দ্বারা প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন সাধনের মধ্যেই তার ভূমিকা নিঃশেষ হয় না, সাহিত্য প্রয়োজনের সীমাকে ছাড়িয়ে এক স্বতন্ত্র রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই সাহিত্য হল মানুষের লীলা, তা খেলা নয়।

আমাদের আত্মার মধ্যে আছে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ। তাই কথায়-ভাবে-রঙে-রেখায়-সুরে যখন আমরা সেই পরিপূর্ণ অখণ্ডকে লাভ করি, তখন তা আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্বিশ্বের মিলন ঘটায়। এই হল সাহিত্য-শিল্পের মিলনলীলা। এই মিলনের সুষমায় আমরা আনন্দিত হই। অরসিক মানুষ এই চরম এককে দেখতে পায় না বলেই সে উপাদানের দিক থেকে, প্রয়োজনের দিক থেকে সাহিত্য-শিল্পের মূল্য যাচাই করে।

আসলে জৈব পিপাসা ছাড়াও মানুষের আর এক ধরনের পিপাসা আছে। সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সেই পিপাসাকেই জাগায়। এই পিপাসা জৈব প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে এক আনন্দলোকের সন্ধান এনে দেয়। সেই আনন্দের অভ্যন্তরে রয়েছে প্রকাশের বেদনা, অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়ার বেদনা। সমস্ত নিখিলের অন্তরে আছে এই প্রকাশের বেদনা — মানুষের মধ্যে এই বেদনা যখন জাগে তখনই সৃষ্টি হয় শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত। তথ্যের সত্যকে ছাড়িয়ে সে তখন অপর এক অনির্বচনীয় সত্যকে প্রকাশ করে, যে সত্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, প্রতিষ্ঠিত হয় গভীর উপলব্ধির দ্বারা। সাহিত্য ও ললিত কলার কাজ প্রকাশ বলেই তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে সে আমাদের অন্তরে অসীমের আস্বাদনকে এনে দেয়।

সাহিত্যে, শিল্পে কোনো বস্তুর সত্যতা প্রমাণিত হয় রসের দ্বারা। অর্থাৎ, তথ্যান্তর্গত সেই বস্তুটি যখন সামগ্রিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐক্য লাভ করে, তখন আনন্দের মূল্যে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করে নেয়। তখনই সে তথ্যের বন্দন থেকে মুক্ত হয়ে রসের

সত্য লোকে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্য শিল্পে তথ্যকে ছাড়িয়ে সত্যে পৌঁছতে হলে চাই অনেক ঈশারা, অনেক কৌশল, অনেক ভঙ্গির। তথ্যের যথার্থতা নিয়ে সমস্ত তর্ক এখানে হারিয়ে যায়।

'বাস্তব' প্রবন্ধেও এই রস-সাহিত্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন।

রস-সাহিত্যের বাস্তবতাকে প্রমান করা অসাধ্য ব্যাপার। কেননা, তা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার। একমাত্র রসিকের উপলব্ধিতেই রসের সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো তাকে রসায়নাগারে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা দুঃসাধ্য।

যাঁরা সাহিত্যে বাস্তবতার সন্ধান করেন তাঁদের মতে রসপদার্থ বস্তুকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। রসের আধার অবশ্যই আছে। যে হল সহৃদয়ের মনের প্রতীতি। কিন্তু তথ্যের পরিমাণ বিচার করে সাহিত্যের মূল্য পরিমাপ করা হয় না।

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা অর্থাৎ চিরন্তনতা আছে। কিন্তু বস্তুর মূল্য পরিবর্তনশীল। রস কখনই বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। সাম্প্রতিক বিষয় অনেক মানুষের মনকে অধিকার করে। কিন্তু তাকে সাহিত্যের নিত্যবস্তু বলা যায় না। ইংলন্ডে সাম্রাজ্যবাদ একদা একদল কবির কাব্যে রক্তবর্ণ বাস্তবতা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে এর মূল্য অবসিত হয়েছে।

আসলে যে তথাকথিত বাস্তবতার কথা আমরা বলি তা এক সাময়িকতা। সে সাম্প্রতিকতার হুজুগ কেটে যাওয়া মাত্রই তার বাস্তবতার তীব্রতা ম্লান হয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল বাস্তব— সাহিত্যর বাস্তব, সাহিত্যের সত্য তা থেকে পৃথক বস্তু। নিত্যরসের গুণে বাস্তবের প্রতিষ্ঠা যে সাহিত্যে, সেই সহিত্যেই চিরন্তন।

ইংরেজি শিক্ষা আমাদের জীবনকে সঞ্জীবিত করে বাস্তবতাবোধকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাহিত্য থেকে মানুষ কিছু শিক্ষার আশা করে। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় অভিমত — "কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় না।" অর্থাৎ, সাহিত্যের সঙ্গে লোকশিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। সাহিত্য লোক-শিক্ষাদানের কোনো আয়োজন করে না। সাধারণ মানুষ 'রামায়ণ'-'মহাভারত' পড়ে, তার কারণ এই নয় যে এখানে সাধারণ মানুষের দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবনের বর্ণনা আছে। জীবনের বৃহৎ পরিচয়, মহৎ পরিচয় এখানে আছে, তাই তার মধ্যে লোকে আকর্ষণ অনুভব করে।

সাহিত্য যদি রসগুণে সমৃদ্ধ হয়, তবে তা সর্বকালের মানুষের আনন্দের জন্য সঞ্চিত থাকবে।

ভালো জিনিসকে আপন উপলব্ধি দিয়ে গ্রহণ করার জন্য সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনায় ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচের ভেদ নেই। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের যে ভেদ, তা সামাজিক ব্যবস্থার বিষয় — এর দায়িত্ব সাহিত্যের নয়। এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে একটি কথাই আছে, তা হল আনন্দ।

রসপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই — তার সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন — একমাত্র তিনিই এই আনন্দলোকে, এই রসলোকে প্রবেশ করতে পারেন।

কবির অন্তরে আছে অনুভূতি ও আত্মপ্রসাদ। তিনি তাঁর বেদনাময় চৈতন্য নিয়ে বিশ্বজীবনকে ও মানবজীবনকে উপলব্ধি করে তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলেন। নিখিলের সংশ্রবে এসে যা তিনি উপলব্ধি করেন তা হল বাস্তবতা। সাহিত্যিকের ও শিল্পীর অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে, তার উপর তিনি নির্ভর করেন। এই আদর্শ আনন্দের, সুতরাং তা অনির্বচনীয়।

কোলাহল মুখরিত জনতার প্রাঙ্গণে নেমে এসে শিল্পী আদি যদি তাদের ফরমাশ খাটতে চান তবে তাঁর সৃষ্টি হাটের সামগ্রীতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকের আত্মানুভূতির আনন্দই শেষ কথা। অপরের কাছে তা বাস্তব বা সত্য না হলেও তা শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে একান্ত বাস্তব। তাঁর অনুভূতির মধ্যেই সে সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত।

কথায় আছে "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ" — মানুষের ভিন্ন রুচি, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তার জন্য সাহিত্যের বিচারও সর্বদা একই রকম হতে পারে না। আবার শিল্পী-সাহিত্যিকদের আত্মনুভূতির উপাদানও সর্বদা প্রকাণ্ড বিশুদ্ধ হতে পারে না। বিভিন্ন কারণে তা আবৃত হয়, বিকৃত হয়, কখনো প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে নিতান্ত সাম্প্রতিক উত্তেজনাকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প-সাহিত্য সাময়িক মনভোলানোর কাজ সারে। এই সাহিত্যে সাময়িক বাস্তবতার দাবি থাকতে পারে, কিন্তু চিরন্তন সত্য এতে পাওয়া সম্ভব নয়।

৮.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৮.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ- ৯
সাহিত্যের পথে
সাহিত্যের পথে : নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা - ৩

বিষয় বিন্যাস

৯.০ ভূমিকা (Introduction)
৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৯.২ নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা
    ৯.২.১ সাহিত্যতত্ত্ব
    ৯.২.২ সাহিত্যের তাৎপর্য
৯.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৯.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৯.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৯.০ ভূমিকা (Introduction)

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সঙ্কলিত 'সাহিত্যতত্ত্ব' এবং 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধদুটি ১৩৪১ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যেমন গভীর, তেমনি মৌলিক। সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে তিনি ভাবনা-চিন্তা করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মগত কথা হল বহু বিচিত্র বিরোধর মধ্যে ঐক্য, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন। এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথ অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ নানাভাবে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় এসেছে। 'সাহিত্য' বলতেও তিনি মিলন বা ঐক্যকে বুঝেছেন, তবে এই সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ মৌলিক। তাঁর মতে 'সাহিত্য' শব্দের তাৎপর্য হল হৃদয়ের যোগ। এই মিলনকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে উপলব্ধি করে তিনি বিশাল বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলন ইচ্ছার প্রকাশকে বলেছেন সাহিত্য। তাঁর মতে বিশ্বের সঙ্গে আত্মার ওই মিলনের কাজটি সম্পূর্ণ হয় কল্পনা শক্তির সহায়তায়। এই মিলন প্রয়োজন-নিরপেক্ষ। মানুষ নিজের চারদিকে বিকিরণ সৃষ্টি করে, নিজেকে বাইরে বাড়িয়ে ছাড়িয়ে চলেছে। যে-মানুষ নিজের অবস্থায় সংকীর্ণ ও সীমিত, সেই মানুষই ভাব সৃষ্টির দ্বারা নিজের বিস্তার রচনা করে সংসারের পাশে আর একটি দ্বিতীয় সংসার রচনা করছে, — সেটিই সাহিত্য। প্রয়োজনের জিনিসকে অপ্রয়োজনের করে তোলার এই স্বভাবটিই সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

'সাহিত্য-তত্ত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়।

আমাদের জানা দুই রকম — জ্ঞানে জানা ও অনুভবে জানা। অনুভবে জানার অর্থ অন্য কোনো কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠার বোধ — অর্থাৎ অন্তরে নিজের মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের যোগে বিশেষ রূপে-রসে নিজেকে বোধ করাই হল অনুভব।

সাহিত্য-শিল্পের লক্ষ্য হল উপলব্ধির আনন্দ। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হওয়ার আনন্দ। এখানে মানুষ নিজের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যায়। প্রয়োজনের চাপে থেকেও মানুষ অপ্রয়োজনের আনন্দকে খোঁজে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে — এখানেই তার গৌরব, ঐশ্বর্য ও আনন্দ। এই আনন্দ দান করা ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

অনেকের মতে সাহিত্য যে আনন্দ দেয়, তা সৌন্দর্যের আনন্দ। এই বিষয়টি বিচারযোগ্য। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। সৌন্দর্যের রস আছে বলা গেলেও সব রসেরই যে সৌন্দর্য আছে তা বলা যায় না। সৌন্দর্য রস ও অন্য রসের মধ্যে মিল হল যে সবই আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। রস-মাত্রেই তা তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে ছাড়িয়ে যায়। রস-বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মুহূর্তেই মিলিত হয়। রস-সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য সুন্দরকে প্রকাশ করা নয়, আমাদের নিবিড় উপলব্ধির যে আনন্দ তাকে প্রকাশ করা।

আমাদের প্রকাশের ভাষা দুই শ্রেণির — একটিতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদবহনেই তার সমাপ্তি ঘটে। অপরটিতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যে। নিত্য প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় যে আবদ্ধ হতে পারে না। তার মধ্যে আছে সমগ্রতা, আছে চিরন্তন গৌরব। — একেই আমরা বলি সাহিত্য। ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পর পরস্পরের মনোভাব বিচিত্র তথ্যের আদান প্রদান করতে পারি। সাহিত্যের মধ্যেও আছে মিলনাকাঙ্ক্ষা। নানা প্রয়োজনেও আমরা মিলিত হই আবার মিলনের জন্যও আমরা মিলিত হই — এই অপ্রয়োজনের মিলনই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এর থেকেই বোঝা যায় যে সাহিত্যের কাজ হল হৃদয়ের যোগ ঘটানো — যেখানে যোগটাই শেষ কথা। কামনার দ্বারা সাহিত্য আস্বাদন করা সম্ভব নয়। নিজেকে ভুলতে না পারলে মিলন সম্পূর্ণ হয় না। বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবার যে বাসনা তাই সাহিত্য। এই মিলন সম্ভব হয় কল্পনা-শক্তির সাহায্যে। এই মিলন অনুভবের ব্যাপার। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বিশাল পটভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, তখনই মিলন হয় বাধাহীন ও বিশুদ্ধ। মানব জীবনের ঘটনাগুলি অসংলগ্ন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কিন্তু কল্পনার দ্বারা আমরা ঘটনার সমগ্রতাকে দেখতে পাই। বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা, যে ত্রুটি — সাহিত্যের মধ্যে যখন সামগ্রিক বিচারে তাকে আমরা দেখি তখন সেই সব কিছুকে ছাপিয়ে যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কল্পনার দ্বারা শিল্পী সাহিত্যিক বাস্তবের অসম্পূর্ণতাকে এমনভাবে রূপায়িত করেন যে তা আমাদের একান্ত হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে মনকে আনন্দে আপ্লুত করে তোলে।

'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ এরূপেই সাহিত্যের বিচিত্র ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বর্তমান আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ দুটি নিয়ে আলোচনা করেছি। এর দ্বারা আপনারা জানতে পারবেন —

- সাহিত্য শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল মিলন। এই মিলন আপন আত্মার সঙ্গে বিশ্বের। এই মিলনের ভাবটির প্রকাশরূপ হল সাহিত্য।
- সাহিত্যের জগৎ জ্ঞানের জগৎ নয়, তা ভাবের জগৎ।
- সাহিত্যের লক্ষ্য হল উপলব্ধির আনন্দ।
- সাহিত্য আমাদের বাস্তব-জীবনের প্রয়োজন-নিরপেক্ষ সৃষ্টি — তার জগৎ অপ্রয়োজনের। তার রস অহেতুক।
- আনন্দ দান করা ব্যতীত সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।
- সাহিত্যের আনন্দ কেবল সৌন্দর্যের আনন্দ নয়। কেননা সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু সব রসের সৌন্দর্য নেই।
- রসের উজ্জ্বলতা থেকে সাহিত্য সৃষ্টি হয়।
- আসলে সাহিত্যে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ তা সমস্ত লৌকিক সীমানা অতিক্রম করে চিত্তলোকে এক অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতিকে জাগায়।
- সাহিত্যের মধ্যে আছে প্রকাশ। এই প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। এই ভাষার দুটি রূপ — একটিতে প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটে। আশু ফললাভেই তার সিদ্ধি ও পরিণতি। অপরটি হল নিত্যকালের ভাষা। এর প্রকাশের পরিণাম নিজের মধ্যে।
- ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও দুটি দিক আছে — মানুষ তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-অনুরাগ-বিরাগকে ব্যক্ত করে। এর ব্যবহারিক দিকটি বাস্তবের ঘটনা সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সাহিত্যে এই সুখ-দুঃখ-অনুরাগ-বিরাগ কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কেননা তা সহৃদয়ের অনুভূতিতে সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করে।
- বাস্তব জগতে যে ঘটনা ঘটে তা অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সাহিত্যে আছে সামগ্রিকতা।
- কল্পনাশক্তি সামগ্রিকতাকে ও ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলে। কেননা, কল্পনা শক্তি বহু বিচিত্রকে সমন্বিত করে এক সামগ্রিকতাকে রূপায়িত করে। এই সামগ্রিকতার সঙ্গে মিলে যাবার যে আনন্দ তা অনুভূতির।

- সাহিত্যে যে রসের কথা বলা হয়, অনুভূতির বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। রূপ রসের পরিচয় দেয় এবং রস বস্তুর স্বরূপকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়।

আলোচিত প্রবন্ধে আপনারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-তত্ত্ব-আলোচনার এই বিভিন্ন সূত্রগুলিকে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন। আসুন, আমরা বর্তমানে সেই আলোচনায় প্রবেশ করি।

৯.২ নির্বাচিত প্রবন্ধের আলোচনা

এবার আমরা 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের নির্বাচিত প্রবন্ধ — 'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য' নিয়ে আলোচনা করব।

৯.২.১ সাহিত্যতত্ত্ব

'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিখিত ভাষাণরূপে পাঠ করেছিলেন। পরে ১৯৩৪ সালেই প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বের হয়। এর পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংযুক্ত হয়।

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক চিন্তাই রবীন্দ্রনাথ :

সাহিত্য চিন্তা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। জীবনের দীর্ঘ সময় নিয়ে তিনি সাহিত্য-শিল্পের নানা তত্ত্বগত প্রশ্ন সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে কৌতূহলী ছিলেন। বলা যায় সাহিত্যতত্ত্বচিন্তা কবির সারাজীবনের সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্বমূলক চিন্তা-ভাবনা তাঁর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত ভাষণে ও চিঠিপত্রে বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে আছে। 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটিতেও এই তত্ত্বভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে।

সাহিত্যতত্ত্ব রসসাহিত্য নয়; তা যুক্তিনিষ্ঠ, মননমূলক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে আমরা কেবল যুক্তিনিষ্ঠতা পাই না, তাঁর দর্শনচিন্তা, ধর্মভাবনা, তাঁর জীবনবোধ, তাঁর উপলব্ধি বিশ্বের সঙ্গে মিলে এই তত্ত্বভাবনা এক অন্যতর উপলব্ধি নিয়ে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসার মূল বিষয় হল সাহিত্য-সৃষ্টি এবং এর সারতম সত্য হল আনন্দ। এই আনন্দ মিলনের আনন্দ। কবির গানে আছে —

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো।
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।।"

এই মিলনের আনন্দই সাহিত্যের আনন্দ। এই আনন্দ বিশ্ববিষয়ের সঙ্গে পাঠকের মিলনের আনন্দ, বিষয় ও বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়ার আনন্দ। এই এক হয়ে যাওয়াই মানুষের স্বধর্ম এবং এর আস্বাদনের নামই আনন্দ। এর থেকে যুগপৎ আত্মানুভব এবং বিশ্বানুভব হয়।

তবে রবীন্দ্রনাথের মতে, আনন্দ দুঃখের বিপরীত নয়, তা হল জীবনের সব রকমের আস্বাদন।

আনন্দ ও মিলন পৃথক বস্তু নয়, তেমনি সৃষ্টিও পৃথক নয়। সৃজন আনন্দময় এবং আনন্দ সৃজনধর্মী। অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে আছে প্রকাশের আনন্দ। মানুষমাত্রেই সৃষ্টিকর্তা। সাহিত্য মানুষের এই বাধাহীন সৃষ্টির প্রকাশের মুক্তি।

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টা তার নিজত্বের গণ্ডীকে অতিক্রম করে নিজেকে বিস্তৃত করে, অপরের সঙ্গে মিলিত হয় কল্পনার সাহায্যে, ভালোবাসার শক্তিতে, মানব-স্বভাবের তাগিদে। ব্যবহারিক জগতে প্রয়োজনের বাধার জন্য এই মিলন এই মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্য মানুষের মধ্যে এই মুক্তিকে এনে দেয়।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম কৰে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়; যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ; তারই মধ্যে। সেখানই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য।"

কবির মতে, সৃজনশীলতাতেই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। এর মধ্য দিয়েই মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে।

মানুষের দুটি পরিচয় আছে। একদিকে সে প্রয়োজনের জগতে আবদ্ধ জীবমাত্র— সেখানে তার দৃষ্টি খণ্ডিত, আবৃত, আবিল। অপরদিকে সে মানুষ, সে শিল্পী তার সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিই শিল্প দৃষ্টি। এই রূপে সে মুক্ত, সহজ। এই দৃষ্টিতে সে যা দেখতে পায়, তা-ই সত্য, এই সত্য কেবল শিল্পদৃষ্টি দিয়েই দেখা সম্ভব। কেননা সত্য অখণ্ড, সমগ্র। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সত্য সর্বদাই অনুভূত সত্য, শিল্প-সাহিত্যে এই অনুভূত সত্যকেই আমরা পাই।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব চিন্তার ক্ষেত্রে কবি সাহিত্যিকে আর্টের প্রতিনিধি হিসাবেই বেছে নিয়েছেন, তাই তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব চিন্তা আসলে শিল্পতত্ত্বচিন্তা রূপেই গণ্য করা যায়।

সাধারণত আমরা যাকে নন্দনতত্ত্ব বলি, রবীন্দ্রনাথ তাকেই সাহিত্যতত্ত্ব বলেছেন। তাঁর মতে সব শিল্প-সাহিত্যের মূল কথাই হল সাহিত্যতত্ত্ব— অর্থাৎ মিলনসাধন। শিল্প-সাহিত্য যে মিলন-ঘটায়, তা আনন্দময়। একেই তিনি বলতে চেয়েছেন প্রেম-অমৃত। এই প্রেমামৃতের মধ্য দিয়েই মানুষ প্রকৃত সত্যকে লাভ করতে পারে, কারণ শিল্প সাহিত্যের সত্য বিষয়গত বা বস্তুগত নয়, তা অনুভূত সত্য।

আমাদের জানা দুই ধরনের — জ্ঞানে এবং ভাবে। জ্ঞানে আমরা বিষয়কে বা বস্তুকে পাই, পূর্ণতাকে পাই না। রবীন্দ্রনাথের মতে ভাবের জানাই প্রকৃত জানা। এই জানাতে বিষয় এবং বিষয়ী একাত্ম হয়ে যায়। এটি একই সঙ্গে জানা, পাওয়া এবং হওয়া। একে কবি বলেছেন উপলব্ধি। উপলব্ধি মধ্য দিয়ে আমরা সত্যকে লাভ করি এবং নিজেও সত্য হয়ে উঠি। এটি সমগ্র সত্তার অখণ্ড সক্রিয়তা। তাই কবির মতে — "সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" সাহিত্যের পথ বিষয়-বিষয়ীর মিলনের পথ, সাহিত্যের সাধনা সত্যের সাধনা, সাহিত্যের জগৎ উপলব্ধির জগৎ।

উপলব্ধির জগতে ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ, সুন্দর-অসুন্দর সাদা-কালো সকলই রয়েছে। এই পথেই বিচিত্রের সঙ্গে মিলন সাধিত হয় এবং এই মিলনেই আনন্দ। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যায়; এক বহু হয়, বহুর মধ্যে নিজেকে অর্জন করে। সাহিত্য তাই লীলা। মানুষের বাধাহীন বিচিত্রবৃহৎ লীলার জগৎ হল সাহিত্য।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ :

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের মূল উৎস মানুষ সম্পর্কিত ধারণায়। তাঁর মতে মানুষ স্বরূপতই শিল্পী, যে সৃজনধর্মী। সৃজনশীলতাতেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ এবং এখানেই সে স্বতন্ত্র, এখানেই তার মুক্তি। শিল্প-সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মানুষ স্বধর্মকে প্রকাশ করে।

মানুষের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা তাই তার সৃষ্টি যে শিল্প-সাহিত্য, সে-ও অসীম সম্ভাবনাময়। তাই শিল্প-সাহিত্যের কোনো পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম নেই, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই; কেননা তা সৃষ্টিধর্মী।

সাহিত্য হৃদয়ের আনন্দকে ব্যক্ত করে, আনন্দই এর কারণ ও উদ্দেশ্য। সাহিত্য হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ ও প্রসারিত করে।

'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটির শুরুতেই কবি 'আমি' এবং 'না-আমি'র অচ্ছেদ্য যুগ্মতা সম্পর্কে বলেছেন —

"আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগমিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করিনে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তা-বোধও তত জোর পায়। ... আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে, তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছে' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।"

'আমি আছি' এই বোধটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা। এই বোধের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেকে জানি, নিজেকে পাই, আমাদের আত্মোপলব্ধি ঘটে। এই আত্মোপলব্ধির দ্বারাই আমরা আনন্দিত হই। অর্থাৎ এই

সত্তাবোধকেই কবি বলেছেন আনন্দ। এই আনন্দ একদিকে আত্মোপলব্ধির আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি মিলনের আনন্দ। নিবিড়তম শুদ্ধতম এই মিলন বাধাহীনভাবে ঘটে সাহিত্যে। কবি বলেছেন — "আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমানে জীবনের আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।" সাহিত্যে তাই নিবিড় বোধের দ্বারা সীমাতীতকে উপলব্ধি করার আনন্দকে লাভ করা যায়। সাহিত্যে বৃহত্তর ঐক্যবোধের মধ্যে মানুষ তাই আত্মার ঐশ্বর্যকে অনুভব করে এবং মিলনের প্রেরণায় নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে।

সৃষ্টি মানেই হল প্রকাশ— প্রকাশই সাহিত্য শিল্পের বিশেষ পরিচয়, প্রকাশেই তার প্রকৃত সার্থকতা। এই প্রকাশ হল জগৎ-সত্যের মধ্য দিয়ে আত্ম-সত্যের এব আত্মসত্যের মধ্য দিয়ে জগৎ-সত্যের রূপায়ণ। এর মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে স্রষ্টা যোগ যুক্ত। বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল মানুষ আর প্রকৃতির ঐক্যই বিশ্বাসী নন, তিনি 'আমি' এবং 'না-আমি'র ঐক্যেও বিশ্বাসী। এই 'না-আমি' কেবল বহিঃপ্রকৃতি নয়, আমার বাইরে যা কিছু আছে সেই সকলই এই 'না-আমি'।

'না-আমি'র সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েই মানুষ সত্য হয় এবং সত্যকে লাভ করে। এখানে আনন্দে আর সত্যে কোনো ভেদ নেই। সাহিত্যের লক্ষ্য সমগ্র এবং সেই সত্যলাভের আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন — "আমাদের অন্তঃকরণে যত কিছু বৃত্তি আছে যে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নাহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না।" আর 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে কবি বলেছেন —

"আমাতে যে এক আছি সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।"

যে অনুভূতি আমাদের যত বেশি নাড়া দেয়, সেই অনুভূতি ততই আমাদের চিত্তের অসাড়তাকে দূর করে, আমাদের সত্তাবোধকে ততই স্পষ্ট করে উজ্জ্বল করে তোলে। দুঃখ এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে নেতিবাচক দিক থেকে দেখেননি। তাঁর মতে — "সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দের অন্তরভূত।" কবির মতে, যেহেতু দুঃখের অনুভূতি প্রবল, নিবিড়, গভীর তাই তার মধ্যেই আমরা আমাদের সত্তাকে নিবিড়ভাবে, প্রবলভাবে, তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পারি। সেজন্যই সাহিত্যে দুঃখ আমাদের কাছে বিশেষভাবে

আকর্ষণীয়। আমাদের ব্যবহারিক জৈবজীবনে দুঃখ ক্ষতিকর, তাই প্রয়োজনের জগতে তাকে আমরা এড়িয়ে চলি। আর সাহিত্যের জগতে দুঃখের ক্ষতিকে এড়িয়েই আমরা দুঃখকে আস্বাদ করি।

জগতকে জীবনকে আমরা দুইভাবে জানি জ্ঞানে এবং অনুভবে। জ্ঞানে আমরা বিষয়ে জাতি অর্থাৎ তথ্য লাভ করি। এ-জানা খণ্ডিত, অনুভূতি বর্জিত — এর দ্বারা পূর্ণ সত্যকে লাভ করা যায় না। এ-জানায় বিষয়-বিষয়ীর মিলন ঘটে না।

কিন্তু অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা। অর্থাৎ অনুভূতির দ্বারা আমাদের তথ্য-জ্ঞান হয় না — এখানে বিষয়-বিষয়ীর মিলন ঘটে, বিষয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে লাভ করি। এটিই মানুষের যথার্থ সত্য লাভ— কারণ এহল মিলনের সত্য। সাহিত্যে আমরা এই সত্যকে, এই উপলব্ধির আনন্দকে পাই।

মানুষের একদিকে আছে প্রয়োজনের দাবি। সেখানে সে প্রয়োজনের দাস জীবমাত্র। এই ব্যবহারিক জগৎ আমাদের মনকে বৈষয়িক সংকীর্ণতায় বেঁধে রাখে, আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে। এই প্রয়োজনের জগতে মানুষের কামনা তৃপ্তিহীন। অসংখ্য চাওয়া ক্রমাগত তার মনকে সংকীর্ণ করে তোলে।

কিন্তু মানুষ কেবল জৈবতার দাস নয় — তার মধ্যে একটা প্রাচুর্য আছে যা পূর্ণতার অভিমুখি। নিত্য কামনার হাঁফ-ধরা গণ্ডীর মধ্যে থেকে তাই মানুষ অবকাশের ফাঁক খোঁজে। সাহিত্য মানুষের এই অবকাশের লীলা, অপ্রয়োজনের আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস যে অহৈতুক মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।"

সাহিত্যের মিলন অনুভবের পথে মিলন। এই মিলন স্বার্থ সম্পর্কহীন বলেই তা অবাধ মিলন, আনন্দের মিলন। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন প্রেম। সাহিত্যের মিলন এই প্রেমের মিলন।

যতক্ষণ পর্যন্ত অহং আমাদের অধিকার করে থাকে ততক্ষণ এই মিলন সম্ভব নয়। নিজেকে অপরের সঙ্গে মেলাতে হলে এই অহংকে দূর করতে হয়। যে শক্তির দ্বারা এই অহং অপসৃত হয় কবি তাকে বলেছেন কল্পনা।

'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনার আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা।" কল্পনার ভাষা কবির মতে তা-ই হৃদয়ের ভাষা, অনুভূতির ভাষা, নিত্যকালের ভাষা। কল্পনাই বিশ্বের সঙ্গে

আমাদের মিলন ঘটায়। বলা বাহুল্য, কল্পনা অর্থে রবীন্দ্রনাথ imagination কে বোঝাননি, তাঁর মতে কল্পনা হল সহমর্মিতা। এই সহমর্মিতার দ্বারাই বাহিরের বিচিত্রের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা স্থাপিত হয়। এই মিলন এই একাত্মতার দ্বারাই আমরা আনন্দ লাভ করি। অনুভূতির গভীরতার দ্বারা বাইরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মতা যত নিবিড় হয়, সেই পরিমাণে জীবনের আনন্দের পরিধি বিস্তৃত হয়। এই হল সত্তার বিস্তার।

বিষয়ী মানুষ প্রয়োজনের গণ্ডীতে বাঁধা থাকে, তার আত্মার তাই ব্যাপ্তি ঘটে না।

পৃথিবীতে প্রয়োজনের দাবি অত্যন্ত প্রবল। মানুষের অভাব মোচন হলেও তৃপ্তিহীন কামনা তাকে বিক্ষুব্ধ করে। কিন্তু, তবুও মানুষ অপ্রয়োজনকে বেশি মূল্য দেয়। কবি বলেছেন — "সংসারের সকল বিভাগেই এই যে 'চাই চাই' এর হাট বসে গেছে এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে সেখানে তার মন বলে 'চাইনে', অর্থাৎ এমন কিছু চাই নে যেটা লাগে সঞ্চয়। তাই দেখতে পাই, প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে যে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।" কারণ এখানেই মানুষ তার আপন চরিতার্থতা খুঁজে পায়। বিশ্বসৃষ্টি যেমন বিধাতার ঐশ্বর্যের স্বাভাবিক আনন্দময় প্রকাশ, তেমনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষও কেবল সৃষ্টি সুখের উল্লাসেই সৃষ্টি করে; সেখানে কোনো উদ্দেশ্যের প্রণোদনা নেই। এই সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সে নিজেকে প্রকাশ করে। এই প্রকাশের দিক বা আনন্দের দিকটি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

তাই কবির মতে "বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক।" সাহিত্যে তাই প্রেমের আলোকে আমার আত্মার ঐশ্বর্যকে লাভ করি। এই আনন্দ অহৈতুক। সাহিত্য যে বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্র রচনা করে সেখানে কল্পনা বিশ্বকে নতুন পরিচয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করে। সেখানে তাকে আমরা আমাদের অনুভূতির মাধ্যমে জানি। এই উপলব্ধিতেই আনন্দ। আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

সাহিত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের একটি ব্যাপার জড়িত আছে। কিন্তু সৌন্দর্যের আনন্দ কিনা তা বিচারযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যরহস্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুরূহ ব্যাপার। বাহ্য জগতে সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে। এই সুন্দর-অসুন্দর কতগুলি তথ্যকে অধিকার করে থাকে। যে-জিনিস এই তথ্যকে অতিক্রম করে এক ঐক্যতত্ত্বের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকতা লাভ করে, তাকেই বলা হয় সুন্দর। যেমন গোলাপ তার বর্ণগন্ধ বৃণ্ড-পত্র সবকিছুর পরস্পর সামঞ্জস্যে এক সামগ্রিক রূপ লাভ করে, তখন সে আর একটি পদার্থ বা তথ্যমাত্র নয় — তথ্যকে ছাড়িয়ে সে একটি ঐক্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে — তাই তাকেই মারা বলি সুন্দর, সেই হয়ে ওঠে সত্য। কিন্তু যে জিনিস তথ্যকে অতিক্রম করতে পারে না— সে সুন্দর নয়, সত্যও নয়।

অর্থাৎ, সৌন্দর্যের মধ্যে আছে এক গভীর সুষমা, এক নিবিড় ঐক্য। এই সৌন্দর্যের বোধ জিনিস নয়, এ হল গভীর অনুভূতির। এই অনুভূতির দ্বারাই তথ্যকে অতিক্রম করে আমরা নিবিড় সৌন্দর্যকে, গভীর সত্যকে উপলব্ধি করি।

বিজ্ঞান তথ্যের অনুসন্ধান করে; জ্ঞানের দ্বারা সে তথ্যকে জানে; তাই জ্ঞানের আনন্দ কেবল পাওয়ার আনন্দ। কারণ, সেখানে জ্ঞান ও জ্ঞানী বিষয় ও বিষয়ী পৃথক। কিন্তু সাহিত্যের আনন্দ কেবল পাওয়ার আনন্দ নয়, তা হওয়ার আনন্দ, সে আনন্দ আপন সত্তাকে বিকশিত করে। তাই বিখ্যাত এক চিত্রকর বলেছেন — "Who paints a figure, if he cannot be it, cannot drerwif." ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রীরা বলেছেন — বাক্যং রসাত্মক কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে, যে বাক্য সুন্দর হয়ে রসের দ্বারা আমাদের আকৃষ্ট করে তাকেই আমরা কাব্য বলি। কিন্তু সকল রসই সুন্দর নয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন — "সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে।" অর্থাৎ রস বস্তুকে অবলম্বন করে বস্তুর অতীত এক পরম ঐক্যবোধ জাগ্রত করে আমাদের চেতনায়।

জন্মগতভাবে শিল্পীমানুষ কেবল রূপের পূজারী নয়, সে রসেরও পূজারী। তাই প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সে শিল্পিত করে, সুন্দর করে। এভাবেই প্রয়োজনের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে সে ব্যবহারিক সামগ্রীর মধ্যে অপ্রয়োজনের আনন্দকে প্রবাহিত করে। এখানেই সে প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণের নিশ্বাসের অবকাশ রচনা করেছে। এখানে সে প্রয়োজনের দাসত্ব না করে প্রকাশের লীলায় মগ্ন হয়েছে। এখানে সে মানুষ্যেতর অপরাপর প্রাণী থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে ঘোষণা করেছে। এই স্বাতন্ত্র্যেই তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। মানুষ তার অনুভূতির আনন্দ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। সাহিত্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

হৃদয়বোধের একদিকে আছে আত্মরক্ষার জন্য কর্ম। এখানে পশুর সঙ্গে মানুষের মিল আছে। এখানে আছে মানুষের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতি যখন কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন যে আনন্দ আমরা লাভ করি তা উপভোগের বিষয়। এখানে মানুষের সকল সীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বাস করে বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে। এক্ষেত্রে লৌকিক জগতের পরিমাণ ও সীমাবদ্ধতাকে রক্ষা করা যায় না। অর্থাৎ, কল্পনাই অতিশয়োক্তির জন্ম দেয়। ব্যবহারিক জগতের বাস্তব একে বলা যায় না হয়তো, কিন্তু সে সত্য — হৃদয়রে অনুভূতির দ্বারা সে সত্য। অতিশয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "... আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিক ঠাক করে বলা যায় না, শব্দের নির্বাচনে, ভাষায়, ভঙ্গিতে, ছন্দের ইশারায় এমন কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে গিয়ে ঠেকে সেইখানে সেটা অতিশয়।"

ফ্যাক্টকে বা তথ্যকে অতিক্রম করেই অতিশয়তার দ্বারাই মানুষের অনুভূতি সত্য হয়ে ওঠে, এই সত্য সৌন্দর্যের রূপে প্রকাশিত হয় এবং সৌন্দর্য লৌকিক সীমা অতিক্রম করে।

জৈবিক দিক থেকে যতখানি সত্য মানুষের বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি, মানুষের ক্ষুধা প্রবৃত্তি, উপলব্ধির দিক থেকে ততখানি সত্য মানুষের শিল্প সংস্কৃতি ক্ষুধা, মানুষের প্রকাশের ইচ্ছা। কবি বলেছেন —

"আমাদের পেট ভারবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা; মানুষের শূন্য ভারাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। ... তার কৃষ্টির ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায়; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যে— এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলেছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে।"

এই আনন্দ শিশুকাল থেকেই পেয়েছে রূপকথায় ছড়ায়। রূপকথা, ছড়াব অলীক জগতে সেও নিজকে মনে মনে করে তুলেছে একজন— এখানেই তার মন লীলায়িত হয়ে উঠেছে, সে হয়েছে আনন্দিত।

সাহিত্য শিল্প যে আনন্দ দেয়, সেই আনন্দ সৌন্দর্যের আনন্দ কিনা তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। সৌন্দর্যের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সৌন্দর্য প্রয়োজনের অতীত, তাই তার ঐশ্বর্য স্বীকৃত। তিনভাবে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায় — ইন্দ্রিয়, হৃদয়ভাব ও ধর্মবোধ।

ইন্দ্রিয়লব্ধ সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ। এই সহজ সৌন্দর্য মানুষের অভিজ্ঞতার প্রাথমিক স্তর। যেমন ফুল, পাখি ইত্যাদি সুন্দর। কবি এই সৌন্দর্যকে বলেছেন 'একতালাওয়ালা' সৌন্দর্য, কারণ — "এর মধ্যে সদর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমিষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না।" কিন্তু সৌন্দর্য যেখানে হৃদয়কে অধিকার করে, তখন সেখানে ঘটে ভাবের সৃষ্টি সেখানে সুন্দর দেখা দেয় মনোহর রূপে। কবির মতে — "এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রর ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়।"

বাস্তব জগতে তাই সুন্দরের কোঠা সংকীর্ণ। কিন্তু সাহিত্যের জগৎ মানুষের লীলার জগৎ, অনুভবের জগৎ। এখানে কোনো সত্যের প্রবেশ বাধিত নয়। এই জগৎ আমাদের কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা সৌন্দর্যের সংবাদমাত্র দেয় না; আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই বিশেষ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে — তখন সে হয় অভূতপূর্ব, হয়ে ওঠে মনোহর। তখনই এই মনোহরণের অনুভূতি হয়ে ওঠে সুদূর প্রসারিত। অর্থাৎ আমাদের অনুভূতির বাইরে সৌন্দর্য তখন তথ্যকে আশ্রয়মাত্র করে থাকে, তখন সে বাস্তব; কিন্তু আমাদের অনুভূতিতে এই সৌন্দর্য তথ্যকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে মনোহর, সত্য। কবি বলেছেন — "সুন্দরের

হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্বত্র তার প্রবেশ সহজ।" তাই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত জিনিস আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুন্দররূপে যেমন ধরা দেয়, তেমনি সাধারণ জিনিসও আমাদের হৃদয়ের দ্বারা অসাধারণ হয়ে মনোহর হয়ে দেখা দেয়। আসল কথা, আমাদের ব্যবহারিক জগতে যা সাধারণ, তা তুচ্ছতার আবরণে আবৃত, এই হেতু তা আমাদের নিকটে স্পষ্ট নয়। কিন্তু এই সাধারণ জিনিসই যখন তার বিশিষ্টতা নিয়ে দেখা দেয়, সমগ্ররূপে প্রকাশিত হয়, তখন তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়ে আমরা আনন্দ পাই। এই বিশিষ্টতাই হল সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্য সৃষ্টি সাহিত্য-শিল্পের লক্ষ নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। সত্য আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যের লক্ষ্য সত্য। সাহিত্যে তাকেই আমরা বলি সুন্দর। তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সুন্দর-অসুন্দরের কোনো সম্পর্ক নেই। সাহিত্যিকের কাছে সত্যের সব রপই রূপ। সাহিত্যিক সত্যেরই রূপায়ণ করেন সাহিত্যে।

বাস্তব-জীবনে আমরা দুঃখকে এড়িয়ে চলি, কিন্তু সাহিত্যে আমরা দুঃখকে চাই। দুঃখ সত্তাকে উন্মোচিত করে, আমাদের আলোড়িত করে, 'আমি আছি' এই ভাবটিকে স্পষ্ট করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। ... বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।" তিনি আরও বলেছেন — "আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।"

যেহেতু দুঃখে অস্মিতাবোধ তীব্র হয়ে ওঠে, নিজেকে নিবিড় করে স্পষ্ট করে পাই, আনন্দ তীব্র হয়, তাই সাহিত্যের অর্থাৎ কল্পনার জগতে আমরা দুঃখকে চাই। এখানে ট্র্যাজিক আনন্দের রহস্য। এই আনন্দের সঙ্গে সৌন্দর্যের কোনো বিরোধ নেই। সৌন্দর্য হল রস যা চৈতন্যের আবরণকে উন্মোচিত করে। সাহিত্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠে মানুষের বেদনাবোধ বা অনুভূতি। এখানে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ ঘটে, যে প্রকাশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়।

সৌন্দর্য বস্তুকে করে প্রকাশিত হলেও তা বস্তুর অতীত, কারণ তার সঙ্গে এসে মেলে মন। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাইরে প্রকাশিত হয়, সেখানেই সৌন্দর্য। কেবল সৌন্দর্যই পূর্ণ নয়, তার সঙ্গে আত্মার সৌন্দর্য যুক্ত হয়ে তা আমাদের গভীর আনন্দের কারণ হয়।

প্রকাশ হল সাহিত্যের ধর্ম। প্রকাশ মাত্রেরই অখণ্ড রূপ আছে। তাই প্রকাশ হল সৌন্দর্য, কেন না প্রকাশের মধ্যে হৃদয়ানুভূতি বাণীরূপ লাভ করে। প্রকাশ হল

উপলব্ধির প্রকাশ, তাই সে আনন্দ দেয়। উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে হয় রূপে— সে রূপ আনন্দময়, তা মৃত্যুহীন। এই রূপসৃষ্টিতেই ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই-ই হল সাহিত্যের মিলনের আনন্দ। তাই সৌন্দর্য ও আনন্দ সমার্থক।

৯.২.২ সাহিত্যের তাৎপর্য

সাহিত্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধেই অত্যন্ত গভীর অনুভবের কথাগুলি বিভিন্ন ও বিচিত্র উদাহরণের সহযোগে আমাদের কাছে সরলভাবে উপস্থাপিত করার প্রয়াস করেছেন। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটিতেও এমনই এক উদাহরণের দ্বারা ভাষার স্বরূপটি আমাদের কাছে উদঘাটিত করেছেন।

উদ্ভিদের মধ্যে দুটি শ্রেণি আছে— ঔষধি ও বনস্পতি। ঔষধি স্বল্পায়ুর, ক্ষণকালের জন্য ফসল জন্মিয়েই তার আয়ু শেষ হয়। কিন্তু বনস্পতি দীর্ঘায়ু। বিচিত্র আকৃতির দেহ, বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যে বিরাজ করে।

ভাষা হল প্রকাশের মাধ্যম, উদ্ভিদের মত এই প্রকাশও দুই শ্রেণির— একটি তাৎক্ষণিক অপরটি শাশ্বত।

তাৎক্ষণিক ভাষা কেবল প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ করেই হারিয়ে যায়। —'রাম তুমি কোথায় যাচ্ছ?' 'আমি বাড়ি যাচ্ছি'। —তাৎক্ষণিক ভাষা এই ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদটুকু মাত্র গ্রহণ করেই ফুরিয়ে যায়। দৈনিক প্রয়োজনীয় সংবাদের ক্ষুদ্র সীমায় সে সীমাবদ্ধ এবং সেখানেই তার শেষ পরিণতি। কিন্তু যে ভাষা শাশ্বত, নিত্য ব্যবহারের ক্ষুদ্র সীমা দিয়ে তাকে বাঁধা যায় না। শাল-তাল-তমালের মতো সুদীর্ঘ বিস্তার নিয়ে যুগ-যুগান্তরের বিচিত্র পুষ্প পত্র-ফলের ভার বহন করে এক সামগ্রিক অস্তিত্বের গৌরববাহী মহিমায় সে দীপ্ত হয়ে ওঠে স্থায়ীকালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। সেখানেই তার সত্য পরিচয়। তার এই পরিচয়কেই সাহিত্য বলা হয়।

ভাষা আমাদের কৌতূহল মেটায়। ভাষার যোগেই আমরা একদিকে পরস্পরের তথ্যগত সংবাদ আহরণ করি এবং সেই সঙ্গে মিশে থাকে আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগা-মন্দ লাগা, রাগ-হর্ষ, ভালোবাসা-ঘৃণা— মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একে প্রকাশ না করে যে পারে না। মূক পশুপক্ষীরও কিছু ধ্বনি ও ভঙ্গি থাকে। তা অপরিণত ভাষা হলেও তার দ্বারাই পরস্পরের সংবাদ ও ভাবকে জানায়। অপরিচিত লোকের আগমনে গৃহপালিত কুকুরের ডাক এবং পরিচিত লোক দেখে তার আনন্দ প্রকাশিত হয় তার লেজের তাড়নায়— এটি-ই তার ভাবের প্রকাশ। আবার বাছুরের ডাক শুনে গাভীর আপনা থেকেই দুগ্ধ উথলে ওঠাও গাভী ও বাছরের পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানেরই পরিচায়ক। কিন্তু মানুষেরভাষা এই জাতীয় ভাষা নয়। সে তার প্রয়োগ সীমাকে অতিক্রম করে আরো বিস্তারিত হয়েছে ভাবের ক্ষেত্রে। তাই প্রখর রৌদ্রে পথক্লান্ত পথিকের পিপাসাও কখনো সংগীতের ভাষায় হৃদয়ে দোলা জাগায়, যখন সন্ন্যাসী আনন্দ বলেন—

"জল দাও আমায়, জল দাও,

রৌদ্র প্রখরতর পথ সুদীর্ঘ,

আমি তাপিত পিপাসিত।"

জল দান করে দণ্ডালিকা প্রকৃতি এক নতুন জন্মের বিস্ময়-উল্লাসে অনুভব করেছিল— "আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র।" সাহিত্যে-সঙ্গীতে-শিল্পে এই ভাষা-ই হল শাশ্বত, যা এক গভীর আবেগে আনন্দে আমাদের হৃদয়ের দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ভাষার প্রকাশ ঘটে তিনভাবে। অর্থাৎ, বিশ্বজগৎকে তিনভাবে আমরা জানতে পারি এবং সেই জানার প্রকাশ ঘটে তিনটি উপায়ে।

একটি হল তথ্যগত সংবাদ। সন্ধান, যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এই জানা বিজ্ঞানের জানা। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়া-মাত্রই তার কৌতূহল মিটে যায়।

আরেকভাবে আমরা জগৎকে জানতে পারি, সেই জানা হল জ্ঞানযোগে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বজগতে মানুষের যোগ ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখা শোনায়। সেই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ঘটে বিজ্ঞানের দ্বারা। কিন্তু এই যে ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি— তাকে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞানের যোগে অধিকার করে নিয়েছে। ফলে জ্ঞানের যোগে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপিত হল।

কিন্তু মানুষের নব-নবোন্মেষ শালিনী প্রতিভা তাকে এখানেই থেমে থাকতে দেয়নি। জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মানুষের সংযোগ সাধনের আরো একটি উপায় আছে— তা হল অনুভূতি। এই অনুভবের প্রকাশ ঘটে ভাবের দ্বারা। সাধারণত ভাব প্রকাশের দ্বারা মানুষ তার সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগকে ব্যক্ত করে। তবে এই ব্যক্ত করার মধ্যেই তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেই প্রকাশে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ফলে এই প্রকাশ ছন্দে সুরে বেদনার অনুভূতিতে অভিষিক্ত হয়ে সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করে। মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি এর দ্বারাই বিশ্বজনীন রূপে দেখা দেয়। বস্তুজগৎ তাই পরিণত হয় সাহিত্য জগতে।

এই ব্যক্তিগত অনুভূতির বিশ্বজনীন রূপলাভের জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, সাহিত্য শব্দের সহজ অর্থ হল মিলন বা নৈকট্য। এই মিলনের দুটি দিক— একটি প্রয়োজনভিত্তিক অপরটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। মিলনের এই দুটি দিককে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি উদাহরণ দিয়েছেন। শাক সবজি খেতের মধ্যে মানুষের যোগ প্রয়োজনের। জৈবিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে শাকসবজির খেত। কিন্তু ফুলের বাগানের সঙ্গে মানুষের যোগ সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। ফুল আমাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ফুলের বাগান আমাদের আনন্দিত করে। অর্থাৎ ফুলের বাগানের দ্বারা আমাদের কোনো দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটেনা, অথচ তার দ্বারা আমরা যা লাভ করি— সেই সৌন্দর্যের আস্বাদন, সেই আনন্দের অনুভব আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু।

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ এই ফুলের বাগানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ, সাহিত্যের দ্বারা মন মিলতে চায়, সেই মিলনের আবেগে মন আনন্দিত হয়। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে— সাহিত্যের কাজ হল হৃদয়ের যোগ ঘটানো। কোনো প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, এই হৃদয়ের যোগ ঘটানোই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য।

ব্যবসাদারের নিকট ফুল বিক্রয় বস্তু মাত্র যার দ্বারা তার লাভালাভের হিসাব-নিকাশ হয়। সেই বাজারদরের কাছে ফুলের সৌন্দর্য মহিমা ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু রসিক মনের নিকটে ফুলের সৌন্দর্য সত্য কেননা তা আনন্দদায়ক। হিসাব-নিকাশ লাভালাভের বহু উর্দ্ধে তার আসন।

জৈব প্রয়োজনের সম্পর্ক এবং সৌন্দর্য ও রসের সম্পর্কের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতির মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। নিজকে না ভুলতে পারলে মিলন সম্পূর্ণ হয় না। এক শরতের সূর্যাস্তকালীন রক্তিম সন্ধ্যায় পদ্মাবক্ষে বোট থেকে লেখক একটি বড়ো মাছকে জলতল থেকে কলশব্দে লাফিরে উঠতে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, "আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই জল যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে।" কিন্তু বোটের তপসিমাঝি আক্ষেপের সুরে বলেছিল 'ও! মস্ত মাছটা' মুহূর্তেই চারদিকে যে মিলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, মাঝির রসনার আক্ষেপে তা ছিন্ন হল। কারণ, মাঝির আসক্তি আহারে, তাই বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে তার মিলন সাধিত হতে পারে না কিছুতেই। কেননা, বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ ঐ দৃশ্যের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ-ই হল সাহিত্য।

মানুষের নানারকম চাহিদা আছে। সাধারণ চাহিদা হল জৈবিক তৃপ্তি সাধন, — ইন্দ্রিয় লোলুপতা এই চাহিদাকে পূর্ণ করতে পারে। কিন্তু এই প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে অনেক বড়ো চাওয়া হল বিশ্বের সঙ্গে মিলনের একান্ত আবেগ। এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাকে আপন অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে এনে দিতে, বৃহত্তের সঙ্গে মিলিত হতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন—

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া।
বুদের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।।"

যে মানুষের মধ্যে এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা নেই, সে পশুর মতো। পশুপাখির চৈতন্য তার জৈবিক চাহিদার মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু মানুষের চৈতন্য এই বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে আকাশে-বাতাসে-আলোয় মুক্তির আনন্দকে লাভ করেছে। তাই যে অনায়াসে বলতে পেরেছে—

"জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানব জীবন।।"

রবীন্দ্রনাথের মতে— "মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।"

এই বিশ্ব সাথে মিলনের একান্ত ইচ্ছাই মানুষকে তার একান্ত আবশ্যিকতা থেকে অহৈতুক চাওয়ার দ্বারা মুক্ত করে। সাহিত্যের তাৎপর্যও এখানেই। এই সম্বন্ধ তাই নিষ্কাম। আর এই সম্বন্ধকে স্বীকার করার জন্যই শিল্পী সাহিত্যিকের এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, এত প্রকাশের তাড়না। জ্ঞানীলোক এই মিলনমেলায় যোগ দিতে পারে না, কেননা তার সর্বত্র জ্ঞানান্বেষণই তাকে সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে। কিন্তু ভাবুক প্রকৃতির মানুষই নিজেকে সর্বত্র মিলিয়ে নিতে পারে আপন ভাবরসের দ্বারা। বিশ্বজগৎ বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতা যাকে আমরা বলি natural– এর দ্বারা প্রকাশমান। প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ নিয়েই সে প্রকাশিত। কিন্তু মানুষ কেবল প্রাকৃতিক রূপ নিয়ে থাকতে পারে না, কেননা তার আছে মন এবং সেই মনের ভালো লাগা-মন্দ লাগা, আনন্দ-বেদনার দ্বারা সে গ্রহণ বর্জনের দ্বারা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় এবং যেহেতু সে বিশ্বের উপর নিজের মনকে প্রয়োগ করে তাই মানুষের ব্যক্তি স্বরূপের পরিণতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিরও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে। এই পরিবর্তন আসলে বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্ব সত্তার পরিবর্তন নয়, তা মানবিক পরিণতি। তাই সে প্রতিমুহূর্তেই 'তিলে তিলে নূতন হোয়'। আর এই বিশ্বের ছন্দে-ছন্দেই মানুষের মনের পরিণতিও আরো বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করে। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবমন একে অপরের পরিপূরক। বাহিরের জগতে বিশ্বের যা কিছু আমরা দেখি সেটি প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ। কিন্তু এই রূপের মধ্যে মানুষ তার মনকে ঢেলে দিয়ে তাকে নতুন নতুন রূপে উদ্ভাসিত করে তুলেছে, —এই রূপ তার রসরূপ। তাই পদাবলি-সাহিত্যে দেখি রাধা কৃষ্ণ ভেবে তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করছেন। তমালবৃক্ষ সেই মুহূর্তে তমালবৃক্ষ হতে তার সহজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রূপ বিলুপ্ত হয়েছে এবং রাধার মানসিক ব্যাকুলতা তার মধ্যে কৃষ্ণ রূপের রস-রূপান্তর ঘটিয়েছে। অর্থাৎ— "মানুষ সমস্ত জগতকে হৃদয়রসের যোগে মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই।"

মানুষের এই মনের দ্বারাই বহির্জগতের তথ্য বা ঘটনা ভাবের সামগ্রীতে পরিণত হয় এবং মানুষের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে সে মিলে যায়। বৈচিত্র্য পিয়াসী মানুষ কিন্তু এখানেই থেমে যায় না। এই একান্ত ব্যক্তিগত ভাবের সামগ্রী, একান্ত অনুভবময় মিলনকে সে সর্বকালের সর্বজনের স্বীকৃতি দিতে চায়। মানুষের এই অনুভূতির প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা এবং এই প্রকাশ সাধিত হয় নিত্যকালের ভাষায়। এই ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা নয়— এই ভাষা হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। তাই এই ভাষার দ্বারাই চণ্ডালিকার কূপ অকূল সমুদ্র হয়ে উঠতে পারে— যার তরঙ্গের নৃত্য চণ্ডালিকার সমস্ত জীবনে দোলা লাগিয়ে যায়। চণ্ডালিকার এই ঐকান্তিক অনুভূতিকে শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষা করে, যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত করা যায় না; জ্ঞানের চরমসীমা খুঁজেও এই অনুভূতির কার্য-কারণ সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করা যায় না; একমাত্র সাহিত্যই ভাষার রস-রূপের দ্বারা এই অনুভূতিকে প্রাণবন্ত এবং সত্য করে তুলতে পারে। যান্ত্রিক ভাবে দেখা অথবা ফোটোগ্রাফিক

লেন্সের দ্বারা যে দেখা তা যথাযথ দেখা। কিন্তু ভাবের দেখা এর থেকে স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্রকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার, কেননা এ অনুভবের ব্যাপার— এবং ব্যক্তি বিশেষে অনুভবও নিজের মানসিকতা অনুযায়ী হয়।

যেমন খোকার পায়ের ছোট্ট লাল জুতাটি মায়ের ছেলে ভোলানো ছড়ায় হয়ে ওঠে— 'জুতুয়া'। অথচ জুতার আভিধানিক অর্থ 'জুতুয়া' বলে কোন শব্দ নেই। কেননা এ একান্ত ভাবেই মায়ের হৃদয়-উজাড় করা ভাষা। অভিধানে না থাকলেও মায়ের মুখে স্নেহ উজাড় করে যে নতুন এই ভাষারূপ লাভ করেছে।

সাধারণ ভাষার দ্বারা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ। কেননা, ভাবের সাহিত্যমাত্রেই 'দেখা-না-দেখায় মেশা' ব্যক্তি অব্যক্তের আলো-আঁধারিতে রচিত। সেই অবগুণ্ঠনময়ী যে ভাষার দ্বারা প্রকাশিত হয় সে ভাষা সবটাই সকলের আয়ত্তাধীন নয়। কেননা, তার মধ্যে ব্যক্ত ও গোপন, কথা ও সুর, অর্থ ও অর্থহীনতার ব্যাপারটি রয়েছে। এরজন্যই সাহিত্যে অলঙ্কার রূপক প্রতীক চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মানুষের একান্ত নিবিড় যে অনুভূতি, যা শুধুমাত্র একটি সংবাদ বহন করে না, অন্তরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে সে 'হৃদয়ের কথা বালতে ব্যাকুল' হয়ে ওঠে মানুষের এই নিবিড় গভীর অনুভূতি যখন প্রকাশ পেতে চায়, তখনই তা ভাবের বিশ্বরূপে প্রতিফলিত হয়। কবি যখন বলেন— "দেখিবারে আখি-পাখি ধায়"— তখন দেখার আগ্রহ আর পাখির ওড়ার ব্যাকুলতা মিশে একটি নতুন ভাবরূপের সৃষ্টি হয়। দেখার আগ্রহ অত্যন্ত সাধারণ একটি ঘটনা। কিন্তু তাকে বহির্বিশ্বের ঘটনার মাঝে না রেখে কবি যখন তাকে মনের মধ্যে মিশিয়ে দিলেন তখন অদ্ভুত এক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই ভাষা কেবল বিবরণের ভাষা নয়, এ প্রাণের সৃষ্ট ভাষা। এই ভাষাকে আমরা আপন করে নিয়েই পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারি।

এককথায় বলা যায়, যা বস্তুগত জিনিস, তা মানুষের মনের স্পর্শে একান্তভাবে তারই মনের জিনিস হয়ে ওঠে। তখনই সেই মন বিশ্বমনের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। তখনই সৃষ্টি হয় সাহিত্যের।

মানুষের মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। সকলেই একমন নিয়ে জন্মায় না। কবির মন আর 'তপসি মাঝি'র মন কখনই এক ধরনের হতে পারে না। কাজেই বিশ্বের সঙ্গে মিলন অনুভব করা বা ভোগ করার ক্ষমতা সকলের এক নয়। বিশ্বের সঙ্গে মিলনের পথ দুটি— ইন্দ্রিয়ের মিলন ও মনের মিলন। ইন্দ্রিয়ের মিলন সাধারণ মানুষের ঘটে। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাবার জন্য একটি বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয়— সেই শক্তির নাম কল্পনাশক্তি। এই কল্পনা শক্তির দ্বারাই বিচ্ছিন্ন বস্তুর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘটে। যা আমাদের মনের জিনিস নয়, তাকেও সে একান্তভাবে মনোময় করে তুলতে পারে। এটিই হল মানুষের লীলা— এই লীলা তাকে আনন্দ দেয়। যদি মন বিশ্বকে একান্ত আপনার করে তুলতে না পারে, তখন সেই বিচ্ছিন্নতা বোধ-ই তার নিরানন্দের কারণ হয়।

কেবল বিশ্বপ্রকৃতিকেই যে মানুষের মন একান্ত আপনার করে নেয়, তা নয়, মানুষ নিজেও এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতির দুটি দিক— একটি সক্রিয়, অপরটি নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির ব্যবহার মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক; তাই মন তাকে অতি সহজেই অধিকার করে আপন ভাবে ভাবিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যে এ-কথাটিই বলেছেন—

"আমারই চেতনার রঙে
পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠলো রাঙা হয়ে,
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'।
সুন্দর হল সে।"

কিন্তু প্রকৃতির যেখানে সক্রিয়তা সেখানে আছে বাস্তব ঘটনাবলি। দুষ্কর্ম, দুর্নীতি, অনিয়ম, অন্যায় মানুষের দ্বারাই মানব সংসারে ঘটে। এই ঘটনাগুলিকে আমরা ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা বলেই বুঝি এবং আবর্জনার মত ঘৃণার দ্বারা তাকে ত্যাগ করি। নিত্য দিনের সংসারে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি আমাদের চিত্তকে ব্যথিত করে, পীড়িত করে, কিন্তু মন তাকে গ্রহণ করতে পারে না। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয়, তখনই আমাদের মনের সঙ্গে তার বিশুদ্ধ অবাধ মিলন সাধিত হয়। এই মিলন-ই সাহিত্য। তাই বাস্তবজগতের সতীদাহ প্রথাকে রামমোহন আইনের দ্বারা যুক্তি তথ্য প্রমাণের দ্বারা রদ করেছেন; কিন্তু সীতার অগ্নিপরীক্ষা বিশেষ রসলোকে উত্তীর্ণ হয়ে সৃষ্ট হয়েছে 'রামায়ণ'।

বাস্তব ঘটনাগুলির আর একটি ব্যাপার আছে। এই ঘটনাগুলি অধিকাংশ স্থলেই সামগ্রিকতাহীন, অসংলগ্ন। মানুষের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যের সন্ধান করে এবং ঐক্য স্থাপন করে। যেকোনো ঘটনারই পূর্ব-পর কাহিনি আছে যা আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ নয়, তাই আমরা ঘটনাটির খণ্ডাংশ মাত্র দেখতে পাই। সেজন্যই তার বৃগৎ তাৎপর্যটি আমাদের অগোচরে থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছেন। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি ঘটেছিল তার চরম অর্থ কারুর দৃষ্টিপথে পড়েনি। কার্লাইল তাদের মধ্যে গ্রহণ-বর্জন করে আপন- কল্পনার পটে সাজিয়ে তার একটি সামগ্রিক ভূমিকা দেখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। ঐতিহাসিক দিক থেকে তার মধ্যে হয়তো অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, তথ্য বিচারের ক্ষেত্রে তার জন্য বাধা আসতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সামগ্রিক রূপটি আছে তার সঙ্গে আমাদের মন অনায়াসে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হয়। তাই ইতিহাসের অপূর্ণতা থাকলেও, তথ্যের ত্রুটি থাকলেও সাহিত্যের দিক থেকে সে সমগ্র এবং পরিপূর্ণ।

সংবাদপত্রে যে ঘটনার অংশ বিশেষকে আমরা দেখি, তার মধ্যে পূর্ণতা নেই। কিন্তু সাহিত্য সংবাদ মাধ্যম নয়। তাই সংবাদপত্রে প্রচারিত খণ্ড ঘটনাগুলি যখন অখণ্ড

ঐক্যে মিলতি হয়ে সাহিত্যে ধরা দেয়, তখন প্রতিদিনের তুচ্ছ তাৎক্ষণিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সেই ঘটনা তার সমস্ত ভুল-ত্রুটি, সার্থকতা-ব্যর্থতা নিয়ে এক অখণ্ডরূপে ধরা দেয় এক বৃহৎ ভূমিকায়। তখনই তা নিত্যকালের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধও সংঘাত ঘটে। নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করে মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। কিন্তু তা কেবল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ব্যাপার হয়। আর একি দিক দিয়ে আমরা প্রকাশ বৈচিত্রবান মানুষের সঙ্গে মিলতে চাই। এই গভীর ও প্রবল চাহিদা থেকেই সৃষ্টি গল্পের। সেই গল্প কখনোই তথ্যের প্রচার বা প্রদর্শনী নয়। মানব পরিচয়ের এক সামগ্রিক ছবি তার মধ্যে ফুটে ওঠে। আমাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা আছে। এই পার্থিব জগতে রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের মধ্যে বীরত্বের অধ্যাবসায়, দুর্লভকে লাভ করার জন্য দুঃসাধ্য উদ্যম, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষার দ্বারা সেই সাধনপথে বিঘ্ন ঘটা— এসকলই আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপার। এই অভিজ্ঞতার তিল তিল রূপ সংগ্রহ করে সাজিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তিলোত্তমা রূপকথার। সেখানে যে অলৌকিক বস্তু ও ব্যাপারের কথা বলা হয়, আসলে তা সবই লৌকিক। মানুষের দেখা বাস্তব জগৎ-ই কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে শিশু মনের উপযোগী জগৎ হয়ে ওঠে, যা শিশুকে আনন্দিত করে।

বিধাতার সৃষ্টি মানুষকে সম্পর্ণ পরিতৃপ্ত করতে পারে না বলেই মানুষ সেই সৃষ্টিকে আপন অন্তরের দ্বারা পুনরায় সৃজন করে। এই সৃষ্টি তার নিজের মতো, কেননা তার একান্ত আন্তরিক কামনাই রূপ ধরেছে এই সৃষ্টিতে। সেজন্যই তা তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়। সৃষ্টির এই যে রূপায়ন মানুষের হাতে হয়, সেই রূপ কোন বিশেষ একটি মুহূর্তের ভাবনা মাত্র নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তিল তিল করে আহরিত হয়ে সেই রূপ একটি বিশেষ রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন— "রামকে পেলুম, সে তো একটিমাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ।"

আসলে বাস্তব সংসারে ভালো-মন্দ— দুটিকেই আমরা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন মানুষ-বস্তু-ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। আমাদের অভিজ্ঞতায় সেগুলি অসংলগ্নভাবে থাকে। সাহিত্যে কল্পনার দ্বারা এই অসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত, ক্ষণিকের অভিজ্ঞতা গুলিই সংহত হয়ে এক পরম ঐক্য লাভ করে ভালো অথবা মন্দের মধ্যে। তখনই তা নিত্য মনের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং এক পরম সত্যে উদ্ভাসিত হয়। এই সত্যতা ও নিত্যতা যে কেবল সদর্থক অথবা ভালো তা নয়— মন্দের মধ্যেও সেই নিত্যতা দেখা যায়। তাই আমাদের কাছে ভালোর দিক থেকে রামচন্দ্র যতখানি সত্য ও সার্থক, শেক্সপিয়রের ফলস্টাফও ততখানিই সত্য ও নিত্য। আমাদের নিত্যদিনের দেখা তিলতিল অভিজ্ঞতা এদের এক পরিপূর্ণ রূপ দান করেছে। তবে অভিজ্ঞতাকে জোড়া-তালি লাগিয়ে এর সৃষ্টি নয়, মানসিক চাহিদার

সঙ্গে কল্পনার রসে জারিত করে তার সৃষ্টি। সেজন্যই সাহিত্য আমাদের সহজ মিলনের দ্বারা আমাদের অন্তরে আনন্দ জাগিয়ে তোলে।

মানুষ একদিকে ব্যক্তিগত, অপরদিকে শ্রেণিগত। শ্রেণিবিচ্ছিন্ন মানুষ হতে পারে না। একদিকে সে যেমন একটি বিশেষ মানুষ, অপরদিকে সে মানবশ্রেণির অন্তর্গত। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার শ্রেণিকে ছেড়ে যদি ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবুও তাকে বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিল্পীর। প্রকৃতির সৃষ্টি ও শিল্পীর সৃজনের মধ্যে তফাৎ আছে। প্রকৃতির হাতে সৃষ্টি মানুষ তার সমস্ত সার্থকতা-ব্যর্থতা-বাহুল্য নিয়ে বাস্তব হতে পারে, কিন্তু সে সত্য হয়ে ওঠে না মনের কাছে। তার মধ্যে আছে ঐক্যের অভাব।

শতদল পদ্মের ঐক্য সহজ— তার সীমাবদ্ধ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন অতিরিক্ত কিছু নেই। আমাদের হৃদয় তার সামঞ্জস্যের মধ্যে কোথাও বাধা পায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যেআছে বৈচিত্র্য যা আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে। তাই তার মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য ঘটানোর জন্য প্রয়োজন শিল্পীর। বাস্তবে যা আছে তাকে একান্ত মানসিক করে তুলতে হলে কল্পনার সাহায্যে তার মধ্যে গ্রহণ-বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তবের বিক্ষিপ্ত ব্যাপারকে সংহত করে তুললে মন তাকে সহজে গ্রহণ গ্রহণ করতে পারে। শিল্পী ছাড়া এই সৃজন সম্ভব নয়। প্রকৃতির সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টির মধ্যে যে দূরত্ব আছে ভাষার সেতুবন্ধ তার মধ্যে নৈকট্য আনতে পারে। এই কাজ সাধিত হয় সাহিত্যে।

বিশ্বকে মানুষ দুই দিক থেকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে— ব্যবহারিক দিক থেকে ও ভাবের দিক থেকে। প্রকৃতির মধ্যে যা আছে মানুষের কাছে তা পর্যাপ্ত নয় বা তাতে অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা আছে বলেই মানুষ নিজের সুবিধা ও রুচি অনুযায়ী প্রকৃতিকে নিজের মত করে নিয়েছে অথবা প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার কলাকৌশল ও বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। আদিকাল থেকেই এইভাবে মানুষ প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানবিক পৃথিবী করে তুলেছে। গুহাবাসী মানুষ সমাজ-সংসার-শহর নির্মাণ করেছে। প্রকৃতির উপকরণকে গ্রহণ করে তাকে নিজের মতানুসারে নিজের রুচি অনুযায়ী নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত করে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে একান্ত আপনার করে নিয়েছে। পৃথিবীর সহজ রূপ তাতে বিঘ্নিত হয়েছে, কিন্তু দেশ-বিদেশে বিক্ষিপ্ত ধন ও শক্তিকে মানুষ সংহত করে নিজের ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে। এভাবেই বস্তুজগতে মানুষ বিশ্বজয় করেছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। এছাড়া আছে মানুষের ভাবের জগৎ। মানুষের হাতের অঙ্কিত রেখা যখন রূপময় হয়ে উঠল, মানুষের ভাষা যখন অর্থ খুঁজে পেল তখন থেকেই ইন্দ্রিয় বোধগম্য জগতের উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করে মানুষ তাকে ভাবগম্য জগতে নতুন করে সৃজন করে তুলেছে। এই সৃজনও তার ব্যবহারিক জগতের মতই স্বরচিত। বিক্ষিপ্ত উপাদানকে সে ভাবজগতেও স্বীকার করেনি। সেই বিক্ষিপ্তর মধ্যে থেকে সে সন্ধান করেছে ঐক্যের। কল্পনার দ্বারা যে রূপ নির্মাণ করেছে, রস সৃষ্টি করেছে, সেই রূপ-রস মানুষের একান্ত আপনার জিনিস হয়ে তাকে আনন্দিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এই ভাবজগতের রহস্যটি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

তোমারে করেছি রচনা

তুমি আমারি তুমি আমারি"।

ব্যবহারিক জগতে আমরা যা দেখি তা সকলের দেখা, সাধারণের লভ্য বস্তু; ব্যক্তি বিশেষে তার কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু ভাবের জগৎ স্বতন্ত্র। ভাব জগতের বস্তুকে বিশেষ রসের যোগে উপলব্ধি করে হৃদয়। বিক্ষিপ্ত সাধারণের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টি যাকে বিশেষভাবে লক্ষ করে। সেই উপলব্ধি, সেই লক্ষ করাটাই ভাবের জগতের চরম ব্যাপার।

জ্যোৎস্না রাত্রির এক বিশেষ রস ও রূপ আছে— অন্যান্য রাত্রি হতে যে পৃথক। সে বিশেষ হয়ে ওঠে কল্পনার দৃষ্টিতে যা আমাদের মনকে অধিকার করে। নদীতে-অরণ্যে-গাছে-পাতায় তার আলোছায়া, অরণ্যের মর্মরধ্বনি, ঝিল্লিধ্বনি, অজানা ফুলের সুবাস— এই সকল স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ঐক্যতানে মিলিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির এক সামগ্রিক স্বরূপ ধরা পড়ে আমাদের কল্পনায়— যার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের নিবিড় সম্পর্ক। এই নিবিড় মিলনের ফলেই জ্যোৎস্না রাত্রি আমাদের আনন্দ দান করে।

যা আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ ও সুন্দর তা আপন সৌন্দর্যে আমাদের কাছে বিশেষ হয়ে ওঠে। কিন্তু যা সামান্য, অসুন্দর তা কেবলমাত্র কল্পনার বিশেষ দৃষ্টি-দ্বারাই বিশেষিত হয়ে আমাদের অন্তরের সামগ্রী হয়ে ওঠে। তথ্যের সামান্যতা থেকে সত্যের অসামান্যতায় উত্তীর্ণ করাই সাহিত্যের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র একটি প্রবন্ধে (কেকাধ্বনি) বলেছেন ময়ূরের ডাক কর্কশ হলেও সমগ্র বর্ষা প্রকৃতির পরিপূর্ণতার মাঝে মিলে সে এক অসামান্যতার সৃষ্টি করে— সেটিই তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের স্বরূপ। সাহিত্যে এই সাধারণের মধ্য থেকে অসামান্যকেই খুঁজে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে— "বিধাতার হাতের পাসপোর্ট নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ করে দেয় মনোলোকে।" এই মনের মাধুরীর দ্বারাই অতি সাধারণ বস্তুও অসাধারণত্বের ছোঁওয়া পায়। ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা কলাকৌশলে মানুষ বিশ্বকে নিজের হাতে পায় যাকে সে প্রয়োজন মত চাহিদা অনুসারে ব্যবহার বা ভোগ করতে পারে। কিন্তু কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তির দ্বারা মানুষ বিশ্বকে নিবিড় করে একান্ত কাছে পায়— এই বিশ্ব তার প্রয়োজন সাধন করে না, এই বিশ্ব তার মিলন সাধন করে একান্তভাবে তার আপনার হয়ে ওঠে।

সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে জাগে এক জ্যোতি— সেই জ্যোতি অফুরন্ত বেগ সম্পন্ন, তার আছে প্রকাশ শক্তি। বিশ্বকবির সাধনা থেকেও জাগে শক্তিমান ছন্দ। কবি সেই ছন্দের শক্তির দ্বারা সৃজন করেন— সেই সৃজনই সাহিত্য। সে নিত্যকালের আসনে তাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানুষের নির্মাণশক্তির মধ্যে আছে আশ্চর্য নৈপুণ্য। এই শক্তির দ্বারাই সে বড় নগর নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে রিপুর প্রবল্যও কখনো কখনো বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

লোভ-মোহ-ঈর্ষা-বিকৃতরুচি-বর্বরতার কর্কশ হস্তের ছোঁয়ায় নির্মাণ কখনো কালিমালিপ্ত হয়। কিন্তু এই বিকৃতি এই রিপুর প্রাবল্যই মানুষের সৃষ্টির ইতিহাসে শেষ কথা নয়— তার উপরে সত্য মানুষের নির্মাণ। কেননা এই নির্মাণের সঙ্গেই মানুষের আত্মীয়তার বন্ধন।

ঠিক তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময় রিপুর আক্রমণে বিকৃত রুচির আবির্ভাব হতে পারে। কিন্তু সকল দীনতা-হীনতাকে ছাপিয়ে মানুষের সামগ্রিক মহিমা প্রকাশিত হয় সাহিত্যে। আমাদের মহাকাব্যগুলি তারই প্রমাণ দিয়েছে। কেননা মানুষের মধ্যে যা স্থায়ী উপাদান— সাহিত্যের কাজ তাকে নিয়েই। বাস্তব স্থূলতা মানুষের জীবনের সাময়িক, ক্ষণিকের ব্যাপার। তার প্রকৃত গৌরব নিত্যকালের মহিমাময় উদ্ভাসনে। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে মানুষের মনের অভ্রভেদী আকাঙ্ক্ষা কাজ করে চলেছে, সে অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময় লোকে উদ্ভাসিত— সেই তার স্বর্গাভিমুখী যাত্রা। সাহিত্যে অপরাজিত মানুষের সেই দীপ্ত প্রাণের মহিমাই চিরকাল ধরে ঘোষিত হয়েছে। কেননা, সাহিত্যে মানুষের এই অন্তরতম পরিচয়টিই বড়ো হয়ে উঠে নিত্যকালের বিশ্বের দীপালিকার উৎসবে জীবনযজ্ঞের অগ্নিশিখাকে জ্বালিয়ে তোলে— সেই আলোকেই আলোকিত হয়ে ওঠে যুগ-যুগান্তরের মানব যাত্রীর উত্তরণের পথ। সাহিত্যের তাৎপর্য এখানেই।

৯.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বহির্জগতের বহুর ধারা নানা রূপে রসে ও ঘটনার তরঙ্গে আমাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলে। এই প্রবহমান ধারা জীবনকে সৃষ্টি করে তোলে। সত্তার প্রকাসের স্পষ্টতায় আমরা আনন্দ পাই।

বিশ্বকে আমরা জানি দুইভাবে — জ্ঞানে এবং অনুভূতিতে। অনুভূতির জানা আমাদের আনন্দ দেয়। সাহিত্য-শিল্প হল এই উপলব্ধির আনন্দ। এখানে বিষয় ও বিষয়ী একাত্মতা লাভ করে। সাহিত্য শিল্প হল সত্তার বিস্তার। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের দাবি দুইটি — একদিকে আছে তার প্রয়োজনের দাবী-ক্ষুধা-হিংসার চাবুক অনবরত তার তৃপ্তিহীন কামনাকে জাগিয়ে রেখে তাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অপরদিকে আছে তার অপ্রয়োজনের আনন্দ। এই আনন্দেই তার চরিতার্থতা। সাহিত্য এই আনন্দের প্রকাশ।

বিশুদ্ধ সাহিত্য তাই অপ্রয়োজনের। তার রস অহেতুক। সাহিত্য যে বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্র রচনা করে সেখানে কল্পনা বিশ্বকে নতুন পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশ করে। যেখানে বিশ্বকে আমরা জানি আমাদের অনুভূতির মাধ্যম। এই অনুভূতি আমাদের অনুভূতির মাধ্যমে। এই অনুভূতি আমাদের অন্তরে আনন্দকে জাগায়। এই আনন্দ দান করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

সাহিত্য যে আনন্দ দেয় তা সৌন্দর্যের আনন্দ কি-না তা বিচার্য বিষয়। সৌন্দর্য তথ্যাশ্রয়ী, তা সুন্দর বা অসুন্দর নয়। আসলে তা একটি পরিপূর্ণ সুষমা, একটি ঐক্য। মানুষের অন্তরে যে ঐক্যবোধ আছে যা পরিপূর্ণতার আদর্শ, তাকে সে উদ্বুদ্ধ করে। তথ্য

সুন্দর নাও হতে পারে, কিন্তু তথ্যকে অতিক্রম করে যে সুষমা প্রকাশিত তা সুন্দর, তা নিবিড় উপলব্ধির বিষয়।

আমাদের দেশে অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলা হয়েছে — রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু সব রসের সৌন্দর্য নেই। যেমন, ভোজন রস।

রসের উজ্জ্বলতা থেকে সাহিত্য সৃষ্ট হয়। সাহিত্যে এই রস ব্যবহারিক জীবনের অতীত হয়ে অনির্বচনীয় রূপে আপনাকে প্রকাশ করে। তাই সাহিত্যরস অপ্রয়োজনের আনন্দ। আসলে সাহিত্য শিল্প হল মানুষের ঐশ্বর্য, তার গৌরব।

রসের মধ্যে মানবচৈতন্য আপনাকে উপলব্ধি করে। মানুষ তার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চায়। তাই ব্যবহারিক জীবনে জল-বহনের ঘড়ায় যে শিল্পকর্ম করে তাকে অলঙ্কৃত করে। মানুষ তার অনুভূতির আনন্দকে সৃষ্টির মাধ্যম প্রকাশ করতে গিয়ে আপনা ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। সাহিত্য সেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

তথ্যের জগতে যা অবাস্তব বলে মনে হয়, হৃদয়ের ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে সত্য। সাহিত্যে এই সত্য-সৌন্দর্যের রূপে প্রকাশিত হয় এবং এই সৌন্দর্য লৌকিক সীমা অতিক্রম করে।

'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই বিশেষ স্বরূপটিই তত্ত্বকারে ব্যক্ত করেছেন।

'সাহিত্য তাৎপর্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হল, মানুষের ভাষা দুই ধরনের— একটিতে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটে, সংবাদ প্রচারের আশু ফল লাভে তার সিদ্ধি ও পরিনাম। আর অন্যটি নিত্যকালের গৌরবে উজ্জ্বল। তার প্রকাশের পরিণাম নিজেরই মধ্যে।

তেমনি ভাব প্রকাশেরও ক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্য আছে — মানুষ তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-অনুরাগ-বিরাগকে তার বিচিত্র ভাব দিয়ে ব্যক্ত করে। এই ভাবগুলিকেই মানুষ যখন ছন্দে, সুরে, বেদনায়, আনন্দে প্রকাশ করে তখন এই ভাব বস্তুজগতের সীমার উর্ধ্বে চলে যায়। এটিই সাহিত্যের প্রকাশ।

সাহিত্যের অর্থ নৈকট্য বা মিলন। মানুষ প্রয়োজনেও মেলে, আবার মিলবার আনন্দেও মেলে। এই মেলার আনন্দে মেলায় যে আনন্দিত হয়। এটি তার অনুভূতির ব্যাপার। এই মিলনে বিশ্বের সঙ্গে প্রয়োজন ও জ্ঞানের যোগ ছাড়া অনুভূতির যোগ স্থাপিত হয়।

সাহিত্যের ধর্ম হল হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করা। এখানে কোনো প্রয়োজনের দায় তার নেই। বাস্তবের স্থূল কামনার দ্বারা এ মিলন ঘটতে পারে না।

সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বলোকে নিজেকে ব্যপ্ত করে। সেখানে তার মুক্ত স্বরূপ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানেই জেগে ওঠে আনন্দ। একমাত্র ভাবুক মনই ভাবের আলোকে জগতের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতি যতই মানবিক হয়ে ওঠে মনের বিস্তার ঘটে।

প্রকাশ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। রসের অনুভূতি মনে যখন তীব্র হয়, তখন মানুষ চায় তাকে প্রকাশ করতে। এই প্রকাশ ঘটে নিত্যকালের ভাষায়। এই ভাষা তাই ব্যঞ্জনাবহ।

আমাদের থেকে যে বিশ্ব, তার সঙ্গে মনের একাত্মতা স্থাপিত হয় কল্পনা শক্তির সাহায্যে। ফলে মন বস্তুজগৎকে মনোময় করে তোলে। এটিই লীলা। কল্পনার এই লীলায় আনন্দ আছে।

বাস্তব জগতের ঘটনাগুলি অসংলগ্ন ও বিছিন্ন। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে মনের সক্রিয় যোগ থাকে বলেই মানুষের মনে নানা ধরনের আবেগের ওঠা-পড়া হয়। এই বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল যে, সাহিত্যের মধ্যে থাকে সামগ্রিকতা। সাহিত্যে আমারা এই সমগ্রতার সংহত মূর্তিকে দেখতে পাই বলেই তা নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে।

সংসারের নানা বৈচিত্র্য ও অসামঞ্জস্য, যে বিচ্ছিন্নতা আছে, সাহিত্যে তা এক ঐক্যবদ্ধ রূপ লাভ করে। শিল্পী সাহিত্যিক কল্পনার নির্দেশে এই বিচিত্র বিচ্ছিন্ন উপকরণ থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নির্বাচন করেন। বিশেষ অনুভূতির যোগে হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করে, কল্পনার কৌশলে বিচিত্র অবিশেষের মধ্য থেকে বিশেষকে লক্ষ করাই সাহিত্যের বিষয়। এই উপলব্ধি যেখানে প্রসারিত হয়, সেখানেই প্রকাশিত হয় সৌন্দর্য বা রস।

রস-রূপ-নিরপেক্ষ নয়, আবার রূপও রসেরই পরিচয় দেয়। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অস্তিত্ব নেই। রূপ-রসের পরিচয় দেয় এবং রস-বস্তুর স্বরূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশিত হয়। খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে যা মহিমাহীন, কল্পনায় সমন্বিত হয়ে তা ভাবের নিত্যজগতে স্থান লাভ করে। সাহিত্য তাই মানুষের অন্তরতম সত্তার পরিচয়।

৯.৪ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটির মূল বক্তব্য আলোচনা করুন।

২। কবিবন্ধুবর শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ পত্রটি প্রকৃত অর্থে 'সাহিত্যের পথে' সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলির নির্বাস স্বরূপ — আলোচনা করুন।

৩। "মন দিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি।" — এই জানার যে-দুটি দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন তা আপনার নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৪। "মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ।" — বক্তব্যবিষয় বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৫। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে প্রচলিত সৌন্দর্য এবং সাহিত্যের সৌন্দর্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন, তা আপনার নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৬। "সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলা জগতের সৃষ্টি সাহিত্য।" — সাহিত্য-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তত্ত্বাকারে ফুটে উঠেছে, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্র অবলম্বনে তা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৭। 'সাহিত্যে পথে' গ্রন্থের 'বাস্তব' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৮। "রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের নিজেকে যে সপ্রমাণ করিতে পারে না।" — 'বাস্তব' প্রবন্ধ অবলম্বনে বক্তব্যটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৯। 'বাস্তব' প্রবন্ধে নিত্য দিনের জীবনের বাস্তবতা এবং সাহিত্যের বাস্তবতার মধ্যে যে গভীর পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করুন।

১০। 'বাস্তব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রস সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের রসের বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। — আলোচনা করুন।

১১। জাগতিক ঘটনার বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার যে দুস্তর পার্থক্য রয়েছে, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'বাস্তব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার যে - সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা করেছেন, তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বর্ণনা করুন।

১২। "ইংরেজি শিক্ষা সেনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, যে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল।" — উদ্ধৃতিটি অবলম্বনে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-আলোচনা করেছেন, তা ব্যাখ্যা করুন।

১৩। "লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না।" — লোকশিক্ষা এবং সাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেছেন, উদ্ধৃত বক্তব্য অবলম্বনে তা আলোচনা করুন।

১৪। "কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই যেই প্রমাণ আছে।" — 'বাস্তব' প্রবন্ধ-অবলম্বনে উক্তিটির যথার্থতা বিচার করুন।

১৫। 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ খেলা ও লীলা অর্থাৎ খেলা ও সাহিত্যের মধ্যে যে গভীর পার্থক্যটি দেখিয়েছেন তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১৬। 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয়টি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

১৭। "প্রকাশ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দ রূপকে ব্যক্ত করা," — 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ-অবলম্বনে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

১৮। "অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষ গোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে।" — 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

১৯। "কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায়, গ্রীক শিল্পীর পূজা পাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্তনে, যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়।" — 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

২০। "গোলাপের মধ্যে সুনিহিত সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে ঐক্য, নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য।" — 'তথ্য ও সত্য' - প্রবন্ধ অবলম্বনে ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব্যাখ্যা করুন।

২১। "নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস।" — 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ-অবলম্বনে উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

২২। "সৃষ্টির বাজে-খরচের বিভাগেই অমীমের খাস তহবিল।" — 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আলোচনা করুন।

২৩। প্রয়োজনের জগতের তথ্য ও সাহিত্য জগতের সত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পার্থক্য উপলব্ধি করেছেন, তা ব্যাখ্যা করুন।

২৪। "যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।" — বক্তব্যটির অন্তর্নিহিত ভাব পরিস্ফুট করুন।

২৫। "শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে।" — এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জৈব পিপাসা ও সাহিত্য পিপাসার পার্থক্য নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির যে গভীর তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন, তা আপনার নিজের ভাষায় প্রকাশ করুন।

২৬। "তত্ত্ব-খণ্ডিত, স্বতন্ত্র — সত্যের সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে।" — রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য-অনুসরণে তথ্য ও সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশ্লেষণ করুন।

২৭। "সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইনে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই।" — বক্তব্য বিশদ করুন।

২৮। "সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়।" — বক্তব্যটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে রসের যে আলোচনা করেছেন, তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করুন।

২৯। "রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়।" — এই বক্তব্যের অনুসরণে রসবস্তু ও তথ্যবস্তুর পার্থক্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব্যাখ্যা করুন।

৩০। 'সাহিত্য তত্ত্ব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩১। 'সাহিত্য তত্ত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মিলন তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা বিশ্লেষণ করুন।

৩২। "আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ।" — বক্তব্যটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৩৩। "আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা।" — আমাদের এই দুই রকমের জানা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৩৪। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সাহিত্যকে অপ্রয়োজনীয়, তার রসকে অহৈতুক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ-সম্পর্কে আপনার অভিমত বিশ্লেষণ করুন।

৩৫। "রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে।" — 'রস' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে বিশ্লেষণ করুন।

৩৬। "সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে; তার হিসাবের আদর্শ নেই, পরিমাণ নেই।" — উক্তিটির আলোকে সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩৭। "আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে সয় না।" — বক্তব্যটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৩৮। "দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্র্যাজেডির মূল্য এই নিয়ে।" — উক্তিটির আলোকে দুঃখ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ব্যক্ত করুন।

৩৯। "যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূর প্রসারিত।" — রবীন্দ্র-দৃষ্টির আলোকে সুন্দর ও মনোহর-সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪০। "মানবচিত্তের এই সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকাক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্যে দেদীপ্যমান করে তুলেছে।" — উক্তিটির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য স্পর্কে কি বলতে চেয়েছেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪১। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৪২। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে ভাষা ও ভাবের প্রকাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করুন।

৪৩। 'সাহিত্য' শব্দের যে তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন, তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করুন।

৪৪। "মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।" — সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতটি বিশ্লেষণ করুন।

৪৫। "প্রকৃতিকে আমাদের মানব ভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।" — বক্তব্যটি বিশদ করুন।

৪৬। "ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে ভাষা কিছু-বা বলে কিছু-বা গোপন করে, কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর।" — সাহিত্যের ভাব ও ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করুন।

৪৭। "যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি" — সাহিত্যে এই কল্পনাশক্তির ভূমিকা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেছেন, তা আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

৪৮। "ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখন আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয়, বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।" — 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটি অবলম্বনে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

৪৯। "যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র করে দেখি তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়।" — 'সাহিত্যের তাৎপর্য' অবলম্বনে বক্তব্যটি বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

৫০। "মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর-একটা পালা।" — উক্তিটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছেন, 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ-অবলম্বনে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫১। "মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্তি করে বিচিত্র কলা-কৈশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্যে।" — 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ-অবলম্বনে বক্তব্যটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৫২। "চিরকালের মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়।"

— আলোচ্য বক্তব্যটিতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের নির্মাণশক্তি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন। প্রসঙ্গত মানুষের নির্মাণশক্তির এই সদর্থক দিকটির বিপরীতে যে নঞর্থক দিকটি সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন সে-সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫৩। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে আলোচিত আপনার পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে অবলম্বন করে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

৫৪। "সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আপনার পাঠ্য প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে প্রচলিত সৌন্দর্য ও সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পর্কে বক্তব্য সুপরিস্ফুট করুন।

৫৫। "সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আপনার পাঠ্যতালিকাভুক্ত প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে বাস্তব জগতের তথ্য এবং সাহিত্যের সত্য- সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৫৬। "জ্ঞানের জগতে প্রমাণ তথ্য-নির্ভর, কিন্তু সাহিত্যে-শিল্পের জগতের সত্য একান্ত অনুভূতির ব্যাপার। — 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে আপনার পাঠ্য তালিকাভুক্ত প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে রবীন্দ্র-ভাবনার আলোকে বক্তব্যটির যাথার্থতা আলোচনা করুন।

৫৭। **ব্যাখ্যা করুন :**

উৎসর্গপত্র :

(ক) মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ।

(খ) যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।

(গ) দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা সূচক।

(ঘ) সৌন্দর্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়।

বাস্তব:

(ঙ) রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে সে নিজেকে সপ্রকাশ করিতে পারে না।

(চ) দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী সয়ম্বরসভায় আর-সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

(ছ) সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে।

(জ) ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল।

(ঝ) কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার লয় নাই।

(ঞ) যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে।

(ট) বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পাড়লে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে।

তথ্য ও সত্য :

(ঠ) খেলার ক্ষেত্র জীব যাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।

(ড) প্রকাশ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা।

(ঢ) অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষ গোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে।

(ণ) কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়।

(ত) অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

(থ) লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

(দ) নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস।

(ধ) সৃষ্টির বাজে-খরচের বিভাগেই অসীমের খাস তহবিল।

(ন) শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে।

(প) আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ— তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর-একটা দিক হচ্ছে সত্য।

(ফ) তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।

(ব) বিশ্বছন্দের দ্বারা উদ্ভাসিত না হলে তথ্য আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

(ভ) সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইনে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই।

(ম) তথ্য সংগ্রহ কবির কাজ নয়।

(য) সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।

(র) তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ।

(ল) সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়।

(ব) রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়।

(শ) সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েইতো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।

(ষ) রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বয়ের চেয়ে বড়ো।

সাহিত্যতত্ত্ব :

(ক) এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে।

(খ) আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে-রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ।

(গ) সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তরভূত।

(ঘ) আমাদের জানা দুরকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা।

(ঙ) আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিত কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।

(চ) প্রতিদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণ অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সংকীর্ণতায়।

(ছ) মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়।

(জ) যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে।

(ঝ) সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু একথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে।

(ঞ) রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে।

(ট) সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে; তার হিসাবের আদর্শ নেই, পরিমাণ নেই।

(ঠ) মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের

রেখায়, শব্দের ভাষায় তারই সংবর্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

(ড) দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর।

(ঢ) দুঃখে-বিপদে-বিদ্রোহে-বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

(ণ) মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প।

(ত) যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূর প্রসারিত।

সাহিত্য তাৎপর্য :

(থ) সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন।

(দ) পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ-মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ,

(ধ) মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে।

(ন) ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে ভাষা কিছু-বা বলে কিছু-বা গোপন করে, কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর।

(প) যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে, সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি।

(ফ) ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয়, তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয়, বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

(ব) আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্য স্থাপন করে।

(ভ) যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য, তাকে যখন সমগ্র করে দেখি, তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়।

(ম) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে বহু মানুষ, আর সেইসঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ, যে বিশেষ।

(য) নৈকট্য ঘটায় বনেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি,

(র) মানুষ যে বিশ্বে জন্মেছে তাকে দুই দিক থেকে কেবলই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, ব্যবহাররের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে।

(ল) যা সামান্য, যা অসুন্দর, তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্য দৃষ্টিতে বিশিষ্ট করে দেখতে পারে; বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে।

(ব) মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে বিচিত্র কলা-কৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য।

(শ) ব্যবহারিক বুদ্ধি নৈপুণ্যে মানুষ চলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলা নৈপুণ্যে কল্পনা শক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়।

(ষ) মানুষের নির্মাণশক্তি বলশালী, আশ্চর্য তার নৈপুণ্য।

(স) সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে ওঠে যে সাহিত্যে সমগ্রভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে আপনারই ঔ সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে।

(হ) সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের আগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে।

৯.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। সাহিত্যের পথে (বিশ্ব ভারতি) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব : অমূল্য সরকার

৩। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পথে : হীরেণ চট্টোপাধ্যায়

৪। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : প্রবাসজীবন চৌধুরী

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন

* * *